অযোধ্যার বেগম।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রায়শ্চিত্ত।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

মৃত্যু শয্যা।

পাপ, কুকার্য্য এবং কর্ত্তব্য লঙ্ঘন ধীরে ধীরে মানুষকে বিনাশের দিকে পরিচালন করে। এ সংসারে প্রত্যেকেই আপন আপন কুকার্য্য এবং কর্ত্তব্যলঙ্ঘনসম্ভূত ঘটনাবলীর স্রোতে ভাসিতেভাসিতে, চরমে ঘোর বিপদ সাগরে নিমগ্ন হয়। কিন্তু সংসারের মোহান্ধকারে পড়িয়া মানুষ বুঝিতে পারে না, যে, বর্ত্তমান কুকার্য্য তাহার ভবিষ্য বিপদের বীজ বপন করিতেছে। সংসারের কোলাহল তাহার কর্ণকে বধির করে; সংসারাসক্তির যবনিকা তাহার ভবিষ্য-দৃষ্টিকে অবরোধ করে।

শারীরিক রোগের ন্যায় মানসিক এবং নৈতিক রোগও অস্পষ্টভাবে এবং অজ্ঞাতসারে মানব জীবনে প্রবেশ করে। রোগাক্রান্ত ব্যক্তি যদ্রূপ নির্ণয় করিয়া বলিতে পারে না যে, গতজীবনের কোন মুহূর্ত্তে এই বর্ত্তমান রোগের বীজ তাহার শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, বিপন্ন ব্যক্তিও সেই প্রকার কখনও অবধারণ করিতে পারে না যে, কোন দিনের কর্ত্তব্য-লঙ্ঘন তাঁহাকে এ বিপদ সাগরে নিমগ্ন করিয়াছে।

অর্থলোভী ইংরাজদিগের সাহায্যগ্রহণপূর্ব্বক উজীর সুজা উদ্দৌলা নিরপরাধ রোহিলাদিগকে বিনাশ করিয়া, নিরপরাধা রোহিলা রমণী-দিগের প্রতি ঘোর অত্যাচার করিয়া, যে আপন মৃত্যুবাণ প্রস্তুত করিয়াছেন, অযোধ্যার রাজপদ বিনাশের যে বীজ বপন করিয়াছেন, তাহা কি পূর্ব্বে তাঁহার বুঝিবার সাধ্য ছিল। একেতো ভবিষ্যতের গর্ভে যাহা কিছু

নিহিত রহিয়াছে, তাহা কাহারও জানিবার সাধ্য নাই; অধিকন্তু কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য-জ্ঞান-বিবর্জ্জিত মনুষ্য আপন আপন হৃদয়-স্থিত মোহান্ধকার নিবন্ধন সর্ব্বদাই ভ্রমজালে নিপতিত হইয়া রহিয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মোগল সাম্রাজ্য বিনষ্ট হইলে পর ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশীয় রাজগণ ও নবাবগণ আপন আপন রাজ্য বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইহাঁদের মধ্যে অনেকেই ইংরাজ বণিকদিগের সাহায্যগ্রহণপূর্ব্বক প্রতিবেশীর রাজ্য হরণ করিবার অভিপ্রায় করিলেন। তখন ইহাঁরা সকলেই মনে করিতেন, যে ইংরাজেরা কেবল বাণিজ্যার্থ এদেশে অবস্থান করিতেছে; কিছুকাল ইহারা বাণিজ্য করিয়া পরে স্বদেশে চলিয়া যাইবে; সুতরাং ইহাদিগকে আপন আপন রাজ্য মধ্যে স্থানপ্রদানপূর্ব্বক ইহাদিগের সাহায্যে প্রতি-বেশীর রাজ্য অপহরণ করিলে স্বরাজ্য বিনাশের কোন সম্ভব নাই। কিন্তু ইংরাজ কি পদার্থে নির্ম্মিত তাহা একবার ভ্রমেও চিন্তা করিলেন না। অর্থ-গৃধ্নুতা, স্বার্থপরতা এবং অকৃতজ্ঞতা যে তাহাদের জাতীয় ধর্ম্ম তাহা তখন বুঝিতে পারিলেন না।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের রাজগণ মধ্যে মহারাজ বলবন্ত সিংহ এবং অযো-ধ্যার উজীর আর তৎকালের নিস্তেজ দিল্লীর সম্রাট এই তিনজনই সর্ব্বাগ্রে ইংরাজের কুহকে পড়িয়া প্রতারিত হইলেন। চরমে ইহাদের তিনজনের রাজ্যই বিনষ্ট হইল। * * * * * *

বিগত আষাঢ় মাসে অর্থাৎ ১৭৭৪ খ্রীষ্টীয় অব্দের জুন মাসে, হাফেজ নন্দিনী বিষাক্ত ছুরিকা দ্বারা সুজাকে আঘাত করিয়া তৎপরে আত্মহত্যা করিলেন। পিতার শত্রুকে যথোচিত দণ্ড প্রদান পূর্ব্বক তিনি স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সুজা উদ্দৌলা সেই আঘাত প্রাপ্তির পর ছয় মাস কাল স্বীয় কুকার্য্যের ফলভোগ করিতেছেন। এখন মাঘ মাসের প্রারম্ভে তিনি অচৈতন্যাবস্থায় মৃত্যু শয্যায় পড়িয়া রহিয়াছেন।

বিষাক্ত ছুরিকার আঘাত প্রাপ্তির পর দিন দিন সুজার শরীর স্ফীত হইতেছিল। বিষের যন্ত্রণায় সর্ব্বদাই তাঁহার শরীর ছট্‌ফট্‌ করিত। কিন্তু শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ এই পাঁচ মাস পর্য্যন্ত তিনি অতি কষ্টে কখনও কখনও বাহির বাড়ী যাইয়া দরবারে বসিতেন। এই কয়েক মাসের মধ্যে তাঁহার শারীরিক অবস্থা একেবারে প্রকাশ হইয়া পড়িল না। আপন শারীরিক যন্ত্রণা গোপন করিবার নিমিত্ত তিনি

বিশেষ চেষ্টা করিতেন। কিন্তু শত চেষ্টা করিয়াও রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিতে পারিতেন না। শারীরিক যন্ত্রণা নিবন্ধন সকল কার্য্যেই যার পর নাই বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিতেন। কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে অতি কর্কশ ভাষায় তাহার উত্তর প্রদান করিতেন। এই সময়ে মহম্মদ ইরাজখাঁ, রাজা সুরৎসিংহ, রাজা সুরৎসিংহের জামাতা রাজা জগন্নাথ প্রভৃতি অযোধ্যার দরবারের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। কিন্তু ইহাঁদের তিন জনের মধ্যে কেহই নবাবের বর্ত্তমান অবস্থার মূল কারণ জানিতেন না। নবাবের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী নবাব আসিফউদ্দৌলার বিশেষ প্রিয়পাত্র মার্ত্তুজাখাঁ এবং অপর দুই চারি জন মুসলমান কর্ম্মচারীই কেবল সুজার বর্ত্তমান রোগের প্রকৃত অবস্থা পরিজ্ঞাত ছিলেন। অযোধ্যার জনসাধারণ মার্ত্তুজ খাঁকে প্রধান অমাত্য বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু বৃদ্ধ মহম্মদ ইরাজখাঁই এই সময়ে প্রধান অমাত্যের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

মহম্মদ ইরাজ খাঁ সুজা উদ্দৌলার স্বভাব মধ্যে ঈদৃশ পরিবর্ত্তন দর্শনে নবাবের সঙ্গে অধিক কথা বার্ত্তা বলিতে শঙ্কা করিতেন। সুজা দরবারে আসিয়া বসিলে, প্রায় সমুদায় কর্ম্মচারীই নির্ব্বাক থাকিতেন। নবাব নিজে কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিলে আপনা হইতে কেহই নবাবকে কিছু বলিতে সাহস করিতেন না।

মহম্মদ ইরাজ খাঁ এবং রাজা সুরৎ সিংহ প্রভৃতি মনে করিতে লাগিলেন যে, নবাবের মানসিক অবস্থা পরিবর্ত্তনের মূল কারণ আর কিছুই নহে, কলিকাতা কৌন্সিলে হেষ্টিংস সাহেবের সঙ্গে ফ্রান্সিস্ ফিলিপ প্রভৃতির অনৈক্য নিবন্ধন রোহিলা যুদ্ধ সম্বন্ধে নানা প্রকার গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে, রোহিলখণ্ডের অধিকাংশ ভূমি আবার নবাব ফায়েজ উল্লাকে প্রত্যর্পণ করিবার প্রস্তাব হইতেছে; সুতরাং উজীর সুজা উদ্দৌলা এই সকল বিষয়ে চিন্তা করিয়াই অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন। রোহিলা যুদ্ধে তাঁহার রাজকোষ শূন্য হইয়াছে। এখনও ইংরাজ সৈন্যদিগের ব্যয় বহন করিতে হইতেছে। এই কষ্টলব্ধরাজ্য আবার হস্তবহির্ভূত হইবার আশঙ্কাই তাঁহার বর্ত্তমান স্বভাব পরিবর্ত্তনের মূল কারণ * হইবে।

* কোন কোন ইতিহাস লেখক বলেন যে কলিকাতা কৌন্সিলের গোলযোগই সুজা উদ্দৌলার রোগের কারণ ছিল।

নবাব সুজা উদ্দৌলা এই প্রকারে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে রোহিলা যুদ্ধের পর ছয় মাস গত হইল। ক্রমে হেমন্ত অবসানে শীত ঋতুর সমাগম হইল। এদিকে পৌষ মাসের প্রারম্ভ হইতেই সুজা উদ্দৌলা উত্থান-শক্তি রহিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার শরীরের মাংস স্থানে স্থানে পচিতে আরম্ভ হইল। পৌষ মাসের প্রারম্ভে সর্ব্বত্র প্রচার হইয়া পড়িল যে নবাব সুজা উদ্দৌলা বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার জীবনের বড় আশা নাই।

শীতকালে লোকের বড় একটা বসন্ত রোগ হয় না। বিশেষতঃ নবাবের রাজধানী এই সময়ে সরযূ নদীতীরবর্ত্তী ফায়েজাবাদে* ছিল। ফায়েজাবাদের ন্যায় স্বাস্থ্যকর এবং মনোহর স্থান বোধ হয় ভারতবর্ষের আর কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। এই মনোরম পবিত্র স্থানের অধিবাসীদিগের শরীরে সহজে রোগ প্রবেশ করিতে পারে না। অকালে নবাবের বসন্ত রোগ হইয়াছে, এইরূপ জনরব প্রচার হইবামাত্র নগরবাসীদিগের মধ্যে নবাবের পীড়ার কথা সম্বন্ধে বিশেষ কাণাকাণি হইতে লাগিল। নবাব এবং রাজপরিবারের ঘরের আসল কথা প্রায়ই অব্যক্ত থাকে। কিন্তু রাজ্যের প্রজাগণ মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তিই আপন আপন প্রকৃতি এবং মানসিক ভাব অনুসারে রাজপরিবারের গুপ্তকথা সম্বন্ধে এক একপ্রকার সিদ্ধান্ত করেন, এক একটা অদ্ভুত অনুমান করেন। তাহাদিগের সেই সকল সিদ্ধান্ত এবং অনুমান ভাবী বংশাবলীর নিকট ইতিহাসাকারে পরিণত হয়। সুতরাং ইতিহাস এবং উপন্যাস ইহার মধ্যে বড় অধিক বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় না। ইংরাজ ইতিহাস লেখকদিগের ন্যায় সাহস থাকিলে অনায়াসে উপন্যাসকে ইতিহাসাকারে জন সমাজে প্রচার করা যাইতে পারে। * * * * * *

---

* এই উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায় সমূহে লক্ষ্ণৌনগর নবাবের রাজধানী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু লেখকের ভ্রমবশতঃ এইরূপ লিখিত হইয়াছে। সুজা উদ্দৌলার পিতামহ সাদত্ খাঁ অর্থাৎ নবাব বরহান্ মুলক প্রথমতঃ লক্ষ্ণৌনগরে রাজধানী সংস্থাপন করিয়াছিলেন। পরে বোধ হয় সবদর জঙ্গের সময়েই ফায়েজাবাদে রাজধানী সংস্থাপিত হয়। আবার সুজা উদ্দৌলার মৃত্যুর পর নবাব আসফ উদ্দৌলার আমলে লক্ষ্ণৌনগরে পুনর্ব্বার রাজধানী সংস্থাপিত হইল এবং সেই সময় হইতে ওয়াজেদ আলির আমল পর্য্যন্ত লক্ষ্ণৌই, অযোধ্যার রাজধানী ছিল। হাফেজ নন্দিনীর মৃত্যু ফায়েজাবাদে হইয়াছিল।

দিনের পর দিন মাসের পর মাস ক্রমেই গত হইতে লাগিল। পৌষ মাসও দেখিতে দেখিতে গত হইল। আজ ১৫ই মাঘ। আজ সুজা উদ্দৌলার চক্ষু কর্ণ নাসিকা প্রভৃতি সমুদয় ইন্দ্রিয়ের কার্য্যই রহিত হইয়া পড়িয়াছে। শ্বাস প্রশ্বাসের প্রবাহ ভিন্ন আর তাঁহার মধ্যে জীবনী শক্তির কোন কার্য্যই পরিলক্ষিত হয় না। আজ পাঁচ দিন পর্য্যন্ত সুজা এইরূপ অচৈতন্যাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছেন। বউ বেগম পতির গলিত মস্তক ক্রোড়ে করিয়া শিয়রে বসিয়া আছেন। তিনি আজ এক মাস কাল মুহূর্ত্তের জন্যও পতির শয়ন প্রকোষ্ঠ পরিত্যাগ করেন নাই। গৃহের অন্যান্য লোক মনে করে যে টাকার লোভে বউ বেগম এইরূপ করিতেছেন। কিন্তু আসল কথা তাহা নহে।

ইহার একমাস পূর্ব্ব হইতেই সুজার শয়ন প্রকোষ্ঠ দুর্গন্ধময় হইয়া পড়িয়াছে। অহর্নিশ প্রকোষ্ঠ মধ্যে আতর ছিটান হইতেছে। বাঁদীগণ কলসে কলসে গোলাপ জল ঢালিতেছে। খোজা জহরালি, বহরালি দারাবালি খাঁ কতপ্রকার সুগন্ধ দ্রব্যাদি প্রকোষ্ঠ মধ্যে আনিয়া রাখিতেছে কিন্তু কিছুতেই দুর্গন্ধ দূর হয় না। বাঁদীদের মধ্যেও দুই একজন ভিন্ন প্রায় সকলেই অত্যন্ত অনিচ্ছা পূর্ব্বক প্রকোষ্ঠ মধ্যে যাইয়া নবাবের সেবা শুশ্রূষা করে। অন্দরস্থিত ভদ্র মহিলাগণ মধ্যে স্বয়ং বউ বেগম, নবাব মাতা মতী বেগম (অর্থাৎ সায়দ উন্নিসা বেগম) জগদম্বা বেগম এবং কাসিমালির স্ত্রী ভিন্ন আর কাহাকেও বড় নবাবের প্রকোষ্ঠে যাইতে দেখা যায় না। একান্ত বাধ্য হইয়া যে সকল বাঁদীকে নবাবের সেবা শুশ্রূষার্থ প্রকোষ্ঠ মধ্যে থাকিতে হইত, তাহারা সময়ে সময়ে নবাবকে একাকী ফেলিয়া প্রকোষ্ঠান্তরে চলিয়া যাইত। কিন্তু বউ বেগমকে প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিলেই তাড়াতাড়ী আবার প্রকোষ্ঠ মধ্যে আসিয়া বসিত। পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ের উল্লিখিত প্রেমিকা তোফানী বাঁদী এই সময় নবাব গৃহ হইতে পলায়ন পূর্ব্বক স্থানান্তরে চলিয়া গিয়াছিল। বাহিরের অনেক লোক তোফাণীর মুখেই নবাবের ব্যাধির প্রকৃত কারণ জানিতে পারিয়াছিল। তোফাণী প্রেমিকা ছিল। তাহার স্থানে স্থানে প্রেমিকদিগের সঙ্গে এই সকল কথাবার্ত্তা হইত।

অদ্য হইতে প্রায় বিশ পঁচিশ দিন পূর্ব্বে একদিন বেগম নবাবের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া দেখেন যে একজন বাঁদীও সেখানে উপস্থিত

নাই। নবাবের সমস্ত শরীরের উপর মক্ষিকা পড়িয়া রহিয়াছে। নবাব ক্ষীণস্বরে জল চাহিতেছেন। তাঁহার কণ্ঠ একেবারে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। এই সময় পর্য্যন্ত নবাবের বিলক্ষণ জ্ঞান ছিল। লোক দেখিলে তিনি অনায়াসে চিনিতে পারিতেন। বেগমকে শয্যাপার্শ্বে দেখিবামাত্র নবাব সজল নয়নে বলিতে লাগিলেন, "আমেতু * যাহার বিপদের কথা শুনিয়া তুমি লজ্জা ভয়, কুল মান এবং জীবনের আশা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ পুর্ব্বক বক্সারে গিয়াছিলে, এখন মৃত্যুকালে কি তাহাকে একবিন্দু জলও দিবে না আমার গলা শুকাইয়া গিয়াছে। হা পরমেশ্বর একটু জল চাহিয়াও পাইতেছি না। এ সংসারে লোকের যখন শক্তি থাকে, পদ থাকে তখনই অনেক বন্ধু মিলে। স্ত্রী পুত্র সকলই বৃথা।"

স্বামীর ঈদৃশ কাতরোক্তি শ্রবণে বেগমের হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হইল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে নবাবের মস্তক স্বীয় ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া, তাঁহার মুখে একটু একটু সরবত প্রদান করিতে লাগিলেন।

নবাব সরবত পান করিয়া আবার বলিতে লাগিলেন, "আমেতু, এসংসারে আমার কেহই নাই। মৃত্যুকালে আমাকে সকলেই পরিত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু তুমি যে পরিত্যাগ করিবে তাহা কখন মনে করি নাই। তুমি প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া আমার উদ্ধারার্থ গৃহ ত্যাগ করিয়াছিলে।" আবার স্বামীর এই কঠোর বাক্য শ্রবণে বেগম অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া পড়িলেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি নির্ব্বাক রহিলেন। তাঁহার মুখ হইতে কোন কথা বাহির হইল না। দুইবার চেষ্টা করিয়াও কথা বলিতে পারিলেন না। কথা বলিতে আরম্ভ করিলেই শোক ও দুঃখে তাঁহার কথাবরোধ হইয়া পড়িত। তিনি তখন আর ক্রন্দন সম্বরণ করিতে পারিতেন না। প্রায় এক ঘণ্টা পরে আত্মসংযম এবং শোকাবেগ সম্বরণপূর্ব্বক সজল নয়নে বলিতে লাগিলেন :—

"জাঁহাপনা, সংসারের লোক মনে করে যে আমি ঋণদাত্রী তুমি ঋণগ্রহীতা। তোমার এবং আমার মধ্যে শুদ্ধ কেবল ঋণদাতা এবং ঋণ গ্রহীতার

* বউ বেগমের প্রকৃত নাম "আমেতু জাহার"। কিন্তু কোন ইতিহাসে কিম্বা কোন কাগজপত্রে এ নাম প্রকাশ নাই। ইংরাজদিগের কাগজপত্রে কখনও তো বেগম, কখন বাবু বেগম, কখন বহু বেগম লিখিত হইয়াছে।

সম্বন্ধ রহিয়াছে। কিন্তু পৃথিবীর লোক যাহাই কেন মনে করুক না, তাহাতে আমার মনে কখন কোন কষ্ট হয় না। আজ তোমার মুখে এই কথা শুনিয়া বড়ই দুঃখ হইতেছে। এই শরীরের চর্ম্ম দ্বারা তোমার পাদুকা প্রস্তুত করিয়া দিতে পারি। আমি কি সত্য সত্যই কেবল অর্থের নিমিত্ত তোমাকে ভালবাসি ?”

বেগম এই পর্য্যন্ত বলিবামাত্রই তাঁহার শোকাবেগ উথলিয়া উঠিল। তাঁহার মুখ হইতে আর কোন কথা বাহির হইল না। স্বামী স্ত্রী উভয়েই তখন অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

কিছুকাল পরে বেগম আবার বলিতে লাগিলেন “যে জন্য আমি অর্থ সঞ্চয়ার্থ এত যত্ন করিতেছি তাহা কি তুমি বুঝিতে পার না? একবার নবাব কাসিমালির দুরবস্থা স্মরণ করিয়া দেখ না কেন। রাজপদ চির-কালই অস্থায়ী। বিপদে পড়িলে কে তোমার পিতা পিতামহের শত শত পত্নীপুত্রদিগকে অন্ন প্রদান করিবে? তখন ইহাদিগের কি গতি হইবে। এই শত শত অনাথা স্ত্রীলোক এবং ইহাদের সন্তান সন্ততির তখন আর অন্ন মিলিবে না।”

বেগমের মুখ হইতে নবাব কাসিমালির নাম বাহির হইবামাত্র সুজা উদ্দৌলা “হা কাসিমালি—হা কাসিমালি” এই বলিয়া নয়ন মুদিত করি-লেন এবং একেবারে অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন।

বেগম নবাবকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া আপন ক্রোড় হইতে তাঁহার মস্তক নামাইলেন। এবং স্বয়ং দাঁড়াইয়া নবাবের মস্তকে জল সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। দুই তিন মিনিটের মধ্যে নবাব চেতনা লাভ করিয়া অত্যন্ত শোক দগ্ধ হৃদয়ে আপনাকে ভৎর্সনা করিয়া বলিতে লাগিলেন ;—

“আমার পাপে সমুদায় হিন্দুস্থান নষ্ট হইবে। হায়! আগে বুঝিলাম না। কি অশুভক্ষণেই এলাহাবাদ সন্ধিপত্রে দস্তখত করিলাম। আমার কি দুর্ম্মতি হইল। বেনারস সন্ধিপত্রই আমার সর্ব্বনাশের মূল। কেনই বা রোহিলাদিগকে বিনাশার্থ ইংরাজ সৈন্য আনিলাম। আর আমার রাজ্য রক্ষার কোন উপায় দেখি না। কোরাণের একটি কথাও মিথ্যা নহে। আমি মুসলমান হইয়া, মুসলমানকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাফেরের সঙ্গে মিল করিলাম। নবী, রসুল, পয়গম্বর সকলেই বলিয়াছেন—কোরাণেও লেখা আছে—আপন স্বধর্ম্মীকে ছাড়িয়া বিধর্ম্মীর সঙ্গে মিল করিবে না।

আমি কেন কাসিমালিকে পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজের আশ্রয় লইলাম। এই ছয় মাস কাল এই রোগ শয্যায় পড়িয়া যতই চিন্তা করি ততই কেবল আপন কুকার্য্য দেখিতে পাই। রাজ্য শোকে কাসিমালি এখন ক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন। রাজ্য নাশের চিন্তা আমার পরমায়ুঃ শেষ করিতেছে। দূর হউক ইস্‌মায়েল বেগ খাঁ। মুসলমান কেবল সৈন্যাধ্যক্ষের কার্য্য করিতে পারে। মুসলমানের মন্ত্রীর কার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই। মুসলমান অপেক্ষা হিন্দু মন্ত্রী ভাল। মুসলমান কিসে যে কি হয় তাহা বোঝে না। কেন তখন রাজা স্বরৎসিংহের কথা শুনিলাম না। কেনই বা রাজা রামনারায়ণের পরামর্শ তখন অগ্রাহ্য করিলাম। ইহারা দুই জনেই সন্ধির প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিল। স্বধর্ম্মাবলম্বী আপন আশ্রিত কাসিমকে পরিত্যাগ করিয়া কাফেরের সঙ্গে মিল করিলাম। ধিক্ আমার জীবন, ধিক্ আমার রাজত্ব!”

নবাব এইরূপে আত্ম-ভৎর্সনা করিতে করিতে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। কণ্ঠ শুষ্ক হইল। তিনি বেগমের নিকট জল চাহিলেন এবং জল পান করিয়া একটু সুস্থ হইবা মাত্র পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন—

“অযোধ্যাই বোধ হয় হিন্দুস্থানের বিনাশের কারণ হইবে। সমগ্র হিন্দুস্থানের বিনাশের নিমিত্তই সুবে আউদেস সৃষ্টি হইয়াছে।”

নবাব পুনর্ব্বার এইরূপ কথা কহিতে আরম্ভ করিলে বেগম বলিলেন, “তুমি কথা বলিতে বলিতে আবার ক্লান্ত হইয়া পড়িবে। ইহাতে তোমার রোগ আরো বৃদ্ধি হইবে। এ সকল চিন্তা পরিত্যাগ কর।”

নবাব। আমি শত চেষ্টা করিয়াও এ সকল চিন্তা মন হইতে দূর করিতে পারি না। এই রোগ-শয্যায় সর্ব্বদাই এই সকল চিন্তা আমার অন্তরে উদয় হইতেছে। এখন আমি স্পষ্ট দেখিতে পাই যে ইংরাজদিগের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াই রাজ্যনাশের বীজ বপন করিয়াছি *।

বেগম। তুমি এখন এ সকল চিন্তা পরিত্যাগ কর। পরমেশ্বর যদি তোমাকে এ রোগ হইতে উদ্ধার করেন, তবে ইংরাজদিগকে আমাদের

* আরউইন সাহেব তাঁহার (Garden of India) অযোধ্যার ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে নবাব সুজা উদ্দৌলার মৃত্যুর দুইটী কারণ উল্লিখিত হইয়াছে। কেহ বলেন ফরক্কাবাদের নবাবকন্যার (হাফেজনন্দিনীর) প্রদত্ত আঘাত। আর কেহ বলেন ইংরাজদিগের অবৈধ আচরণ ও অর্থ শোষণ চেষ্টা। Vide Irwin's Garden of India.

এ রাজ্যে আর স্থান প্রদান করিব না। ইংরাজ সৈন্যদিগকে তখন চলিয়া যাইতে বলিলেই হইবে। তাহারা তো তোমার বেতনভোগী চাকর। তাহাদের বেতন বন্ধ করিয়া দিবে।

নবাব। আমেতু, ইংরাজ সৈন্য দেশ হইতে তাড়াইবার আর সাধ্য নাই। ইংরাজ যেখানে প্রবেশ করে সেখানে জোঁকের ন্যায় লাগিয়া থাকে। আমার মৃত্যু হইলেই ইহারা আমার দেশ লুঠ করিবে; আমার প্রজাদিগের সর্ব্বস্ব হরণ করিবে। আমার রাজ্যকে লোকে হিন্দুস্থানের উদ্যান বলিয়া প্রশংসা করে। এ উদ্যানে বন্য মহিষ প্রবেশ করিয়াছে। এ উদ্যান নিশ্চয়ই উৎসন্ন হইবে—পয়মাল হইবে—ছারখার হইবে; উদ্যানের চিহ্নও থাকিবে না। আমার আর বাঁচিয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই; মৃত্যুই ভাল। বাঁচিয়া থাকিলে কাসিমালির যে দশা হইয়াছে আমারও তাহাই হইবে। হায়! হায়! কাসিমালি রাজ্যশোকে ক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

বেগম। কাসিমালি ক্ষিপ্ত হইয়াছেন তোমাকে কে বলিল? তুমি এখন একটু চুপ করিয়া থাক। এসকল কথা বলিবার এ সময় নহে। আমি শুনিয়াছি কাসিমালি সৈন্য সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত নেপালে গিয়াছেন। তিনি এখনও বোধ হয় নেপালে আছেন।

নবাব। কাসিমালির প্রকৃত অবস্থা তুমি কিছু জান না। সে সকল কথা আমি তোমার নিকটও প্রকাশ করি নাই। কাসিমালি একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়া না পড়িলে কি আর তাঁহার বেগম, তাঁহার শাশুড়ী কখনও ফায়েজাবাদে আসিতেন। কাসিমালি আমাকে হারাম বলিয়া মনে করেন। তিনি ক্ষিপ্তাবস্থাপন্ন না হইলে তিনি প্রাণান্তেও তাঁহার স্ত্রী এবং শাশুড়ীকে আমার বাড়ী আসিতে দিতেন না। এলাহাবাদ সন্ধিপত্র লেখা পড়া হইবার পূর্ব্বে ইংরাজেরা কাসিমালিকে তাহাদের হস্তে অর্পণ করিবার নিমিত্ত আমাকে অনুরোধ করিতে লাগিল। আমি তখন অগত্যা ইংরাজদিগের নিকট প্রকাশ করিলাম যে কাসিমালি পলায়ন পূর্ব্বক নেপালে গিয়াছেন।

বেগম। তবে কাসিমালি নেপালে যান নাই?

নবাব। তিনি রোহিলখণ্ডে পৌছিয়াই রাজ্যশোকে পাগল হইয়া পড়িলেন। ক্ষিপ্তাবস্থায় আপনি শাশুড়ী এবং স্ত্রীর প্রাণ বিনাশ করিতে উদ্যত

হইলেন। আমি তখন মাকে কাসিমালির স্ত্রী এবং শ্বাশুড়ীকে আশ্রয় প্রদানার্থ কোন উপায় অবলম্বন করিতে বলিলাম। কাসিমালির স্ত্রী এবং শ্বাশুড়ী প্রাণান্তেও আমার গৃহে আশ্রয় লইতে সম্মত হয়েন নাই। কিন্তু মা অনেক কৌশল করিয়া অনেক প্রকারে বলিয়া কহিয়া ইহাদিগকে এখানে আনিয়াছেন। মা তখন ইহাদিগকে বলিয়াছিলেন যে তিনিও আমার গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইহাদিগকে সঙ্গে করিয়া মক্কা শরীপ যাইবেন।

বেগম। তবে কাসিমালি এখন কোথায় আছেন? তিনি কি এখনও ক্ষিপ্তাবস্থায় আছেন?

নবাব। এখন অপেক্ষাকৃত কিছু সুস্থ হইয়াছেন। কিন্তু শ্বাশুড়ী এবং স্ত্রীর প্রাণ বিনাশ করিবার সংকল্প বোধ হয় এখনও তাঁহার মন হইতে দূর হয় নাই। সেই জন্যই তাঁহার শ্বাশুড়ী এবং স্ত্রী তাঁহার নিকটে যাইতে সাহস করেন না। দিল্লীর প্রধান উমরা নজফ্ খাঁ তাঁহার ভরণ পোষণের ব্যয় বহন করিতেছেন। দিল্লী হইতে বিশ ক্রোশ দূরে পুলবালে তিনি এখন সন্তানাদি সহ অবস্থান করিতেছেন। কিন্তু নিজের আহারীয় দ্রব্যাদি স্বহস্তে প্রস্তুত করেন। কাহারও উপর তাঁহার বিশ্বাস নাই। পৃথিবীর সকল লোককেই শত্রু বলিয়া মনে করেন। * আমি এখন স্পষ্টই দেখিতেছি যে, আমার বিশ্বাসঘাতকতা তাঁহার ক্ষিপ্তাবস্থার মূল কারণ। এখন তিনি আপনার শ্বাশুড়ী এবং আপন স্ত্রীকেও বিশ্বাস করেন না। কিন্তু তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে এক দিন না এক দিন তিনি দিল্লীর বাদসাহ হইয়া ইংরাজদিগকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে সমর্থ হইবেন।

---

* Cossim Ally Khan, after several adventures and flying from one place to another, has at last taken up his residence at Palwall, a small town 20 kosh from hence, on the high road from Agra to Delhi. There, in a miserable tent, surrounded by a couple of tattered walls, does he with a suite of about fifty attendants drag on a wretched life. He has, I believe a small pension from Najhaf Khan, though not openly; and lives on that, and on some effects which he from time to time disposes of. Part of his time is taken up in dressing his own victuals (which office he trusts to no body else.)

By the stars does he regulate all his conduct; and he is fully persuaded that from their influence, and from a due knowledge of it, he will be enabled, one day or another, to remount the musnad either of Bengal or of Delhi, no matter which, with tenfold power and glory. *Vide Asiatic annual Register for 1800 Miscellaneous Tracts page 35.*

নবাবের সমুদয় কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই তিন চারি জন বাঁদী বউ বেগমকে নবাবের প্রকোষ্ঠে দেখিয়া তাড়াতাড়ী প্রকোষ্ঠ মধ্যে আসিল। ইহারা নবাবকে একাকী ফেলিয়া প্রকোষ্ঠান্তরে যাইয়া গল্প করিতেছিল। বউ বেগম ইহাদিগকে অত্যন্ত তিরস্কার করিতে লাগিলেন, এবং এই দিবস হইতে বেগম নিজে সর্ব্বদাই নবাবের শিয়রে বসিয়া থাকিতেন। আজ প্রায় বিশ পঁচিশ দিন হইল তিনি আহার নিদ্রা সমুদয়ই পরিত্যাগ করিয়াছেন। নবাবের মাতা, কিম্বা মীর কাসিমের স্ত্রী অথবা জগদম্বা বেগমকে প্রকোষ্ঠে না রাখিয়া কখন প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির হয়েন না। কিন্তু অন্যান্য লোকেরা বলিতেছে যে নবাবের সমুদয় ধন সম্পত্তি আত্মসাৎ করিবার অভিপ্রায়েই বউ বেগম সর্ব্বদা নবাবের প্রকোষ্ঠে বসিয়া থাকেন, কোন কোন স্থানে টাকা কড়ি মজুত রহিয়াছে তাহারই তত্ত্ব লইতেছেন।

এই ঘটনার পর ক্রমেই দিন দিন নবাবের রোগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। আজ পাঁচ দিন হইল নবাব অচৈতন্যাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছেন। আজ প্রায় সর্ব্ব শরীরই অবশ হইয়াছে। বউ বেগম পূর্ব্ব হইতেই নবাবের শিয়রে বসিয়া থাকিতেন, আজও নবাবের শিয়রে বসিয়া আছেন। তিন চারি জন বাঁদী তালবৃন্ত হস্তে করিয়া নবাবের শরীর হইতে মক্ষিকা তাড়াইতেছে। মীর কাসিমের স্ত্রী বেগমের পার্শ্বে বসিয়া কোরাণ হইতে সুর-আলা পাঠ করিতেছেন—

"দাতা ও দয়াময় পরমেশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া প্রবৃত্ত হইতেছি—হে মানব, মহোচ্চ প্রতিপালক যিনি তাঁহার নাম স্মরণ কর; তাঁহার উপর নির্ভর কর। যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি শস্প উৎপন্ন করিয়া পরে তাহা শুষ্ক ও মলিন করিতেছেন, তাঁহাকে জানিতে চেষ্টা কর ইত্যাদি।"

কোরাণ পাঠ শেষ হইতে না হইতেই জগদম্বা বেগম নবাবের প্রকোষ্ঠে প্রবেশপূর্ব্বক বউ বেগমকে বলিলেন "আমেতু, তুমি এখন আহার করিতে যাও, আমি সুজার শিয়রে বসিয়া তাঁহাকে বাতাস করিব।"

ইতিপূর্ব্বে জগদম্বা বেগম বউ বেগমকে এতদূর আত্মীয়তা সহকারে সম্বোধন করিতেন না। কিন্তু সুজার এই বর্ত্তমান ব্যারামের সময় জগদম্বা বেগম সর্ব্বদাই বউ বেগমের সঙ্গে একত্র হইয়া নবাবের পরিচর্য্যা করিতেন। এই ব্যারামোপলক্ষে ইহাদের মধ্যে ঠিক যেন মাতা এবং কন্যার সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইয়াছে। বউ বেগম এখন জগদম্বা বেগমকে মা বলিয়া সম্বোধন করেন।

জগদম্বা বেগম, বউ বেগমকে আহারার্থ চলিয়া যাইতে বলিলে তিনি বলিলেন, "মা আজ আর আমার আহারাদি করিতে ইচ্ছা হয় না। আজ অন্য কাহারও শয্যাপার্শ্বে বসিবার সাধ্য নাই। নবাবের শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর দুর্গন্ধময় হইয়া পড়িয়াছে।

জগদম্বা। সাধ্য না থাকিলে তুমি কিরূপে বসিয়াছ ?

বউ বেগম। আমার স্বামী। আমি ইহার এই গলিত অঙ্গ চুম্বন করিতেও পারি। কিন্তু অন্যলোকের অবশ্য ঘৃণা হইতে পারে।

জগদম্বা। সুজাকে আমি আপন সন্তানের ন্যায় মনে করি। সুজার গলিত অঙ্গ স্পর্শ করিতে আমার কিঞ্চিন্মাত্রও ঘৃণা বোধ হইবে না। দাম্পত্য প্রেম অপেক্ষাও মাতৃস্নেহই ঘৃণার ভাব অধিকতর পরিমাণে দূর করে। রমণীগণ মা হইলেই সন্তান পালন উপলক্ষে তাহাকে সকল ঘৃণা পরিত্যাগ করিতে হয়।

বউ বেগম। মা, আপনার মন যে কত দূর সরল তাহা আমি পূর্ব্বে কিছুই বুঝিতে পারি নাই। কুটিলতা বোধ হয় আপনার অন্তরে কখন প্রবেশ করিতে পারে না। আপনি পূর্ব্বে নবাবের অনেকানেক কুকার্য্য দর্শনে কোপাবিষ্ট হইতেন। আমি তখন মনে করিতাম যে সর্ব্বদাই আপনি নবাবকে বিদ্বেষনেত্রে দর্শন করেন। আমি তখন নবাবের কুকার্য্যের পক্ষপাতী হইয়া আপনাকে শত্রু বলিয়া মনে করিতাম। কিন্তু সে পাপের ফল এখন হাতে হাতে পাইলাম। নবাবের এই দুরবস্থার সময় তাঁহার গর্ভধারিণী অপেক্ষাও আপনি সমধিক স্নেহ সহকারে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতেছেন। সর্ব্ব প্রকার ঘৃণার ভাব পরিত্যাগ করিয়া আমার সঙ্গে একত্রে তাঁহার গলিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধৌত করিয়া দিতেছেন। আপনি সত্য সত্যই স্বর্গীয় দূত। পূর্ব্বে আপনাকে আমি সর্ব্বদাই বিদ্বেষ নেত্রে দর্শন করিয়াছি। জোনাবে আলিয়া * আপনাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন বলিয়া তাঁহার উপর বিরক্ত হইতাম। কিন্তু এখন দেখিতেছি যে আপনার প্রতি আমি অত্যন্ত অন্যায়াচরণ করিয়াছি। মা তুমি আমাকে ক্ষমা করিবে। তোমার উপদেশ না শুনিয়াই আজ আমার এই দশা হইয়াছে। আজ আমার রাজ্য বিনাশের উপক্রম হইয়াছে।

* বউ বেগম আপন শাশুড়ীকে জোনাবে আলিয়া বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

জগদম্বা। আমি তো তোমাকে বরাবরই আপন কন্যার ন্যায় মনে করি। আমি তো কখনও মনে করি নাই যে তুমি আমাকে বিদ্বেষ নেত্রে দর্শন কর। কিন্তু সে সকল কথার এখন কোন প্রয়োজন নাই। তুমি স্নান আহার করিতে যাও।

বউ বেগম। আপনার অত্যন্ত সরল মন তাহাতেই আমার মনের কুটিল ভাব আপনি অনুভব করিতে পারেন নাই। হাফেজ নন্দিনীকে যে দিন আপনি স্থানান্তর করিতে বলিয়াছিলেন, সে দিন আপনাকে আমি যে কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম তাহা কি আপনার স্মরণ আছে? হা পরমেশ্বর তখন আপনার কথা মত কার্য্য করিলে কি আর এ দুর্দ্দশা হইত?

জগদম্বা। কি কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে?

বউ বেগম। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে নবাব জাফরালিকে সিংহাসনচ্যুত করিবার নিমিত্ত আপনি কি নবাব কাসিমালির সঙ্গে পরামর্শ করিয়াছিলেন?

জগদম্বা। হাঁ, সে বিষয়ে তো কাসিমালির সঙ্গে অনেকবার পরামর্শ করিয়াছিলাম। সে তো সত্য কথা।

বউ বেগম। আপনি যে কাসিমালিকে তদ্রূপ পরামর্শ প্রদান করিয়াছিলেন তাহা আমি তৎপূর্ব্বেও শুনিয়াছিলাম। কিন্তু সেই কথাটা আপনার নিজের মুখে জোনাবে আলিয়াকে শুনাইবার নিমিত্ত, সে দিন আপনার নিকট সে কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। আপনার মন অত্যন্ত সরল। আপনি তখন আমার দুরভিসন্ধি কিছুই বুঝিতে পারেন নাই।

জগদম্বা। ইহার মধ্যে তোমার কি দুরভিসন্ধি ছিল?

বউ বেগম। আমার কিরূপ দুরভিসন্ধি ছিল তাহা এখন আমি অনায়াসে আপনার নিকট প্রকাশ করিতে পারি। এখন সাহস করিয়া সকল কথাই আপনাকে বলিতে পারি। এখন দেখিতেছি যে আপনি মা[illegible]হেন। আপনি স্বর্গীয় দেবী। আমি অন্যায় করিয়া থাকিলে[illegible] আপনি আমার উপর কোপাবিষ্ট হইবেন না। আপনার স্বামীর [illegible] আপনার বিবাদ ছিল বলিয়াই আমি সর্ব্বদা আপনাকে পতিঘাতিনী বলিয়া মনে করিতাম। আপনি যে স্বামীর অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহাই জোনাবে আলিয়াকে শুনাইবার নিমিত্ত চক্রান্ত করিয়া সেই দিন ঐ রূপ প্রশ্ন করিয়াছিলাম। কিন্তু এখন বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি

যে আপনার ন্যায় সদাশয়া পবিত্র-হৃদয়া রমণীর সঙ্গে নবাব জাফরালীর কখন মিল হইতে পারে না। স্বর্গ এবং নরকে কখন মিল হয় না।

জগদম্বা। বাছা! সংসারের লোক হয় ত চিরকালই আমাকে পতিঘাতিনী বলিয়া মনে করিবে। কিন্তু আমার বিবাহের পর অন্যূন দশ বৎসর আমি পতিকে সৎপথে আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। পতি পুত্র যদি আমার উপদেশ শ্রবণ করিত তবে আর আমাদের বঙ্গদেশ এইরূপ উৎসন্ন হইত না। পতি পুত্রের পাপ ও কুকার্য্যের পক্ষপাতিনী হইয়া তাহাদিগের ভালবাসা রক্ষা করিবার চেষ্টা করিলে শুদ্ধ কেবল তাহাদিগকে বিনাশের দিকে পরিচালন করা হয়।

বউ বেগম। মা, আমার অদৃষ্টে তাহাই হইয়াছে। আমি নিজেই স্বামীকে বিনাশের দিকে পরিচালন করিয়াছি। নবাবের ভালবাসা বজায় রাখিবার জন্য আমি কখনও তাঁহার কোন কুকার্য্যে প্রতিবাদ করি নাই। আমি সর্ব্বদাই মনে করিতাম যে যাহাতে তিনি সুখী হয়েন তাহাই আমি করিব। তাঁহার কোন সুখের বাধা দিব না। কিন্তু এখন দেখিতেছি যে তাঁহাকে কুকার্য্য হইতে বিরত রাখিবার চেষ্টা না করিয়া তাঁহার ঘোর অনিষ্ট সাধন করিয়াছি।

জগদম্বা। ইহাঁদিগকে কুকার্য্য হইতে বিরত রাখা বড় সহজ ব্যাপার নহে। পুরুষ স্বভাবতঃই বড় নিষ্ঠুর। ইহারা বোঝে না যে পরস্ত্রীতে আসক্ত হইলে কিম্বা বহু-বিবাহ করিলে পতিপ্রাণা পত্নীর হৃদয়ে অত্যন্ত কষ্ট উপস্থিত হয়। কিন্তু তোমার পতিভক্তি দর্শনে আমি আশ্চর্য্য হইলাম। সুজা যে রূপ ব্যভিচারাসক্ত তাহাতে সে কখনও কোন পতিপ্রাণা রমণীর ভালবাসা প্রত্যাশাও করিতে পারে না। কিন্তু তাহার প্রতি তোমার প্রগাঢ় ভক্তি ইহাতেও হ্রাস হয় নাই। আমি পূর্ব্বে মনে করিতাম যে তুমি কেবল অর্থের জন্য সুজার প্রতি কাল্পনিক অনুরাগ প্রকাশ কর। কিন্তু এখন বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি যে তোমার সম্বন্ধে আমার এই মহা ভ্রম ছিল। তুমি সত্য সত্যই পতিপ্রাণা।

বউ বেগম। মা, আমি যে অর্থ সংগ্রহার্থ এত চেষ্টা করি, তাহা কি আমার নিজের জন্য। অর্থাভাবে বক্সারে ইহাদিগের কি অবস্থা হইয়াছিল তাহা হয় ত আপনি জানেন না। আপনারা বোধ হয় সে সময় রোটাসের কেল্লায় ছিলেন।

জগদম্বা। বক্সারে কি হইয়াছিল ?

বহু বেগম। বক্সারের যুদ্ধে ইংরাজদিগের জয়লাভ হইলে পর স্বয়ং বাদসাহ এবং বলবন্ত সিংহ আপন আপন সৈন্যসহ ইংরাজদিগের তাঁবুতে চলিয়া গেলেন। তাঁহারা উভয়েই ইংরাজদিগের পক্ষাবলম্বন করিলেন। নবাবের যে কিছু অর্থ সঙ্গে ছিল তাহা পূর্ব্বেই ব্যয় হইয়াছিল। নবাব তখন ঘোর বিপদে পড়িলেন। আপন সৈন্য সহ তাঁহার স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবারও উপায় রহিল না। তিনি তখন নবাব কাসিমালির সঙ্গে যে কিছু মূল্যবান মণিমুক্তা ছিল তাহা বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিবার হুকুম দিলেন। নবাবসৈন্যগণ বলপূর্ব্বক কাসিমালির তাম্বু হইতে তাঁহার মণিমুক্তা বাহির করিতে লাগিল। কাসিমালি তখন আপন তাম্বু হইতে বাহির হইয়া রাজ পরিচ্ছদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ফকিরের বেশ ধারণ করিলেন *। এদিকে নবাবের এই দুরবস্থার সংবাদ ফায়েজাবাদে পৌঁছিল। নবাবের কর্ম্মচারিগণ দুই তিন দিনের মধ্যেও টাকা পাঠাইলেন না। তখন আমি আমার সমুদয় গাত্রাভরণ বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক খোজা জহরালি, বহরালি এবং দারাবালি খাঁকে সঙ্গে করিয়া ছদ্মবেশে বক্সারে চলিয়া গিয়াছিলাম †। আমি তখন বক্সারে চলিয়া না গেলে নবাবের স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার আশা ছিল না। নিশ্চয়ই তিনি শত্রু-হস্তে নিপতিত হইতেন। যে দিন আমি বক্সারে পৌঁছিলাম তাহার পূর্ব্ব দিবস নবাব কাসিমালি ফকিরের পরিচ্ছদ ধারণ করিয়াছিলেন। আমার অনুরোধে নবাব তাঁহাকে ধৃত করিয়া আনিয়া বাধ্য করিয়া আবার রাজ-পরিচ্ছদ পরিধান করাইলেন। মা, রাজকোষে অর্থ না থাকিলে সময় সময় রাজ্যনাশের উপক্রম হয়। আবার এ দিকে স্বয়ং নবাব এবং তাঁহার পিতা পিতামহের অন্যূন দুই হাজার স্ত্রীলোক ভিন্ন ভিন্ন খোর্দ্দ মহলে পড়িয়া রহিয়াছে। আমার হাতে টাকা না থাকিলে এই সকল অনাথা স্ত্রীলোকের এবং

---

* As a last resource, Meer Kossim Khan endeavoured to work upon the feelings of shame in the breast of Shoojah-oo-Dowlah, and assuming the garb of a Fakeer, he seated himself outside the tent—*Broome's history of the Bengal Army page 465.*

† বউ বেগম বক্সারের যুদ্ধের পর যে স্বামীকে উদ্ধারার্থ বক্সারে চলিয়া গিয়াছিলেন তাহা স্মারিডনের বক্তৃতার মধ্যেও উল্লিখিত হইয়াছে।

তাহাদিগের সন্তানাদির কি উপায় হইবে বল দেখি? আমি যে টাকা সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত এত চেষ্টা করি সে কি নিজের বিলাসের নিমিত্ত?

জগদম্বা বেগম এবং তাহার কন্যা মীর কাসিমের স্ত্রী, বউ বেগমের কথা শুনিয়া একেবারে স্তব্ধ হইয়া পড়িলেন। বউ বেগম যখন এই সকল কথা বলিতেছিলেন, তখন তাঁহারা উভয়েই একাগ্রচিত্তে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার প্রত্যেক কথা অত্যন্ত আগ্রহাতিশয় সহকারে শুনিতে লাগিলেন। বউ বেগমের কথা শেষ হইলে পর জগদম্বা কিছু কাল সচিন্ত-মনে নির্ব্বাক থাকিয়া পরে বলিতে আরম্ভ করিলেন।—

"আমেতু, তোমার এই সকল কথা আমার অদ্ভুত স্বপ্নের ন্যায় মনে হয়। আমরা মুসলমানের কন্যা, নবাবের ঘরের বেগম। চন্দ্র সূর্য্যের মুখ দেখিতে পাই না। সর্ব্বদাই অন্দরের মধ্যে আবদ্ধ থাকি। আমাদের মনে কি এই রূপ সাহসের সঞ্চার হইতে পারে? এখন বুঝিলাম যে হৃদয়ের মধ্যে, ভালবাসা থাকিলে, অন্তরের মধ্যে প্রেম থাকিলে, মানুষ অসাধ্য সাধন করিতে পারে, অগ্নিতে ঝাঁপ দিতে পারে, পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিতে পারে। কি আশ্চর্য্য তুমি স্বামীর উদ্ধারার্থ একাকিনী সংগ্রাম ক্ষেত্রে পর্য্যন্ত গিয়াছিলে। পূর্ব্বে জানিতাম যে তুমি কেবল নবাবের মহাজন। নবাবকে কেবল টাকা ধার দিয়াই তাঁহাকে বাধ্য করিয়া রাখিয়াছ। কিন্তু আজ জানিলাম যে তুমি সেই কাফেরদিগের সীতা। হিন্দু-দিগের সীতার গল্প শুনিয়াছত? সে সীতা রাজপ্রাসাদ ছাড়িয়া স্বামীর সঙ্গে বনে গিয়াছিলেন।"

বউ বেগম। সীতার বাড়ী যে এখান হইতে দেখা যায়। সীতার বাড়ীর এত নিকটে থাকিয়া কি আর আমি তাঁহার কথা শুনি নাই।

বউ বেগম গবাক্ষের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন ঐ যে বট-গাছ দেখিতেছেন ঐ স্থানেই সীতার মন্দির ছিল বলিয়া হিন্দুরা বলে *।

জগদম্বা বেগম কিছু কাল সচিন্তমনে নির্ব্বাক থাকিয়া আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন।

"আমেতু, আজ তোমার কথা শুনিয়া আমার চক্ষু খুলিল। আজ আমার নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলাম। নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর যে কাফের

---

* ফায়েজাবাদস্থিত নবাবের প্রাসাদ হইতে অযোধ্যানগরের অনেক পুরাতন মন্দিরের চূড়া দেখা যাইত। ফায়েজাবাদ হইতে রামের অযোধ্যা তিন ক্রোশের অধিক দূর নহে।

পণ্ডিতের কথা তোমাদিগের নিকট বলিয়াছিলাম, সে কাফের সর্ব্বদাই বলিত যে স্ত্রীলোক যদি আপন ঈশ্বর প্রদত্ত প্রকৃতি সংরক্ষণ করিতে পারে তবে তাহার স্বামী যত কেন নিষ্ঠুর এবং পাপাচারী হউক না, সে নিশ্চয়ই আপন স্বামীর মন বান্ধিয়া রাখিতে পারিবে। কাফের পণ্ডিতের এ কথা আমি বিশ্বাস করিতাম না। কিন্তু এখন দেখিতেছি যে কাফের সত্য কথাই বলিয়াছিল। সুজা যে এত ব্যভিচারী ছিল তথাপ সে কখন তোমার অবাধ্য ছিল না। তুমি যখন যাহা বলিতে সে তাহাই করিত। আমি মনে করিতাম যে সুজা সময়ে সময়ে তোমার নিকট হইতে টাকা ধার লইতেছে সেই জন্যই সে তোমার এত বাধ্য। কিন্তু এখন বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি যে ভালবাসার শৃঙ্খলেই তুমি সুজাকে বান্ধিয়া রাখিয়াছিলে। হায়! হায়! তুমি সে দিন মনে করিলে অনায়াসে হাফেজ নন্দিনীর প্রাণরক্ষা করিতে পারিতে।

জগদম্বা বেগমের এই সকল কথা শুনিয়া বউ বেগম বলিতে লাগিলেন ;

"মা, আমারও এখন সে বিষয়ে চক্ষু খুলিয়াছে। সে সময় আমি আপনাকে সর্ব্বদাই বিদ্বেষ নেত্রে দর্শন করিতাম। সেই জন্য আপনার কোন উপদেশ, কোন পরামর্শই আমার ভাল বোধ হইত না। অনর্থক আপনাকে পতিঘাতিনী বলিয়া মনে করিতাম। বোধ হয় মানুষ, মানুষের বিরুদ্ধে মনে মনে এইরূপ বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিলে তাহার পদে পদে ভ্রম হয়। আমরা তো আর কাহার মনের কথা জানি না। মানুষের একটা দুইটা কার্য্য দেখিয়াই সে ভাল লোক কি মন্দ লোক তাহা অবধারণ করি।"

জগদম্বা। ঠিক কথাই বলিয়াছ। মানুষের পদে পদেই ভ্রম হয়। আমারও এজীবনে অনেক ভ্রম হইয়াছে। বোধ হয় আমি ক্রোধ এবং অভিমান যদি একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারিতাম, তবে নবাব জাফরালী এবং আমার হতভাগ্য মীরণকেও সংপথে আনিতে পারিতাম। যখন মীরণের কুক্রিয়া দর্শনে আমার চক্ষের জল পড়িত তখন মীরণের মনও একটু নরম হইত। দুই এক সময় আমার চক্ষের জল পড়িতে দেখিয়া সে কুকার্য্য হইতে বিরত হইত। কিন্তু তোমাকে একটা কথা আমি জিজ্ঞাসা করি আমাকে তুমি ঘৃণার চক্ষে দেখিতে, সেই জন্যই যেন আমার পরামর্শানুসারে হাফেজনন্দিনীকে স্থানান্তর করিলে না। কিন্তু তোমার স্বামী যে আবার একটি নূতন স্ত্রী গ্রহণ করিবেন সে জন্য তোমার মনে কি একটুও কষ্ট হয় নাই ?

বউ বেগম। আমার বিবাহের পর প্রথম প্রথম আমার মনে ইহাতে বড়ই কষ্ট হইত। তখন গোপনে বসিয়া ক্রন্দন করিতাম; আর ভাবিতাম যে নবাবেরা বোঝেন না যে তাঁহারা দিন দিন নূতন স্ত্রী গ্রহণ করিলে তাঁহাদের বেগমের কত কষ্ট হয়। কিন্তু নবাব যখন ক্রমে একটা দুইটা তিনটা পরে শত শত স্ত্রীলোক আনিয়া খোর্দ্দমহল পূর্ণ করিতে লাগিলেন তখন ক্রমে ক্রমে আমার সে মনোদুঃখ হ্রাস হইতে লাগিল। আসফউদ্দৌলার জন্মিবার পরে আমি সে বিষয়ে আর ভ্রূক্ষেপও করিতাম না। নবাব নিজে সুখে থাকেন তাহাই কেবল আমার ইচ্ছা।

বেগম এই কথা বলিয়া অচৈতন্যাবস্থায় শায়িত নবাব সুজাউদ্দৌলার গলিত মুখের উপর আস্তে আস্তে হাত বুলাইতে লাগিলেন; সতৃষ্ণ নয়নে সেই মুখ খানির দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিছু কাল সকলেই নির্ব্বাক থাকিলেন। পরে জগদম্বা আবার বলিতে লাগিলেন—

"আমেতু, তুমি যথার্থ কথাই বলিয়াছ। পাপাচার ও ব্যভিচার দেখিতে দেখিতে পাপকে পাপ বলিয়া বোধ হয় না; ব্যভিচারকে ব্যভিচার বলিয়া বোধ হয় না। সকলই ক্রমে সহ্য হইয়া যায়। কিন্তু আমার মনে হয় যে সংসারের পাপ এবং ব্যভিচারের উপর চিরকাল ঘৃণার ভাব পোষণ না করিলে মানুষকে ধীরে ধীরে সেই পাপ ও কলঙ্কের মধ্যে ডুবিতে হয়। যতদিন পাপ ও কলঙ্কের প্রতি ঘৃণার ভাব থাকে ততদিন পর্য্যন্তই মানুষ পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক থাকে। সুজার ব্যভিচারের প্রতি যদি তোমার পূর্ব্বের ন্যায় ঘৃণার ভাব পরেও থাকিত তবে সে দিন নিশ্চয়ই তুমি হাফেজনন্দিনীকে স্থানান্তর করিবার চেষ্টা করিতে। তাহা হইলে আর আজ এ বিপদ উপস্থিত হইত না। এ সংসারের কার্য্যকলাপ দেখিয়া আমি এই স্থির করিয়াছি যে পাপ ও কলঙ্কের উপর চিরকালই ঘৃণার ভাব পোষণ করিব। তাহা না করিলেই মানুষকে পাপের স্রোতে ভাসিয়া ক্রমে বিপদ সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়।"

বউ বেগম। আমি তো এখন সেই বিপদ সাগরে ভাসিতেছি। আমি এখন আপনাকে স্বর্গের দেবতা বলিয়া মনে করি। আমি সে দিন চেষ্টা করিলে অনায়াসে হাফেজনন্দিনীর প্রাণ রক্ষা করিতে পারিতাম। এ নারী-হত্যার পাপ তো নবাবের নহে। আমি ইচ্ছা করিয়া যখন নারী হত্যা নিবারণ করি নাই তখন এ সমুদয় আমার দোষ। আপনার কোন কথাই

মিথ্যা হয় না। আপনার সে দিনের কথা স্মরণ হইলে আমার হৃদয় কাঁপিয়া উঠে। আপনি বলিয়াছেন যে হাফেজনন্দিনীর হত্যার নিমিত্ত রাজ্য বিনাশ হইবে, অনেক কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু সেই রাজ্য নাশের সকল লক্ষণই দেখিতে পাই। নবাবের এখন আর প্রাণের আশা একেবারেই নাই। আসফউদ্দৌলা কি এ রাজ্য রক্ষা করিতে পারিবেন?

বউ বেগম এই বলিয়া স্বামীর মস্তকের উপর হস্ত রাখিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। জগদম্বা বেগম তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে নবাব মাতা মতীবেগম স্বয়ং আসিয়া পুত্রবধূর হস্ত ধরিয়া তাঁহাকে স্নান আহার করাইবার নিমিত্ত প্রকোষ্ঠান্তরে লইয়া গেলেন। সুজার শরীর পচিতে আরম্ভ হইলে পর মতীবেগমকে অন্যান্য লোক সুজার শয়ন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিতে দিতেন না। পুত্রের স্বর্ণকান্তি শরীর এইরূপ বিকৃতাবস্থায় দেখিলেই জননীর হৃদয় বিদীর্ণ হইত।—তিনি উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিতেন।

——:*:——

বিংশতিতম অধ্যায়।

নূতন সন্ধি।

পূর্ব্ব অধ্যায়ের উল্লিখিত ঘটনার দুই দিবস পরেই অযোধ্যার তৃতীয় উজীর নবাব সুজাউদ্দৌলার মৃত্যু হইল। ফায়েজাবাদের সর্ব্বত্র হাহাকারে পরিপূর্ণ হইল। পাঠক ও পাঠিকাগণ হয়ত মনে করিবেন যে একি আশ্চর্য্য! ইন্দ্রিয়াসক্ত লম্পট নবাব সুজাউদ্দৌলার নিমিত্তও প্রজাগণ ক্রন্দন করিয়াছিল?

কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিলে সহজেই উপলব্ধি হইবে যে সুজার নিমিত্ত যে প্রজাগণ ক্রন্দন করিয়াছিল, এ বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার নহে। বহু বিবাহ এবং শত শত উপপত্নী রক্ষণ প্রথা এই সময় পাপ বলিয়া কেহ মনে করিত না। নবাব এবং ধনী লোকদিগের মধ্যে এই কুপ্রথা বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল; সমাজ ব্যাপ্ত পাপ ও কুপ্রথা কখনও জন সাধারণের নিকট অন্যায় বলিয়া বোধ হয় না। সুজাউদ্দৌলা বর্ত্তমান সময়ের জন-সাধারণের নিকট যে দোষে দোষী, শত বৎসর পূর্ব্বে লোকে সে দোষকে দোষ বলিয়াই মনে করিত না। পক্ষান্তরে সুজাউদ্দৌলা আপন প্রজাদিগের মঙ্গল সাধনার্থ

বিশেষ যত্ন করিতেন। তাঁহার সময়ে প্রজাদিগকে কোন প্রকার অন্ন কষ্ট ভোগ করিতে হইত না। পাছে প্রজাদিগের উপর ডাকাতী হয়, এই জন্য তিনি ইংরাজ বণিকদিগকে প্রাণান্তেও আপন রাজ্য মধ্যে বাণিজ্যের দোকান খুলিতে দিতেন না। এরূপ কথিত আছে উইলিয়েম বোল্ট নামক এক জন ইংরাজ প্রথমতঃ বঙ্গদেশের অন্তর্গত পূর্ণিয়া জেলায় বাণিজ্য উপলক্ষে বিবিধ অত্যাচার এবং অসদাচরণ নিবন্ধন মীরকাসিমের রাজত্ব কালে পূর্ণিয়া হইতে তাড়িত হয়। পরে এই ব্যক্তি সুজাউদ্দৌল্লার রাজ্য মধ্যে বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করিবামাত্র, সুজাউদ্দৌলা এই বিষয়ে আপত্তি করিয়া বঙ্গের গবর্ণর বেরেলষ্ট সাহেবের নিকট পত্র লিখিলেন। বেরেলষ্ট সাহেব বোল্ট সাহেবকে তাহার বাণিজ্যের কারবার উঠাইয়া আনিবার নিমিত্ত হুকুম করিলেন। কিন্তু বোল্ট সাহেব নানাপ্রকার ছলনা করিয়া আপন বাণিজ্যের কারবার উঠাইয়া আনিতে বিলম্ব করিতে লাগিল। তখন সুজাউদ্দৌলা পুনর্ব্বার বেরেলষ্ট সাহেবের নিকট পত্র লিখিবামাত্র বেরেলষ্ট সাহেব বোল্ট সাহেবকে গ্রেপ্তার করিয়া বন্দীস্বরূপ বিলাতে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

এই প্রকার অপরের অত্যাচার হইতে আপন প্রজাদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত নবাব সুজাউদ্দৌলা সর্ব্বদাই প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। সুতরাং তজ্জন্যই তাঁহার মৃত্যুতে অযোধ্যাবাসী জন-সাধারণের মধ্যে হাহাকার ধ্বনি সমুত্থিত হইল।

সুজাউদ্দৌলার সময়ে অযোধ্যা ভারতের উদ্যান বলিয়া অভিহিত হইত। বস্তুত অযোধ্যা যে ভারতের উদ্যান ছিল তাহার কোন সন্দেহ নাই। পুণ্যবতী সরযূ নদী ইহার বক্ষে প্রবাহিত হইয়া সমুদয় দেশকে শস্যে পরিপূর্ণ করিত। এদেশের জল বায়ু স্পর্শে চিররুগ্ন শরীর সুস্থ হইত। কিন্তু এখন আর অযোধ্যার সে অবস্থা নাই। এখন ইহার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত কেবল অন্ন কষ্টের চীৎকার শুনা যায়। এক তৃতীয়াংশ অধিবাসীদিগকে দিবারাত্রের মধ্যে কেবল মাত্র একবার আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতে হয়। * * * * * * * *

* * * * * * * * * * *

বউ বেগমের আদেশানুসারে নবাব সরকারের প্রধান প্রধান মুসলমান কর্ম্মচারিগণ সুজার মৃতদেহ নবাব প্রাসাদের পূর্ব্বদিকে গোলাপ বাগানের নিকটবর্ত্তী স্থানে সমাধিস্থ করিবার নিমিত্ত লইয়া চলিলেন। কি হিন্দু, কি

মুসলমান, নগরের অধিকাংশ লোক হাহাকার করিতে করিতে মৃত শবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। খৃষ্টীয় ১৭৭৫ শকের ফেব্রুয়ারি মাসে মৃজা জালালদ্দীন হায়দর নবাব সুজাউদ্দোলার মৃতদেহ তাঁহার পিতা নবাব মনশুর আলি খাঁ সবদরজাঙ্গ বাহাদুরের মৃত দেহের পশ্চিম পার্শ্বে সমাধিস্থ করা হইল।

এদিকে সুজাউদ্দোলার মৃতদেহ সমাধিস্থ করিয়া কর্ম্মচারীদিগের গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পূর্ব্বেই সুজার জ্যেষ্ঠ পুত্র নবাব আসফউদ্দোলা সিংহাসনারোহণার্থ যার পর নাই আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সুজার মৃত্যুকালে তাঁহার পুত্রগণ মধ্যে আসফউদ্দোলা, সাদাতালি খাঁ এবং মৃজাজুঙ্গলী, এই তিন জন মাত্র প্রাপ্ত বয়স্ক ছিলেন। ইহাঁদিগের মধ্যে আসফউদ্দোলা অত্যন্ত ভীরু এবং নিস্তেজ ছিলেন। বদান্যতা ভিন্ন তাঁহার মধ্যে আর কোন গুণ ছিল না। তিনি অত্যন্ত দাতা ছিলেন। অযোধ্যাবাসী জন-সাধারণের মুখে এই কথা সর্ব্বদাই শুনা যাইত যে পরমেশ্বরের নিকট যাজ্ঞা করিয়াও কেহ বঞ্চিত হইতে পারে কিন্তু আসফউদ্দোলার নিকট কোন বিষয়ে কেহ যাজ্ঞা করিলে তাহার প্রার্থনা নিষ্ফল হয় না।

আসফউদ্দোলার রাজ্য শাসন করিবার ক্ষমতা একেবারেই ছিল না। কিন্তু সুজা ইহা জানিয়া শুনিয়াও আসফউদ্দোলাকেই সিংহাসন প্রদান করিবেন বলিয়া পূর্ব্বেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। আসফউদ্দোলা বউ বেগমের গর্ভজাত সন্তান। এই জন্যই সুজা তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্নেহ করিতেন। কিন্তু সুজার সন্তানগণ মধ্যে সাদাতালি খাঁর রাজ্য শাসনের বিলক্ষণ ক্ষমতা ছিল; এবং মৃজা জুঙ্গলী সাংগ্রামিক কৌশলে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। সাদাতালির জীবনে স্বীয় পিতার কার্য্য দক্ষতা এবং চিন্তাশীলতা সর্ব্বদাই পরিলক্ষিত হইত। আর মৃজাজুঙ্গলী পিতার রণকৌশল লাভ করিয়াছিলেন।

নির্ব্বোধ আসফউদ্দোলা সিংহাসনারূঢ় হইয়া যদি আপন জননীর উপদেশানুসারে আপন ভ্রাতৃদ্বয়ের হস্তে রাজকার্য্যের অনেক ভার প্রদান করিতেন তবে আর তাঁহাকে চিরদুঃখে কাল যাপন করিতে হইত না কিন্তু মার্ত্তুজা খাঁ ভিন্ন তিনি আর কাহারও পরামর্শ গ্রহণ করিতেন না পিতার মৃত দেহ সমাধিস্থ হইবার পূর্ব্বেই তিনি সিংহাসনে উপবেশ

করিবার নিমিত্ত বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলে, বউ বেগম তাঁহাকে বারম্বার বলিতে লাগিলেন—

"বাছা অন্ততঃ তিন দিন অপেক্ষা কর। এ সিংহাসন সম্বন্ধে তোমার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নাই।"

কিন্তু আসফউদ্দৌলা জননীর কথায় একেবারেই কর্ণপাত করিলেন না। তখন তাঁহার পিতামহী জোনাবে আলিয়া মতীবেগম পৌত্রের নিকট আসিয়া বলিতে লাগিলেন—

"বাছা তোমার কোন শঙ্কা নাই। তোমাকে কেহই সিংহাসন হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবে না। বিশ বৎসর পূর্ব্বে তোমার পিতা সিংহাসনারূঢ় হইবামাত্র রাজ্য মধ্যে বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠিবার উপক্রম হইয়াছিল। ইস্মায়েলবেগ খাঁ গোপনে গোপনে বিদ্রোহীদিগকে উৎসাহ প্রদান করিয়াছিল। আমি তখন রাজা রামনারায়ণকে বলিয়া কহিয়া সমুদয় গোলযোগ নিবারণ করিয়া দিলাম *। তুমি বরং হিন্দুমন্ত্রীদিগের পরামর্শানুসারে কার্য্য কর। মার্ত্তুজা খাঁর উপদেশানুসারে কার্য্য করিলে চরমে কষ্ট পাইতে হইবে।"

আসফউদ্দৌলা পিতামহীর উপদেশও শ্রবণ করিলেন না। তৎক্ষণাৎ ইংরাজ রেসিডেণ্টকে ডাকাইয়া আনিয়া মসনাদের উপর উপবেশন করিলেন। মার্ত্তুজা খাঁকে প্রধান মন্ত্রীর পদ প্রদানার্থ চক্রান্ত করিয়া বৃদ্ধ মন্ত্রী মহম্মদ ইরাজ খাঁকে বাদসাহের নিকট হইতে সনন্দ আনয়নের ছলনায় দিল্লীতে প্রেরণ করিলেন।

সুজাউদ্দৌলার মৃত্যু এবং আসফউদ্দৌলার সিংহাসনারোহণের সংবাদ কলিকাতা কৌন্সিলে পৌছিবামাত্র কৌন্সিলের মেম্বরগণ আসফউদ্দৌলার সঙ্গে নূতন সন্ধি সংস্থাপনের প্রস্তাব করিলেন। তাঁহারা বলিয়া উঠিলেন সুজাউদ্দৌলার সঙ্গে যে সন্ধি হইয়াছিল তদ্দ্বারা আসফউদ্দৌলাকে বাধ্য করা যাইতে পারে না। ইতিপূর্ব্বে গবর্ণর জেনেরেল হেষ্টিংসের আপন লোক মিডল্টন সাহেব অযোধ্যার দরবারে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির পক্ষে রেসিডেণ্ট ছিলেন। হেষ্টিংস সাহেব মিডল্টন সাহেবের পত্রাদি কৌন্সিলের অন্যান্য মেম্বরদিগকে দেখিতে দিতেন না।

* সুজাউদ্দৌলা একজন ক্ষত্রিয় রমণীকে বলপূর্ব্বক অন্দরভুক্ত করিলে পর এই বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। সায়দ কামালুদ্দীন হায়দরের লিখিত ইতিহাসে এই বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে।

কৌন্সিলের মধ্যে হেষ্টিংসের বিপক্ষ মেম্বরগণ হেষ্টিংসের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া মিডল্টন সাহেবের পরিবর্ত্তে ব্রিষ্টো সাহেবকে অযোধ্যার রেসিডেন্টের পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। এখন ব্রিষ্টো সাহেবই রেসিডেন্টের পদে নিযুক্ত আছেন।

সুজা উদ্দৌলার মৃত্যুর চারি মাস পরে অর্থাৎ ১৭৭৫ সালের মে মাসে আসফ উদ্দৌলার সঙ্গে ইংরাজদিগের নূতন সন্ধি পত্র লেখা পড়া হইল। পূর্ব্ব সন্ধিপত্র অনুসারে সুজা উদ্দৌলাকে আপন রাজ্যে ইংরাজ সৈন্য রাখিবার নিমিত্ত ইংরাজ সৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ মাসে মাসে দুই লক্ষ দশ হাজার টাকা দিতে হইত। কিন্তু নূতন সন্ধিপত্র দ্বারা আর পঞ্চাশ হাজার টাকা বৃদ্ধি করা হইল। দুই লক্ষ দশ হাজারের স্থানে ইংরাজেরা আসফ উদ্দৌলাকে দুই লক্ষ ষাট হাজার টাকা দিতে বাধ্য করিলেন। নিস্তেজ আসফ উদ্দৌলা ইহাতে কোন আপত্তি করিলেন না। এতদ্ভিন্ন এই সন্ধি পত্রদ্বারা চৈৎসিংহের রাজ্য ইংরাজ রাজ্যভুক্ত করা হইল। এ পর্য্যন্ত চৈৎসিংহ অযোধ্যার উজীরের অধীনে করপ্রদ রাজা ছিলেন। অযোধ্যার উজীরকে তাঁহার কর প্রদান করিতে হইত। কিন্তু এই নূতন সন্ধি স্থাপন উপলক্ষে তাহার দেয় কর ইংরাজেরা পাইবেন বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। চৈৎসিংহ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বার্ষিক ২২,৬৬,১৮০ বাইশ লক্ষ ছয়ষট্টি হাজার একশত আশী টাকা দিতে অগত্যা স্বীকার করিলেন, এবং ইংরাজদিগকে সেই মর্ম্মে কবুলিয়ত লিখিয়া দিলেন। এই সন্ধি পত্র দ্বারা আসফ উদ্দৌলা মীরকাসিমকে স্বরাজ্যে কখনও স্থান প্রদান করিবেন না বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন, এবং ধৃত করিতে পারিলে ইংরাজদিগের হাতে সমর্পণ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন।

এই সন্ধিপত্র লিপিবদ্ধ হইলে পর দলে দলে ইংরাজগণ আসিয়া অযোধ্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। বঙ্গদেশ ইতিপূর্ব্বেই উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে। বঙ্গদেশে এখন আর লোকের প্রাণবধ করিলেও টাকা বাহির হয় না। বঙ্গদেশ ছারখার হইয়াছে। অমৃতফলের লোভে শ্রীরামচন্দ্রের অনুচরগণ ত্রেতাযুগে যদ্রূপ দলে দলে রাবণের উদ্যানে প্রবেশ করিয়া স্বর্ণলঙ্কা ছারখার করিয়াছিল, আসফ উদ্দৌলার রাজত্বের প্রারম্ভে অযোধ্যায় ঠিক সেই প্রকার অভিনয় আরম্ভ হইল।

গবর্ণর জেনেরেল ওয়ারেণ হেষ্টিংসের বিপক্ষগণ হেষ্টিংসের নিজের লোক

মিডলটন সাহেবকে পদচ্যুত করিলে পর হেষ্টিংস দেখিলেন যে তাঁহার নিজের উৎকোচ সম্বন্ধে কোন বন্দোবস্ত চলেনা। সুতরাং তিনি ঐবরাও বন্দোবস্তের নিমিত্ত পামার সাহেবকে অযোধ্যার দরবারে রাখিয়া দিলেন। পামার সাহেবের সমুদয় ব্যয়ও আসফ উদ্দৌলাকে দিতে হইত।

আসফ উদ্দৌলা অত্যন্ত দাতা ছিলেন। তাঁহার নিকট কেহ অর্থের প্রার্থনা করিলে তিনি কখন অস্বীকার করিতে পারিতেন না। অযোধ্যাবাসী ইংরাজগণ বিশেষতঃ ইংরাজ রমণীগণ সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। বৎসরেক মধ্যে তাঁহার রাজকোষ প্রায় শূন্য হইয়া পড়িল।

দেশীয় রাজগণের দরবারে এখনও যে সকল ইংরাজেরা থাকেন, তাঁহাদের অনেকের পরিবারস্থ রমণীগণ এই সকল রাজাদিগের নিকট হইতে অর্থ সঞ্চয় করিবার কৌশল বিলক্ষণ জানেন। পুরাকালে ভারতবর্ষীয় রাজগণের নিকট হইতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ এবং নবাবদিগের নিকট হইতে হাফেজ এবং মৌলবীগণ সর্ব্বদাই অর্থ লাভ করিতেন। কিন্তু ভারতবর্ষে এই শ্বেতাঙ্গিনী ব্রাহ্মণীদিগের সমাগমের পর ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, হাফেজ, মৌলবী সকলেরই অন্ন মারা গিয়াছে। এখন আর দেশীয় রাজগণ হইতে কোন পণ্ডিত সেই পুরাতন শাস্ত্রের কথা আবৃত্তি করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিতে পারেন না। ইংরাজ রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে নবযুগের আরম্ভ হইয়াছে। দেশীয় অনেকানেক রাজা এবং জমীদার পিতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে নবদ্বীপের টোলের পণ্ডিতকে আট গণ্ডা পয়সা দিতে বিশেষ কৃপণতা প্রদর্শন করেন, কিন্তু শ্বেতাঙ্গিনী ভগিনীদিগকে উপঢৌকন প্রদান কালে কিম্বা শ্বেতাঙ্গ ভ্রাতাদিগের নাম চিরস্মরণীয় করিবার নিমিত্ত সহস্র সহস্র টাকা অকাতরে প্রদান করেন।

একবিংশতিতম অধ্যায়।

একরারনামা।

সুজার মৃত্যুর পর দুই মাস গত হইতে না হইতেই আসফউদ্দৌলার রাজকোষ শূন্য হইয়া পড়িল। তিনি ইংরাজ সৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ

মাসে মাসে যে দুই লক্ষ ষাট হাজার টাকা ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীকে দিতে স্বীকার করিয়াছেন ছয় মাসের মধ্যে তাহার এক পয়সাও দিতে পারিলেন না। কিন্তু তাঁহার সিংহাসনারোহণের পর ছয় মাসের মধ্যে অন্যূন এক কোটী টাকা ব্যয় হইয়া গেল। এই এক কোটী টাকার মধ্যে প্রায় আশী হাজার টাকাই ইংরাজ সৈন্য, ইংরাজ কর্ম্মচারী এবং ইংরাজ রমণীদিগের মধ্যে বিতরিত হইল।

রাজস্ব বিভাগের কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে আমিল, নায়েব এবং তহসিলদার যখন যে কিছু রাজস্ব আদায় করিয়া পাঠাইতেন, তাহা তৎক্ষণাৎ ব্যয় হইয়া যাইতে লাগিল। এই সকল আমিল, নায়েব এবং তহসিলদারের প্রেরিত টাকা নবাবের খাজাখানা পর্য্যন্তও পৌঁছিত না। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ কোম্পানীর প্রাপ্য টাকা উসুলার্থ বিশেষ যত্ন করিতেন না। তাঁহারা বিলক্ষণ জানিতেন যে, কোম্পানীর প্রাপ্য টাকা নবাবকে নিশ্চয়ই দিতে হইবে। প্রত্যেক ইংরাজ কর্ম্মচারী নিজে গোপনে গোপনে নবাবের নিকট হইতে যত টাকা আদায় করিতে পারেন তাহারই কেবল চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আসফউদ্দৌলার হাতে টাকা না থাকিলেই তিনি স্বীয় জননী এবং পিতামহীর নিকট হইতে ছলে বলে টাকা বাহির করিবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহার জননীর তহবিল হইতে ক্রমে ছাব্বিশ লক্ষ টাকা বাহির করিলেন। তাঁহার জননী সর্ব্বদাই তাঁহাকে ব্যয় সঙ্কোচ করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি নিতান্ত নিস্তেজ ছিলেন। ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ বখসিস্ ইত্যাদি বলিয়া টাকা চাহিলে তিনি চক্ষুলজ্জায় কখনও টাকা দিতে অস্বীকার করিতে পারিতেন না।

এদিকে বৃদ্ধ মন্ত্রী মহম্মদ ইলাজ খাঁ ইতিপূর্ব্বে দিল্লীতে প্রেরিত হইয়াছেন। মার্তুজা খাঁ প্রধান মন্ত্রীর পদ লাভ করিয়া এখন নায়েব উজীর মাখ্তুরাদ্উদ্দৌলা নামে পরিচিত হইলেন। ইনি সর্ব্বদাই নবাবকে তাঁহার জননী ও পিতামহীর অর্থাপহরণার্থ পরামর্শ প্রদান করিতে লাগিলেন।

সিংহাসনারোহণের পর আট মাসের মধ্যে নবাব কোম্পানীর প্রাপ্য টাকার একটী পয়সাও পরিশোধ করিতে সমর্থ হইলেন না। মাসে মাসে দুই লক্ষ ষাট হাজার টাকা দেনা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কলিকাতা কৌন্সিল

অবিলম্বে নবাবের নিকট হইতে টাকা আদায় করিবার নিমিত্ত রেসিডেণ্ট ব্রিষ্টো সাহেবকে হুকুম করিয়া পাঠাইলেন।

ব্রিষ্টো সাহেব নবাবকে কলিকাতা কৌন্সিলের হুকুম জ্ঞাত করাইলে নবাব ঘোর বিপদে পড়িলেন। নবাবের হাতে একটী পয়সাও নাই। ইংরাজেরা দেখিলেন যে নবাবের এখন আর কোন প্রকারেই টাকা প্রদান করিবার সাধ্য নাই। তাহারা তখন নবাবকে তাঁহার মাতার তহবিল হইতে টাকা আনিতে পরামর্শ দিলেন। আসফউদ্দৌলা নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক ছিলেন না। আপন জননীর উপর অত্যাচার করিতে তাঁহার একেবারেই ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু টাকা বাহির করিবার ফন্দি ইংরাজেরা যেরূপ জানেন এইরূপ আর কেহই জানে না। তাঁহারা দুই চারি জন মৌলবীকে আসফউদ্দৌলার নিকট উপস্থিত করিলেন। এই সকল মৌলবী ফতেহা প্রদান করিলেন, যে, বেগমদিগের তহবিলের টাকায় বেগমদের কোন সত্বাধিকার নাই; ঐ সকল টাকা নবাব সুজাউদ্দৌলার ছিল; সুজাউদ্দৌ-লার মৃত্যুর পর আসফউদ্দৌলা উত্তরাধিকারক্রমে ঐ টাকার মালিক হইয়াছেন।

মৌলবীদিগের এই ফতেহা হস্তে করিয়া মন্ত্রী মাখ্‌তুবাদ উদ্দৌলা বউ বেগমের নিকট আসিলেন। বেগমের নিকট আপন বক্তব্য বিষয় বলিবা-মাত্র বউ বেগম সক্রোধে মাৰ্ত্তুজাখাঁকে ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন, "তোর নবাবের নিকট যাইয়া বল, যে, তার বাবার কোন টাকা আমার নিকট নাই। আমার হাতের টাকা আমার বাবার নিকট হইতে আমি পাই-য়াছি।*

বেগমকে কোপাবিষ্ট দেখিয়া মাখ্‌তুবাদ উদ্দৌলার আর একটী কথা বলিবারও সাহস হইল না। তিনি নবাবের নিকট চলিয়া গেলেন। এদিকে বলপূর্ব্বক বেগমের টাকা অপহরণ করিবার চক্রান্ত হইতে লাগিল। ইংরাজ রেসিডেণ্ট এবং মাখ্‌তুবাদ উদ্দৌলাই ইহার প্রধান চক্রান্তকারী।

* বক্সারের যুদ্ধের পর বউ বেগম তাঁহার পিতৃ প্রদত্ত আভরণ পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া স্বামীর উদ্ধারার্থ কতক টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সেই টাকা পরিশোধকালে সুজা বেগমের নিকট হইতে যে পরিমাণ টাকা পাইয়াছিলেন তাহার চতুর্গুণ প্রদান করিয়াছিলেন। সেই জন্যই বেগম আপন তহবীলের টাকা পিতৃ প্রদত্ত টাকা বলিয়া মনে করিতেন।

তিনজন বিশ্বাসী ভৃত্য ভিন্ন বেগমের সাহায্য করে এমন লোক অন্য ছিল না। তাঁহার ভৃত্যদিগের মধ্যে খোজা জহরালীখাঁ, বহরালীখাঁ এবং দারাবালীখাঁর প্রভুভক্তির কথা শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। বেগমের মঙ্গলার্থ ইহারা প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। জহ-রালী এবং বহরালী বেগমের পিত্রালয় হইতে তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিল। বেগম বাল্যাবস্থায় ইহাদিগের অঙ্কেই প্রতিপালিত হইয়াছেন। ইহারা উভয়েই বেগমকে আপন কন্যার ন্যায় স্নেহ করিত।

খোজা দারাবালীখাঁকে * বেগম নিজে সন্তানের ন্যায় প্রতিপালন করি-তেন। ছয় বৎসর বয়সের সময় দারাবালী বেগমের অন্দরভুক্ত হইলে স্বয়ং বেগম ইহাকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া দারাবালী নাম প্রদান করিয়াছেন।

দারাবালীখাঁর প্রখর বুদ্ধি ছিল। সে নায়েব উজীর মাখ্তুবাদউদ্দৌ-লার এবং ইংরাজ রেসিডেন্টের চক্রান্তের বিষয় জানিতে পারিয়া গোপনে বেগমের নিকট সমুদয় কথা বলিল।

বেগম এই সকল চক্রান্তের কথা শুনিয়া একেবারে হতাশ্বাস হইয়া পড়িলেন। একে তো স্বামীশোকে তিনি বিশেষ মানসিক কষ্ট ভোগ করিতেছেন, ইহার উপর আবার রাজ্যনাশের উপক্রম হইয়া উঠিল; কি উপায় অবলম্বন করিবেন তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

দারাবালি খাঁ অত্যন্ত তেজস্বী যুবক ছিল। সে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বেগমের সম্পত্তি রক্ষার পরামর্শ প্রদান করিল। কিন্তু জগদম্বা বেগম এইরূপ পরামর্শ অনুমোদন করিলেন না। তিনি প্রথমতঃ কলিকাতার গবর্ণর জেনেরেল হেষ্টিংস সাহেবের নিকট বেগমকে এক পত্র লিখিতে পরামর্শ দিলেন।

জগদম্বা বেগমের প্রতি বউ বেগমের এখন বিশেষ ভক্তি হইয়াছে। তিনি তাঁহার পরামর্শ অনুসারে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের নিকট পারস্যভাষায় এই মর্ম্মে পত্র লিখিলেন —

---

* খোজা দারাবালীখাঁ হিন্দুর সন্তান ছিল। ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বেচুসিংহের পৌত্র ও প্রপৌত্রগণ সম্প্রতি লর্ড ডফরিণের নিকট দারাবালীর উত্তরাধিকারী সূত্রে বেগমের প্রদত্ত টাকা পাইবার প্রার্থনা করিয়াছেন।

"স্বর্গীয় নবাব জীবিত থাকিতে তাঁহার সঙ্গে আপনার বিশেষ সৌহার্দ্দ্য ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর শত্রু হস্ত হইতে তাঁহার রাজ্যরক্ষার্থ এখনও আপনাদের সৈন্যই নিযুক্ত রহিয়াছে। তাঁহার মৃত্যুতে আমি এবং তাঁহার অন্যান্য পত্নীগণ অনাথা হইয়া পড়িয়াছি। আমাদিগের মান সম্ভ্রম এবং সম্পত্তি রক্ষার ভারও আপনার হস্তেই ন্যস্ত হইয়াছে। স্বর্গীয় নবাবের সঙ্গে আপনার যেরূপ আত্মীয়তা ছিল, তাহাতে আমরা প্রত্যাশা করি যে অপরের অত্যাচারণ হইতে আপনি অবশ্যই আমাদিগকে রক্ষা করিতে যত্ন করিবেন।

"আমার পুত্র নবাব আসফউদ্দৌলার রাজকার্য্য কিম্বা শাসন প্রণালী সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা নাই। তিনি সর্ব্বদাই মার্ত্তুজা খাঁর পরামর্শানুসারে কার্য্য করিতেছেন। নবাব আসফউদ্দৌলাকে রাজ্যভার হইতে বঞ্চিত করিতে আমি ইচ্ছা করি না। তাঁহার রাজপদ বজায় থাকে, তিনি সুশৃঙ্খলা সহকারে রাজ্য শাসন করিতে পারেন, তাহাই আমি পরমেশ্বরের নিকট সর্ব্বদা প্রার্থনা করি। কিন্তু মার্ত্তুজা খাঁর হাতে রাজকার্য্যের ভার থাকিলে অবিলম্বেই এ রাজ্য নষ্ট হইবে।

"মার্ত্তুজা খাঁ নবাব আসফউদ্দৌলাকে আমাদিগের ধন সম্পত্তি হরণ করিবার পরামর্শ প্রদান করিতেছে। যেরূপ অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে মান সম্ভ্রম সহকারে যে আমরা ফায়েজাবাদে থাকিতে পারি তাহার সম্ভব নাই। আপনি যদি অনুমতি করেন, তবে আমি স্বর্গীয় নবাবের অন্যান্য দুইশত স্ত্রী এবং নবাব মনসুর আলি খাঁ সফদর জাঙ্গ বাহাদুরের এবং নবাব বরহান মুল্‌কের স্ত্রীলোকদিগকে সঙ্গে করিয়া, আপনাদের রাজ্যের মধ্যে কোন এক স্থানে যাইয়া বাস করিব।

"জোনাবে আলীয়া সত্বরই মক্কা শরিপ চলিয়া যাইবেন। সুতরাং উপরোক্ত দুই হাজার স্ত্রীলোক ও তাহাদিগের সন্তান সন্ততির প্রতিপালনের ভার সম্পূর্ণরূপে আমার উপর ন্যস্ত হইবে।

"আপনি এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া, আপনার শারীরিক ও রাজ্য সম্বন্ধীয় শুভ সংবাদসহ অনুগ্রহ পূর্ব্বক সত্বর পত্রের প্রত্যুত্তর লিখিবেন।

দস্তখত

বউ বেগম।

এই পত্র প্রেরণের কয়েক দিন পরে সুজাউদ্দৌলার জননী জোনাবে আলীয়া অর্থাৎ মতী বেগমও ওয়ারেণ হেষ্টিংসের নিকট এক পত্র লিখিলেন।

সে পত্রে অধিক কিছু লিখিত হয় নাই। তিনি স্বীয় সম্পত্তি আপন পুত্রবধূ বউবেগমের হাতে অর্পণ করিয়া মক্কা যাইবার বাসনা প্রকাশ করিলেন।

বউ বেগমের অর্থাপহরণের পরামর্শ প্রথমতঃ ইংরাজরাই মার্ত্তুজাখাঁকে প্রদান করিয়াছিলেন। নহিলে নবাবকে এইরূপ পরামর্শ প্রদান করিতে মার্ত্তুজা খাঁর কখন সাহসও হইত না। কপটাচারী ধূর্ত্ত ওয়ারেন হেষ্টিংস পূর্ব্ব হইতে ইহার চক্রান্ত করিতেছিলেন। তিনি বিলক্ষণ জানিতেন যে নবাবের হাতে একেবারেই টাকা নাই। নবাবের প্রাণ সংহার করিবার ভয় প্রদর্শন করিলেও তিনি টাকা দিতে পারিবেন না। সুতরাং বেগমের টাকা অপহরণের পরামর্শ স্থিরীকৃত হইয়াছিল। কিন্তু প্রকাশ্যে হেষ্টিংস বেগমের পত্রের প্রত্যুত্তরে লিখিলেন, "নবাব এখন দায়বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। এই সময় আপনি নবাবকে কিছু ঋণ প্রদান করিয়া, তাঁহার রাজ্য রক্ষার উপায় করিয়া দিলে ভাল হয়। এবার আপনি নবাবকে সাহায্য করিলে ভবিষ্যতে নবাব আর কখনও আপনার তহবিলের টাকা কিম্বা আপনার জায়গীর সম্বন্ধে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না।"

বেগমের সন্তোষার্থ নবাব আসফ্‌উদ্দৌলাকে হেষ্টিংস এক উপদেশ-পূর্ণ পত্র লিখিলেন। ছয় বৎসরের বালককে স্কুলের পণ্ডিত প্রতি দিন যে সকল কথা বলেন, তাহা সমুদয়ই এই পত্রে লিখিত হইয়াছিল। নবাব আসফ উদ্দৌলার এই সময় অনূ্যন ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল। হেষ্টিংস তাহাকে লিখিলেন—"পিতা মাতার আদেশ সর্ব্বদা পালন করিতে হয়। আপনি স্বীয় জননীর আজ্ঞাবহ হইয়া থাকিবেন। জননীর প্রতি সর্ব্বদা যথোচিত শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করিবেন।" দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময় মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের শিশুশিক্ষা মুদ্রিত হয় নাই। এই পুস্তকখানি তখন মুদ্রিত হইলে, ওয়ারেণ হেষ্টিংসকে আর কষ্ট করিয়া কোন পত্র লিখিতে হইত না। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের প্রণীত একখানা তৃতীয়ভাগ শিশুশিক্ষা ক্রয় করিয়া নবাব আসফ উদ্দৌলাকে প্রেরণ করিলেই পত্র লেখার উদ্দেশ্য সংসিদ্ধ হইত।

অনেক পত্রাপত্রীর পর ইংরাজগবর্ণমেণ্ট, নবাব আসফউদ্দৌলা এবং বউ বেগম এই তিন পক্ষের মধ্যে এইরূপ বন্দোবস্ত হইল, যে, ইংরাজদিগের ঋণ পরিশোধার্থে বেগম ৫৬০০০০৲ ছাপান্ন লক্ষ টাকা এখন আসফউদ্দৌলাকে প্রদান করিবেন। আসফউদ্দৌলা এবং ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী বেগমকে

এইরূপ একরারনামা লিখিয়া দিবেন, যে, ভবিষ্যতে আসফউদ্দৌলা আর কখনও বেগমের তহবিল হইতে একটী পয়সাও পাইবেন না এবং বেগমের জায়গীর সম্বন্ধে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। যদি আসফউদ্দৌলা ভবিষ্যতে আর কখন বেগমের তহবিলের টাকা কিম্বা বেগমের অন্য কোন সম্পত্তি হরণ করিবার উদ্যোগ করেন, তবে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট আসফউদ্দৌলার সে অত্যাচরণ হইতে বেগমকে রক্ষা করিবেন।

এই বন্দোবস্তের পর নবাব আসফউদ্দৌলা এবং ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের রেসিডেণ্ট ব্রিষ্টো সাহেব পৃথক পৃথক একরারনামা বেগমকে লিখিয়া দিলেন। নবাব আসফউদ্দৌলার প্রদত্ত একরারনামায় লিখিত হইল যে—

"আমি নবাব আসফউদ্দৌলা বাহাদুর একরার করিতেছি, আমি আমার মাতার নিকট হইতে পূর্ব্বে ছাব্বিশ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলাম; এক্ষণে আবার তাঁহার নিকট হইতে ইংরাজগবর্ণমেণ্টের মারফতে আর ত্রিশলক্ষ টাকা বুঝিয়া পাইলাম। আমার পিতৃদত্ত সম্পত্তি সম্বন্ধে আমার মাতার প্রতি আমার আর কোন দাবী রহিল না। আমি আর আমার মাতার তহবিল হইতে কখনও টাকা লইতে পারিব না। আমার মাতার জায়গীর, গঞ্জ, বাজার, বাগিচা এবং তাঁহার ফায়েজাবাদের টাকাশাল ইত্যাদি কোন সম্পত্তির উপর আমার কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার রহিল না।

"আমার মাতা মক্কা গমনকালে তাঁহার এই সকল সম্পত্তি তিনি যাহাকে বিশ্বাস করেন তাহারই হস্তে রাখিয়া যাইতে পারিবেন। আমি কখনও তাহাতে কোন আপত্তি করিতে পারিব না। তিনি মক্কা কিম্বা স্বদেশে যেখানেই অবস্থান করুন, তাঁহার সমুদয় জায়গীর এবং অন্যান্য সম্পত্তি তাঁহার দখলে ও শাসনাধীনে থাকিবে। অন্য কেহ আমার মাতাকে তাঁহার এই সকল সম্পত্তি হইতে বেদখল করিতে উদ্যত হইলে, আমাকে তাঁহার সম্পত্তি রক্ষা করিতে হইবে। আমার মাতার বিশ্বস্ত ভৃত্য জহুরালিখাঁ, বহরালিখাঁ, নিমাংখাঁ, সেগুণালিখাঁ এবং দারাবালিখাঁর উপর, কিম্বা অন্যান্য তাবিলদারিণীদিগের উপর আমি কখনও কোন প্রকার অন্যায়াচরণ কিম্বা অত্যাচার করিব না। ইহাঁদের কাহাকেও কখনও কোন কষ্ট প্রদান করিব না। ইহাঁদিগের শাসন ও রক্ষণের ভার আমার

মাতার হস্তেই থাকিবেক। তিনিই কেবল তাঁহার সমুদয় দাস দাসী এবং তাঁহার বিবিধ সম্পত্তির উপর আধিপত্য করিবেন।

"স্বয়ং খোদা এবং তাঁহার নবী, পয়গাম্বর এবং দ্বাদশ ইমাম ও চতুর্দ্দশ মহুমকে সাক্ষাৎ জানিয়া এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যে, উপরের লিখিত একরার পালন করিব, এবং ভবিষ্যতে আমার মাতার নিকট আমি আর কখনও অর্থের প্রার্থনা করিব না এবং তাঁহার নিকট হইতে আর কখনও ঋণ চাহিতে পারিব না।

১৫ অক্টোবর ১৭৭৫ নবাব আসফ উদ্দৌলা।

ইংরাজ রেসিডেণ্ট ব্রিষ্টো সাহেবও বেগমকে নিম্নলিখিত একরারনামা লিখিয়া দিলেন।

"আমি জন ব্রিষ্টো ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এবং ইংরাজ অধ্যক্ষদিগের পক্ষে এই কবুলনামা লিখিয়া দিতেছি, যে, নবাব আসফ উদ্দৌলাখাঁ বাহাদুর হজব্বর জাঙ্গ তাঁহার পিতৃ ত্যজ্য সম্পত্তি স্বরূপ তাঁহার মাতার নিকট হইতে পূর্ব্বে ছাব্বিশ লক্ষ টাকা এবং অদ্য ত্রিশ লক্ষ টাকা পাইয়া, তাঁহার মাতাকে ফারকুতি অথবা ছাড়তিনামা লিখিয়া দিয়াছেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষে আমি সেই ফারকুতি অথবা ছাড়তিনামার সাক্ষী হইয়াছি। নবাব আসফ উদ্দৌলার পিতৃ ত্যজ্য সম্পত্তি সম্বন্ধে তাঁহার মাতার উপর তাঁহার আর কোন দাবী রহিল না। তাঁহার মাতার হস্তে ও দখলে এখন যে সমস্ত সম্পত্তি রহিল তৎসমুদয়ের তিনিই একমাত্র অধিকারিণী। তাহাতে অন্য কাহারও কোন দাবী করিবার সাধ্য থাকিবে না। তাঁহার মাতা স্বর্গীয় নবাব সুজাউদ্দৌলার প্রদত্ত সমুদয় জায়গীর আপন শাসনাধীনে রাখিতে পারিবেন। বেগমের এই সকল সম্পত্তির উপর নবাব আসফ উদ্দৌলাও ভবিষ্যতে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট নবাব আসফ-উদ্দৌলার লিখিত একরার সকল প্রতিপালন সম্বন্ধে জামিন হইলেন। বেগমকে এই সকল সম্পত্তি হইতে কেহ বেদখল করিবার চেষ্টা করিলে ইংরাজেরা বেগমের সম্পত্তি রক্ষা করিবেন। বেগম মক্কা যাইবার সময় তাঁহার যাহাকে ইচ্ছা তাহার হাতে সম্পত্তি রাখিয়া যাইতে পারিবেন। তৎসম্বন্ধে কেহ কোন আপত্তি করিতে পারিবে না। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এই সকল একরার প্রতিপালন সম্বন্ধে আসফউদ্দৌলার প্রতিভূ হইলেন।

১৫ অক্টোবর ১৭৭৫ জন ব্রিষ্টো।

নবাব আসফউদ্দৌলা এবং ব্রিষ্টো সাহেব পূর্ব্বোক্ত একরারনামা লিখিয়া দিলে পর বেগমের আশঙ্কা দূর হইল। তিনি মনে করিতে লাগিলেন যে তাঁহার অর্থাপহরণের আর বড় সম্ভব নাই।

---:০*০:-

দ্বাবিংশতি অধ্যায়।

নূতন রাজধানী।

নবাব আসফউদ্দৌলা তাঁহার মাতার নিকট হইতে যে ত্রিশ লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হইলেন তাহার কিয়দংশ ইংরাজ সৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ইংরাজ গবর্ণ-মেণ্টকে প্রদান করিলেন। আর বক্রী দশ বার লক্ষ টাকা পাঁচ ছয় দিনের মধ্যেই ব্যয় হইয়া গেল। নবাবের হাতে টাকা পড়িয়াছে শুনিয়া অযোধ্যা বাসী ইংরাজগণ ছলে বলে কৌশলে সকলেই কিছু কিছু আদায় করিতে আরম্ভ করিলেন। যে দুই চারি জন ইংরাজ সস্ত্রীক রাজধানীতে ছিলেন, কিম্বা যাহাদিগের ভগ্নী কিম্বা কন্যা সঙ্গে ছিল, তাঁহারা অন্যান্য ইংরাজ হইতে শতগুণে অধিকতর লাভ করিলেন। দেশীয় রাজগণ ইংরাজ রমণীগণকে উপহার প্রদানকালে দাতাকর্ণ হইয়া পড়েন।

নবাব আবার রিক্ত হস্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু এখন আর তাঁহার স্বীয় জননীর নিকট টাকা চাহিবার উপায় নাই।

এদিকে নবাবমাতা বউ বেগম সর্ব্বদাই পুত্রকে ব্যয় সঙ্কোচ করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিতে লাগিলেন। এক দিন তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে পুত্রকে বলিলেন—

"বাছা! তুমি এ রাজ্য রক্ষা করিতে পারিবে না। তুমিই নবাব থাক; কিন্তু রাজকার্য্য এবং আয় ব্যয়ের ভার তোমার ভ্রাতা সাদাতালির হস্তে অর্পণ কর।"

মাতৃশাসন পূর্ব্ব হইতে নবাব আসফউদ্দৌলার অসহনীয় হইয়া উঠিয়া-ছিল। তিনি মাতৃ শাসন এড়াইবার নিমিত্ত জননীর সঙ্গে বড় একটা দেখা সাক্ষাৎও করিতেন না। এখন আবার তাঁহার মাতা সাদাতালির হস্তে রাজকার্য্যের ভার প্রদান করিতে বলিতেছেন। তিনি মাতার সংসর্গ একেবারে পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত মার্ত্তুজা খাঁর সহিত পরামর্শ করিয়া

লক্ষ্ণৌনগরে স্বীয় রাজধানী সংস্থাপন করিতে কৃত সঙ্কল্প হইলেন। তিনি বিলক্ষণ জানিতেন যে, তাঁহার মাতা এবং পিতামহী কখন ফায়েজাবাদ পরিত্যাগ করিয়া লক্ষ্ণৌ যাইতে সম্মত হইবেন না, সুতরাং লক্ষ্ণৌ রাজধানী সংস্থাপন করিলে অনায়াসে মাতৃ শাসন হইতে অব্যাহতি পাইবেন।

১৭৭৬ সন গত হইতে না হইতেই আসফউদ্দৌলার রাজধানী লক্ষ্ণৌনগরে সংস্থাপিত হইবে বলিয়া অবধারিত হইল। ইঞ্জিনিয়ার ক্লড্ মার্টিন সাহেব * আসফউদ্দৌলার রাজধানী নির্ম্মাণার্থ লক্ষ্ণৌয়ে প্রেরিত হইলেন। মার্টিন সাহেব ইংরাজ নহেন। তিনি ফরাসী জাতীয় লোক ছিলেন। কিন্তু ইংরাজগবর্ণমেণ্টের অধীনে সৈনিক বিভাগে নিযুক্ত হইয়া ইংরাজ সৈন্যদিগের সঙ্গে অযোধ্যায় অবস্থান করিতেন। অত্যল্প কাল মধ্যে ইনি আসফউদ্দৌলার বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া পড়িলেন। কয়েক বৎসরে আসফউদ্দৌলা ইহাকে অন্যূন ত্রিশ লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন ইনি নবাবের নিকট হইতে অনেক জায়গীর ও জমি পাইয়াছিলেন। কিন্তু ইংরাজদিগের ন্যায় এই ব্যক্তি নীচাশয় এবং স্বার্থপরায়ণ ছিলেন না। অন্যান্য ইংরাজ আসফ-উদ্দৌলার ঘোর অনিষ্ট সাধন করিয়াও অর্থোপার্জ্জন করিত। মার্টিন সাহেব কখনও আসফউদ্দৌলার অনিষ্ট সাধন করিয়া অর্থোপার্জ্জন করেন নাই।

লক্ষ্ণৌনগরে রাজধানী নির্ম্মাণ আরম্ভ হইবার পর নবাব আসফউদ্দৌলা আপন স্ত্রীপুত্র এবং অমাত্যবর্গ সহ লক্ষ্ণৌ যাইতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু তাঁহার ফায়েজাবাদ পরিত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্বে মার্ত্তুজা খাঁর সঙ্গে তাঁহার বৈমাত্র ভ্রাতা সাদাতালির অত্যন্ত বিবাদ হইল। মৃজা সাদাতালি খাঁর লোকেরা মার্ত্তুজা খাঁর প্রাণ বিনাশ করিল এবং সাদাতালি পলায়ন পূর্ব্বক বারানসী চলিয়া গেলেন।

এখন আর আসফউদ্দৌলাকে সৎপরামর্শ প্রদান করিবার লোক একেবারেই রহিল না। জননীর শাসন হইতে মুক্ত হইবার অভিপ্রায়ে তিনি লক্ষ্ণৌ চলিয়া গেলেন এবং তাঁহার সৎপরামর্শ প্রদায়ক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইচ্ছা পূর্ব্বক বারানসী নির্ব্বাসিত হইলেন।

---

* কলিকাতার লামার্টিনিয়ার কলেজ এবং লক্ষ্ণৌ মার্টিনিয়ার কলেজ এই ক্লড মার্টিন সাহেবের ত্যজ্য সম্পত্তি দ্বারা সংস্থাপিত হইয়াছে।

নবাবের পিতামহী মতীবেগম মক্কা শরীপ যাইতে উদ্যত হইলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে তাঁহার ধন সম্পত্তি এবং জায়গীর আপন পুত্র-বধূ বউ বেগমের হাতে সমর্পণ করিয়া যাইবেন। কিন্তু লোক পরম্পরায় জানিতে পারিলেন যে তিনি মক্কা গমন করিলেই তাঁহার সমুদয় ধন সম্পত্তি আসফউদ্দৌলার হস্তগত হইবে। সুতরাং নিজের ধন সম্পত্তি রক্ষার নিমিত্ত মক্কা গমনের সংকল্প সম্প্রতি পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার সম্পত্তি রক্ষা সম্বন্ধে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে পত্রাপত্রী চলিতে লাগিল।

মতীবেগম মক্কা গমন সংকল্প পরিত্যাগ করিলে, জগদম্বা বেগম এবং তাঁহার কন্যা কাসিমালির স্ত্রীও ফায়েজাবাদ হইতে মীর কাসিমের নিকট চলিয়া যাইবেন বলিয়া স্থির করিলেন। মীর কাসিম রাজ্য শোকে ক্ষিপ্ত হইলে ইঁহারা দুইজন বেরিলিতে নিতান্ত দরিদ্রাবস্থায় এক খানি ক্ষুদ্র কুটীরে বাস করিতেছিলেন। ক্ষিপ্তাবস্থায় কাসিমালি সর্ব্বদাই আপন স্ত্রী এবং শ্বাশুড়ীর প্রাণবধ করিবার চেষ্টা করিতেন। স্ত্রী এবং শ্বাশুড়ী নিকটে থাকিলে তাঁহার ক্ষিপ্তাবস্থা অপেক্ষাকৃত অধিকতর বৃদ্ধি হইয়া পড়িত। এই জন্য তাঁহার স্ত্রী এবং শ্বাশুড়ী মীর কাসিমের সঙ্গে একত্র বাস করিতে পারিতেন না। মীর কাসিমের সঙ্গে একত্রে পর্ণ কুটীরে বাস করিয়াও ইঁহারা বিশেষ সন্তোষ লাভ করিতেন। কিন্তু দৈব দুর্বিপাক নিবন্ধন সে সুখ হইতেও ইঁহারা বঞ্চিত হইলেন।

কাসিমালির প্রতি সুজা অন্যায়াচরণ করিয়াছিলেন বলিয়া, জগদম্বা বেগম এবং কাসিমালির স্ত্রী প্রাণান্তেও ফায়েজাবাদে সুজার আতিথ্য গ্রহণে সম্মতা হইতেন না। কিন্তু সুজাউদ্দৌলার মাতা মতীবেগম শুদ্ধ কেবল ইঁহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিবার উদ্দেশে প্রতারণা করিয়া ইঁহাদিগকে আপন গৃহে আনিয়া ছিলেন। তিনি ইঁহাদিগের নিকট বলিয়াছিলেন যে সুজার প্রতি তিনি নিজেও অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন তিনিও সুজার গৃহে থাকিবেন না; ইঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া তিনি অবিলম্বে মক্কা চলিয়া যাইবেন।

মতীবেগমের কথা বিশ্বাস করিয়া, ইঁহারা তাঁহার সঙ্গে ফায়েজাবাদে চলিয়া আসিলেন। মতীবেগম প্রায় দুই তিন বৎসর ইঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার মতী বাগান নামক ভবনে বাস করিতেছিলেন। ইঁহারা ফায়েজবাদে আসিয়া দুই তিন বৎসরের মধ্যেও সুজার প্রাসাদে যাইে

সম্মতা হন নাই। কিন্তু চারি পাঁচ বৎসর গত হইলে পর ইহাঁরা সুজার সকল অপরাধ বিস্মৃত হইলেন। সুজার প্রতি আর ইহাঁদিগের কোন বিদ্বেষের ভাব রহিল না। সুজাও সময়ে সময়ে কাসিমালির নিমিত্ত অনেক আক্ষেপ করিতেন। তখন পরস্পরের মধ্যে আবার সদ্ভাবের সঞ্চার হইল এবং ইহাঁরা মতী বেগমের সঙ্গে সময়ে সময়ে সুজার প্রাসাদে যাইয়া অবস্থান করিতেন।

এখন মতীবেগমের মক্কা গমন একেবারেই স্থগিত হইল মনে করিয়া জগদম্বা আপন কন্যা সহ মীর কাসিমের নিকট যাইবেন বলিয়া স্থির করিলেন। জগদম্বা বেগমের ফায়েজাবাদ পরিত্যাগ করিবার আরও একটী কারণ ছিল। ফায়েজাবাদে লোক পরম্পরায় শুনিলেন আসফউদ্দৌলার সঙ্গে ইংরাজদিগের গত মে মাসে যে নূতন সন্ধি সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে আসফউদ্দৌলা লিখিয়া দিয়াছেন যে মীর কাসিম কখন তাঁহার রাজ্য মধ্যে আসিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে বন্দী স্বরূপ ইংরাজদিগের হস্তে সমর্পণ করিবেন। এই সকল কথা শুনিলেই জগদম্বার মনে বড় কষ্ট হইত সুতরাং মতীবেগম এবং বউ বেগমের নিকট তিনি ফায়েজাবাদ পরিত্যাগের অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন।

মতী বেগম (এবং এখন বউ বেগমও) ইহাদিগকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহারা কোন প্রকারেই ইহাঁদিগকে বিদায় দিতে সম্মত হইলেন না। বিশেষতঃ বউ বেগম কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন—

"মা, আমার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে। তৎপরে পুত্রও আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে এখন আমাকে একাকী ফেলিয়া গেলে আমার বড়ই ক হইবে। আপনি না হয় আর এক বৎসর এখানে অবস্থান করুন।"

সহৃদয়া, দয়াদ্রচিত্তা জগদম্বা অগত্যা বউ বেগমের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং আগামী বৎসরের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত ফায়েজাবাদে রহিলেন। কিন্তু এপ্রিল মাসের শেষে শুনিতে পাইলেন যে মীরকাসিঃ অত্যন্ত রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার আর দীর্ঘকাল বাঁচিবার আশা নাই।

এই সংবাদ শ্রবণে পতিপ্রাণা কাসিমপত্নী তৎক্ষণাৎ জননীকে সং করিয়া দিল্লী যাত্রা করিলেন। বউ বেগম অনেক লোক জন ধন সম্পি সঙ্গে দিয়া ইহাঁদিগকে দিল্লীর নিকটবর্ত্তী পুলবাগে প্রেরণ করিলেন।

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়।

এ পাপের কি আর প্রায়শ্চিত্ত নাই?

এ সংসারে কিছুই স্থায়ী নহে। সকলই অনিত্য, সকলই ক্ষণস্থায়ী শত বৎসর পূর্ব্বে যে স্থান সুরম্য হর্ম্ম্যে এবং বিবিধ অট্টালিকায় সুশোভিত ছিল, যে স্থান সর্ব্বদা লোকারণ্যে পরিপূর্ণ ছিল, অহর্নিশ যেখানে গীত বাদ্য এবং নানা প্রকার আমোদ প্রমোদ হইত, আজ সেখানে স্তূপাকারে রাশীকৃত ইষ্টক পড়িয়া রহিয়াছে। সেইস্থান শৃগাল প্রভৃতি বন্যজন্তুর আবাস হইয়া পড়িয়াছে।

সরযূ নদী-তীরবর্ত্তী ফায়েজাবাদের রাজপ্রাসাদের কি এখন আর কোন চিহ্ন দেখা যায়? কেহ না বলিয়া দিলে, কোথায় যে নবাবের প্রাসাদ ছিল, তাহা এখন আর অবধারণ করিবারও সাধ্য নাই। নবাব প্রাসাদের সকল চিহ্নই লোপ হইয়াছে, কেবলমাত্র দক্ষিণ দ্বারের ভগ্নাবশিষ্ট পুরাতন প্রাচীরই এখন দেখিতে পাওয়া যায়।

ফায়েজাবাদের চক্ বাজারের উত্তর দিকে যে একটী সিংহদ্বারের ভগ্নাবশিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই শত বৎসর পূর্ব্বে নবাব প্রাসাদের দক্ষিণ দ্বার ছিল। এই অত্যুচ্চ সিংহদ্বারে তিনটী প্রবেশ পথ বা তোরণ ছিল। দক্ষিণ সিংহদ্বার হইতে উত্তর সিংহদ্বার পর্য্যন্ত একটী সোজা রাস্তা ছিল। সে রাস্তা দ্বারা সাধারণের গমনাগমনের অধিকার ছিল না। নবাব পরিবারের লোক ভিন্ন অন্য কেহ সে রাস্তায় প্রবেশ করিতে পারিত না। সেই রাস্তার পূর্ব্ব পশ্চিম উভয় পার্শ্বেই অতি উচ্চ প্রাচীর ছিল। সে প্রাচীরদ্বয়ের উত্তর প্রান্ত সরযূ নদী-তীরবর্ত্তী উত্তর সিংহদ্বারের সহিত সংলগ্ন, আর দক্ষিণপ্রান্ত দক্ষিণ সিংহদ্বারের সহিত যুক্ত ছিল। রাস্তার পূর্ব্বপার্শ্বের প্রাচীরের পূর্ব্বদিকে নবাবের দরবার গৃহ, বৈঠকখানা, খাসমহল এবং দেলখোসা প্রভৃতি ছিল। আর পশ্চিমদিকের প্রাচীরের পশ্চিম পার্শ্বে দক্ষিণ হইতে উত্তর দ্বার পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে তিনটী খোর্দ্দ মহল ছিল।

এই দুইটী সুদীর্ঘ এবং অত্যুচ্চ প্রাচীরের স্থানে স্থানে আবার সিংহদ্বার রহিয়াছে। পশ্চিম পার্শ্বে প্রাচীরের সঙ্গে তিনটী সিংহদ্বার ছিল।

তাহার এক একটী সিংহদ্বারই এক একটী খোর্দ্দ মহলের প্রবেশ পথ। সকলের দক্ষিণদিকের খোর্দ্দ মহলে অযোধ্যার প্রথম উজীর নবাব বরহান্ মুলুকের উপপত্নীগণ বাস করিতেন। তাহার পরের খোর্দ্দ মহলে নবাব মনশুর আলিখাঁ সবদর জাঙ্গের উপপত্নীগণ ছিলেন। একেবারে উত্তর দিকের খোর্দ্দ মহলে সুজা উদ্দৌলার উপপত্নীগণ তৎকালে অবস্থান করিতেন।

নবাব আসফ উদ্দৌলার সিংহাসন প্রাপ্তির পর ফায়েজাবাদে তাঁহার খোর্দ্দ মহল নির্ম্মিত হয় নাই। দুই কারণে আসফ উদ্দৌলার খোর্দ্দ মহল নির্ম্মাণের প্রয়োজন হইল না। প্রথমতঃ তিনি লক্ষ্ণৌ নগরে রাজধানী সংস্থাপনের অভিপ্রায় করিয়াছিলেন; দ্বিতীয়তঃ তাঁহার উপপত্নীর সংখ্যা অধিক ছিল না। তাঁহার যে দুই চারিজন স্ত্রী ছিল তাঁহারা সকলেই ধর্ম্মপত্নীর ন্যায় খাসমহলে বাস করিতেন। কেহ কেহ বলেন আসফ উদ্দৌলার একেবারেই উপপত্নী ছিল না, কোরাণ অনুসারে তিনি চারিজন মাত্র পত্নী গ্রহণ করিয়াছিলেন।

উত্তর সিংহদ্বারের বাহিরে এক প্রশস্ত রাস্তা ছিল। সেই রাস্তাই একেবারে সরযূ নদীর তীরস্থিত। উত্তরে সিংহদ্বারের সংলগ্ন পূর্ব্বদিকে সরযূ তীরবর্ত্তী প্রকাণ্ড রাস্তার দক্ষিণপার্শ্বে যে প্রাচীর ছিল, সেই প্রাচীরের ভিতরে দক্ষিণদিকেই একটী অতি সুরম্য হর্ম্ম্য ছিল। সেই হর্ম্ম্যের নাম বেগম দেলখোসা। সুজা উদ্দৌলা জীবিত থাকিতে কখনও কখনও বউ বেগমের সঙ্গে একত্রে অপরাহ্নে সরযূ নদীর লহরী দর্শনার্থ এই দেলখোসায় আসিয়া বসিতেন। এই দেলখোসার গবাক্ষদ্বারে বসিলে সরযূ নদী দেখিতে পাওয়া যাইত। তদ্ভিন্ন নবাবের আর এক স্বতন্ত্র দেলখোসা ছিল।

এই গৃহখানি খাসমহলের সঙ্গে সংলগ্ন ছিল। খাসমহলের মধ্যস্থিত সুজার শয়ন-গৃহ হইতে বরাবর দুই তিন খানা গৃহের ছাদের উপর দিয়া এখানে স্ত্রীলোকেরা অনায়াসে আসিতে পারিতেন। সুজার মৃত্যুর পরও সময় সময় বউ বেগম অপরাহ্নে জগদম্বা বেগম এবং মীরকাসিমের স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া এখানে আসিয়া বসিতেন।

আজ দুই তিন দিন হইল যে জগদম্বা বেগম কন্যাসহ পুলবলে মীর কাসিমের নিকট চলিয়া গিয়াছেন। এখন বৈশাখ মাস আরম্ভ হইয়াছে। দিবসে অত্যন্ত গ্রীষ্মবোধ হয়। বউ বেগম এখন ফায়েজাবাদের রাজ-

প্রাসাদে একাকিনী মনোদুঃখে দিন যাপন করিতেছেন। অন্যান্য দিন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে আসিয়া দেলখোসায় বসিতেন; কিন্তু আজ প্রায় চারি দণ্ড বেলা থাকিতেই দেলখোসায় আসিলেন। সঙ্গে যে দুই তিন জন বাঁদী ছিল তাহারা প্রকোষ্ঠান্তরে গিয়া গল্প করিতে লাগিল। বেগম একাকিনী একটী প্রকোষ্ঠের জানালার নিকট বসিয়া সরযূ নদীর দিকে চাহিয়া রহিলেন।

দেলখোসার নিকট দিয়া সরযূ নদী পশ্চিমদিক হইতে বরাবর পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইয়াছে। দেলখোসা হইতে প্রায় একক্রোশ পর্য্যন্ত নদী পশ্চিমবাহিণী হইয়া পরে আবার দক্ষিণমুখী হইয়া প্রবাহিত হইয়াছে। ঠিক যেস্থান হইতে নদী দক্ষিণমুখী হইয়াছে সেই স্থানকে গুপ্তীরপার বলা যায়। ফায়েজাবাদে দীর্ঘকাল হইতেই এইরূপ প্রবাদ শুনা যায় যে দশরথ পুত্র লক্ষ্মণ শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক বিবর্জ্জিত হইলে পর প্রাণত্যাগ করিবার অভিপ্রায়ে সরযূ নদীতে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। নদীর স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে যেস্থানে আসিয়া তিনি নদী গর্ভে নিমগ্ন হইলেন, সেই স্থানের নামই গুপ্তীরপার; লক্ষ্মণ এইস্থানে গুপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই গুপ্তীরপার নামে অভিহিত হইয়াছে। ফায়েজাবাদের হিন্দু মুসলমান কাহারও নিকট এই পুরাতন প্রবাদ অবিদিত নাই। বেগম নিজেও এই সকল প্রবাদ জানিতেন।

বেগম পশ্চিমদিকে চাহিয়া নদীর লহরীলীলা দেখিতেছেন। গুপ্তীর পারের উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। নির্জ্জনে বসিলেই নানাপ্রকার চিন্তা আসিয়া মনোমধ্যে উদয় হইতে থাকে। গুপ্তীরপারের উপর বেগমের দৃষ্টি পড়িবামাত্র রাম লক্ষ্মণের কথা তাঁহার স্মরণ হইল। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, রাম লক্ষ্মণের মধ্যে কি ভালবাসাই ছিল। রাম লক্ষ্মণের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে সাদাতালি এবং আসফ উদ্দৌলার কথা মনে হইল। হঠাৎ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক মনে মনে বলিতে লাগিলেন—

"হা পরমেশ্বর সাদাতালি এবং আসফ উদ্দৌলা যদি রাম লক্ষ্মণের ন্যায় পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসিত তবে আর এ রাজ্য নষ্ট হইত না।" আবার গুপ্তীরপারের উপর দৃষ্টি পড়িল। আবার মনে মনে বলিতে লাগিলেন—

"এই স্থানে লক্ষ্মণ নদী গর্ভে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। লক্ষ্মণ রাম কর্ত্তৃক বিবর্জ্জিত হইলেন বলিয়াই প্রাণত্যাগ করিলেন।"

এই চিন্তা বেগমের মনে উদয় হইবামাত্রই তাঁহার দুই চক্ষু হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন—

"হায় আমার সাদাতালিও নির্ব্বাসিত হইয়াছে। হায় কেন আমি নবাবকে সাদাতালির হাতে রাজ্য ভার অর্পণ করিতে বলিলাম না। সাদাতালি নবাব হইলে আর রাজ্য নাশের আশঙ্কা হইত না। আসফ-উদ্দৌলা আমার গর্ভে জন্মিয়াছে বলিয়াই তো নবাব তাহাকে সিংহাসন প্রদান করিয়াছেন। নহিলে আসফউদ্দৌলার তো আর কোন গুণই নাই।"

"সাদাতালির প্রতি আমি বিমাতার আচরণ করিয়াছি। নবাবের সন্তানগণ মধ্যে এক সাদাতালিই সিংহাসনের উপযুক্ত। কিন্তু আমার জন্যই সে কেবল সিংহাসন হইতে বঞ্চিত হইল। আমি বলিলে নবাব নিশ্চয়ই সাদাতালিকে সিংহাসন প্রদান করিতেন। হায় জগদম্বা বেগমের ন্যায় আমার মন যদি সরল হইত, তাঁহার ন্যায় আমি যদি পক্ষপাত শূন্য হইতে পারিতাম, তবে এ রাজ্যের বিনাশ হইত না। নবাবের নাম, নবাবের পিতা পিতামহের নাম বজায় থাকিত। আমার ভয়ে নবাব আমার সাক্ষাতে সাদাতালির নামও করিতেন না; কেবল আসফ-উদ্দৌলাকেই আদর করিতেন। কিন্তু তিনি বিচক্ষণ লোক ছিলেন, তিনি অবশ্য বুঝিতেন যে সাদাতালিই এক মাত্র সিংহাসনের উপযুক্ত।"

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে বেলা প্রায় শেষ হইল। সূর্য্য অস্ত-প্রায় হইয়া আসিল। বেগম যে জানালার নিকট মুখ রাখিয়া নদীর দিকে চাহিয়াছিলেন সেই জানালার দ্বারা সূর্য্যালোক প্রবেশ করিয়া বেগমের মুখের উপর রৌদ্র পড়িল। তিনি সে প্রকোষ্ঠ হইতে উঠিয়া পূর্ব্ব দিকের অন্য এক প্রকোষ্ঠে গিয়া বসিলেন। আবার পূর্ব্বমুখী হইয়া নদীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। পূর্ব্বদিকে অনেক দূরে নদীর অপর পারে একটী প্রকাণ্ড বট বৃক্ষ রহিয়াছে। বেগমের দৃষ্টি সেই বৃক্ষের উপর পড়িল। ফায়েজা-বাদের লোকেরা বলে শ্রীরামচন্দ্র বনে গমন কালে সরযূ নদী পার হইয়া প্রথম রাত্রি সীতা সহ এইবৃক্ষ তলে শয়ন করিয়াছিলেন। এই বট বৃক্ষের উপর দৃষ্টি পড়িবামাত্র সীতার কথা মনে হইল। সীতার কথা ভাবিতে

ভাবিতে নিজের কথা মনে পড়িল। তখন তিনি একেবারে আত্মবিস্মৃতের ন্যায় মনে মনে বলিতে লাগিলেন ;—

"কেন হিন্দুরা বলে যে সীতা বড় কষ্টে পড়িয়াছিলেন? হিন্দু কাফের তাই ওদের বুদ্ধি নাই। সীতার কোন কষ্টই হয় নাই। স্বামীর সঙ্গে বৃক্ষতল আশ্রয় করিয়াছিল, ইহা অপেক্ষা আর কি সুখ আছে? যে দিন আমি বক্‌সারের সংগ্রামক্ষেত্রে বাঁদীর বেশে নবাবের তাম্বুতে প্রবেশ করিলাম সে দিন নবাবের মুখ দেখিয়া আমার কতই আনন্দ হইয়াছিল। তিনি আমাকে চিনিতে পারিলেন না। জহরালী তাঁহার হাতে টাকা এবং আমার পত্র প্রদান করিল। তিনি চমকিয়া উঠিয়া আমাকে লইয়া নিজের প্রকোষ্ঠের মধ্যে গেলেন। যখন আমার গলা ধরিয়া বলিলেন, "আমেতু, আমার জন্য তুমি প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে আসিয়াছ?" তখন আমি কত আনন্দ, কত সুখই অনুভব করিয়াছিলাম। ধন রত্ন ঐশ্বর্য্য কিছুই তো আমাকে কখনও এত সুখ প্রদান করে নাই।

"বক্‌সারে চলিয়া যাইবার সময় জহরালী বলিত, আমেতু আর হাঁটিতে পারিবে না। তোমার বড় কষ্ট হইয়াছে। এখন এখানে বিশ্রাম কর।

"কিন্তু বক্সারে যাইবার সময় আমার তো একটু কষ্টও বোধ হয় নাই। বরং জহরালীর প্রতি আমার অত্যন্ত রাগ হইত। আমি মনে করিতাম জহরালী নিজে বিশ্রাম করিতে চাহে, সেই জন্য এইরূপ বলে।

"বক্সার হইতে দেশে পলাইয়া আসিবার সময়ে নবাব অত্যন্ত চিন্তাকুল হইয়া পড়িলেন। ইংরাজ সৈন্য আমাদিগকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিল। নবাবের তখন দিবারাত্রের মধ্যে নিদ্রা হইত না। নবাবকে নিদ্রিত করিবার জন্য যখন বাঁদীর বেশে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে বাতাস করিতাম তখন কতই আমার সুখ বোধ হইত আমার মনে এত সুখ এত আনন্দের উদয় হইত, যে, সে সময়ের আসন্ন বিপদ আমাকে কিঞ্চিন্মাত্রও ভীত করিতে পারিত না।

"নবাব আমার সহাস্য মুখ দেখিয়া, আমার সাহস দেখিয়া, হাসিতে হাসিতে বলিতেন, 'আমেতু আজ হইতে আমার পোষাক তুমি ধারণ করিয়া নবাবী কর, আমি তোমার পোষাক পরিধান করিয়া অন্দরে থাকিব। তোমার বড় সাহস ; কিছুতেই তোমার ভয় হয় না'।

"আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম 'এবার ফায়েজাবাদে যাইয়া তোমার সৈন্যাধ্যক্ষের পদে আমাকে নিযুক্ত করিলে ভাল হয় না?'

"ফায়েজাবাদে পলাইয়া আসিবার সময় পথে একদিনও নবাবের মুখে হাসি না দেখিয়া আমার বড় কষ্ট হইত। সেদিন নবাবকে সহাস্য মুখে কথা বলিতে দেখিয়া; আমার কতই আনন্দ হইয়াছিল। তবে তো এ অযোধ্যার প্রধান বেগমের পদ অপেক্ষাও সে হাসির মূল্য অধিক ছিল। ঐ প্রধান বেগমের পদ, ঐ ধন রত্ন তো কখনও আমাকে সেই সুখ, সেই আনন্দ প্রদান করিতে পারে নাই'।

"হিন্দুগণ সত্য সত্যই কাফের। জগদম্বা বেগম বলেন কাফেরদিগের বড় বুদ্ধি। কোরাণ মানে না, নবী মানে না, পয়গম্বরের কথা মানে না, সে কাফেরের আবার বুদ্ধি। বুদ্ধি থাকিলে সীতার বড় কষ্ট হইয়াছিল এ কথা বলে কেন? যে দিন সীতা এই বটবৃক্ষতলে স্বামীর মস্তক ক্রোড়ে করিয়া সমস্ত রাত্রি স্বামীকে বাতাস করিয়াছেন, সে দিন সীতার মনে বড়ই আনন্দ হইয়াছিল। ঠিক বক্সারে গিয়া আমার যেরূপ আনন্দ হইল, সীতারও সেইরূপ আনন্দ হইয়াছিল।

"এলাহাবাদের সন্ধির পর যখন যুদ্ধের গোলমাল চলিয়াগেল, তখন নবাব আমার শয়ন প্রকোষ্ঠে আসিয়া বলিলেন—'আমেতু আমার ধন রত্ন রাজপদ সকলই তোমার।'

"কিন্তু বক্সারে নবাবের মুখ দেখিয়া যত আনন্দ হইয়াছিল সে ধন রত্ন রাজ্য পদ পাইয়া তো আমার তখন সেইরূপ আনন্দ হয় নাই।"

বেগম সরযূ নদী তীরবর্ত্তী বটবৃক্ষের দিকে চাহিয়া এইরূপ চিন্তা করিতেছেন। তাঁহার বাঁদীত্রয় আসিয়া প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কিন্তু সে বিষয়ে তাঁহার একেবারেই চৈতন্য নাই। তিনি চিন্তা করিতে করিতে অবশেষে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া স্পষ্টাক্ষরে স্বপ্নাবস্থায় কথা বলিবার ন্যায় বলিয়া উঠিলেন "জগদম্বা বেগমের কথা না শুনিয়া এ দুর্দ্দশা হইল। প্রাণেশ্বর! তোমার এ রাজ্য রক্ষার আর উপায় দেখি না।" এই বলিয়াই বেগম জানালার পার্শ্বস্থিত শয্যার উপর অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন।

বাঁদীগণ "ও আল্লা, সোবান আল্লা এ কি হইল!" এই বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। বাঁদীগণের চীৎকারে বেগম চৈতন্য লাভ করিয়া তাহা-

দিগকে বলিলেন, "আমার কোন অসুখ হয় নাই। তোরা গোলমাল করিস্ না।"

এ দিকে দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যার কিছুকাল পরেই গগণ মণ্ডলে চন্দ্রমা সমুদিত হইল। সরযূ বক্ষে চন্দ্রালোক নিপতিত হইবামাত্র জলরাশি যেন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। এ পর্য্যন্ত বেগম দেলখোষার প্রকোষ্ঠ মধ্যে ছিলেন। এখন দেলখোষার বারেন্দায় বাহির হইলেন। চন্দ্রমা সংস্পর্শে সরযূ আরও মনোহর রূপ ধারণ করিয়াছে। চন্দ্রমার সঙ্গে সরযূ খেলা করিতেছে দেখিয়া বেগমের হৃদয়ও এখন একটু প্রফুল্ল হইল। কিন্তু রাজ্য বিনাশের চিন্তা কিছুতেই তাঁহার মন হইতে বিদূরিত হইল না।

দুই চারি দণ্ড রাত্রি হইলে পর বেগম বাঁদীত্রয়ের সঙ্গে ছাদের উপরের রাস্তা দিয়া খাসমহালে শয়ন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। যে প্রকোষ্ঠে হাফেজনন্দিনী আত্মহত্যা করিয়াছিলেন সেইটীই সুজার গ্রীষ্মকালের শয়ন প্রকোষ্ঠ ছিল। বেগম স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠে শয়ন করিতেন। সুজা ডাকিয়া না পাঠাইলে কোন বেগম তাঁহার শয়ন প্রকোষ্ঠে যাইয়া শয়ন করিতেন না। এখন সুজার মৃত্যুর পর বউবেগম বরাবরই সুজার সেই শয়ন প্রকোষ্ঠেই শয়ন করিতেন। কোন কোন রাত্রে দুই এক জন বাঁদী বেগমের শয়নাগারে শুইয়া থাকে। আর যে রাত্রে বেগম শয়নাগারে বসিয়া কোরাণ পাঠ করেন সে রাত্রে অন্য কাহাকেও প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিতে দিতেন না। আজ রাত্রে বেগম কোরাণ পাঠ করিবেন বলিয়া মনে করিয়াছেন। সুতরাং শয়ন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়াই বাঁদীদিগকে বিদায় দিলেন; এবং দ্বার রুদ্ধ করিয়া কোরাণ শরিপ পাঠ করিতে লাগিলেন। কিন্তু আজ অনেকক্ষণ দেলখোষায় বসিয়া নানা চিন্তা করিয়াছেন। তাঁহার শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। তিনি কোরাণের এক সুরা পাঠ করিয়াই শয়ন করিলেন। এবং অত্যল্প-কাল মধ্যেই নিদ্রাভিভূতা হইয়া পড়িলেন। * * * *

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

* * . শয়ন প্রকোষ্ঠের জানালা খুলিয়া বেগম নিদ্রা যাইতেছেন। গ্রীষ্মাতিশয় নিবন্ধন রাত্রে প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রায়ই আলো রাখিতেন না। তাঁহারা শয়ন করিবার পূর্ব্বে গৃহের সমুদয় আলো নির্ব্বাপিত হইত। প্রথম রাত্রে জ্যোৎস্না ছিল। জানালার মধ্য দিয়া চন্দ্রালোক প্রবেশ করিয়া

গৃহ আলোকিত করিয়াছিল। কিন্তু রাত্রি দুই প্রহরের পূর্ব্বেই চন্দ্রমা অদৃশ্য হইল। জগন্মণ্ডল ঘোর অন্ধকারে সমাবৃত হইয়া পড়িল। বেগমের শয়ন প্রকোষ্ঠ একেবারে অন্ধকারে পরিপূর্ণ হইল।

এই গভীর রাত্রে সমুদয় বিশ্বমণ্ডল নিস্তব্ধ হইয়াছে। জন প্রাণীর শব্দ নাই। শয়ন করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে হাফেজনন্দিনীর মৃত্যু ঘটনা বেগমের স্মৃতিপথারূঢ় হইয়াছিল। তৎসঙ্গে সঙ্গে আবার জগদম্বা বেগমের নিদারুণ বাক্যও স্মরণ হইয়াছিল। জগদম্বা বেগম বলিয়াছিলেন, নিরপরাধী হাফেজ কুমারীর শোণিত হইতে দাবাগ্নি সমুৎপন্ন হইয়া সমুদয় অযোধ্যাকে ছারখার করিবে। এই সকল কথা চিন্তা করিতে করিতেই বেগম নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। রাত্রি দুই প্রহরের সময় নিদ্রিতাবস্থায় তিনি স্বপ্নে দেখিতে লাগিলেন যেন—সমুদয় গৃহ অগ্নিময় হইয়া পড়িয়াছে। শয়ন প্রকোষ্ঠের সর্ব্বত্রই আগুণ জ্বলিতেছে। তিনি অত্যন্ত ভীত হইলেন। চীৎকার করিয়া পার্শ্বস্থিত প্রকোষ্ঠে শয়ানা বাঁদীদিগকে ডাকিবেন বলিয়া মনে করিলেন। কিন্তু মুখ হইতে শব্দ বাহির হইল না। স্বপ্নাবেশে তাঁহার সর্ব্ব শরীর কাঁপিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সেই প্রজ্বলিত অগ্নিরাশির মধ্য হইতে শুভ্র বসন পরিহিতা দুইটী পরম সুন্দরী, অপরূপ লাবণ্যময়ী যুবতী বাহির হইয়া ধীরে ধীরে বেগমের শয্যা পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। ইহাঁদের একটীর আকৃতি ঠিক হাফেজনন্দিনীর ন্যায়। দ্বিতীয়া যুবতীর মুখকমল হাফেজ-নন্দিনীর মুখাপেক্ষাও শতগুণে গাম্ভীর্য্য এবং প্রশান্ত ভাবে পরিবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার সেই সুবিমল অনিন্দ্য বদন হইতে অবিশ্রান্ত প্রীতি এবং স্নেহ কিরণ বর্ষিত হইতেছে। স্বপ্নাবেশে হাফেজনন্দিনীকে দেখিয়া বেগমের মনে মনে অত্যন্ত ভয়ের সঞ্চার হইল। কিন্তু এই দ্বিতীয়া রমণীর স্নেহ ভরা মুখ খানির উপর দৃষ্টি পড়িবামাত্র বেগমের আবার যেন একটু সাহসের সঞ্চার হইল।

রমণীদ্বয় বেগমের শয়ন পার্শ্বে বসিলেন। বেগম সাহস করিয়া ইহা-দিগকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই হাফেজনন্দিনী বলিলেন—

"ভয় নাই মা! আমি তোমার শত্রু নহি। তোমার কোন উপকারার্থ আসিয়াছি। আমরা তোমার কোন অনিষ্ট করিতে আসি নাই। আমি এখন যে রাজ্যে বাস করিতেছি, সেখানে কেহ কাহারও শত্রুতা করে না। সেখানে দ্বেষ নাই, হিংসা নাই। সে-রাজ্যে নিস্তেজ, দুর্ব্বল ও অবলা-

দিগকে সকলেই আশ্রয় প্রদান করেন। সে রাজ্যে কাম ক্রোধ স্বার্থপরতা কিছুই আমরা দেখিতে পাই না।”

বেগম হাফেজনন্দিনীর কথা শুনিয়া আশ্বস্ত হইলেন। তাঁহার ভয় ক্রমেই দূর হইতে লাগিল; তিনি অনিমিষ নেত্রে হাফেজবালার সঙ্গিনী সেই অপরূপ লাবণ্যবতীর মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। সে মুখ খানি এতই আনন্দপ্রদ এত শান্তিপ্রদ যে সে মুখের দিকে চাহিয়া আর চক্ষু ফিরাইতে পারিলেন না। বেগম কিছু জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই হাফেজ-নন্দিনী আবার তাঁহার সঙ্গিনীকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন—

“আমরা এখন যে রাজ্যে বাস করিতেছি সেখানে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান কেহ কাহাকেও কাফের বলিয়া মনে করেনা। সকলেই সকলকে প্রাণের সহিত ভাল বাসে, এবং অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে। যে কাফেরকন্যার বিষয় তুমি অপরাহ্নে চিন্তা করিতেছিলে, ইনিই সেই সীতা, বটবৃক্ষতলে স্বামীর সঙ্গে শয়ন করিয়াছিলেন। ইঁহার তেজঃ গ্রহণ কর। তুমি নারী ধর্ম্ম বিসর্জ্জন করিয়াই বিনাশের দিকে ধাবিত হইয়াছ।”

“বিনাশ” এই কথা শুনিয়াই বেগম ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ বাহিরে মেঘের গর্জ্জন শুনিতে লাগিলেন। প্রবল ঝঞ্ঝাবাত উপস্থিত হইল। প্রকোষ্ঠের জানালা সকল বাতাসে সঞ্চালিত হইবামাত্র ঠঙ্‌ ঠঙ্‌ ঠাস্ ঠাস্ শব্দ হইতে লাগিল। বেগম জাগ্রত হইলেন। চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখেন যে বাহিরে বড় ঝড় বৃষ্টি হইতেছে, কিন্তু প্রকোষ্ঠ মধ্যে কিছুই নাই। বেগম গাত্রোত্থান করিলেন। প্রকোষ্ঠের দরজা খুলিয়া বাঁদীদিগকে ডাকিতে লাগিলেন। বাঁদীগণ জাগ্রত হইয়া প্রদীপ জ্বালিল। বেগমের শিয়রে স্বর্ণখচিত মকমলের বস্ত্রে বান্ধা একখানি কোরাণ রহিয়াছে। বেগম আবার কোরাণ পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। কোরাণ শরিপ খুলিবামাত্র সুরা মুমেন হাতে পড়িল। বেগম সুরা মুমেন ধীরে ধীরে এইরূপে পাঠ করিতে লাগিলেন—

“পরাক্রমশালী জ্ঞানময় ঈশ্বর হইতে এই পুস্তক আসিয়াছে। তিনি পাপ ক্ষমাকারী, অনুতাপ গ্রহণ কারী, কঠিন শাস্তিদাতা এবং মহিমান্বিত। তিনি ভিন্ন আর কেহ উপাস্য নাই। তাঁহার দিকেই পুনর্গমন করিতে হইবে। ধর্ম্মদ্রোহিগণ ব্যতীত অন্য কেহ ঈশ্বরের নিদর্শন সকল সম্বন্ধে বিবাদ করে না।”

সুরা মুমেনের এই কয়েকটী কথা বেগম একবার, দুইবার, তিনবার, চারিবার পাঠ করিলেন। আবার সেই এক কথাই পাঠ করিতে লাগিলেন। কিছু কাল পরে কোরাণ খানি অত্যন্ত যত্ন এবং ভক্তির সহিত সেই স্বর্ণখচিত মকমলের বস্ত্র দ্বারা বান্ধিলেন। রাত্রি অবসান হইবার এখনও অনেক বিলম্ব আছে। বেগম কোরাণ খানি আবার শিয়রে রাখিয়া নিদ্রা যাইবার নিমিত্ত শয়ন করিলেন। এবার আর গৃহের আলো নির্ব্বাণ করিলেন না। প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রদীপ জ্বলিতে লাগিল। শয়ন করিবার পর অনেকক্ষণের মধ্যেও বেগমের নিদ্রা হইল না। একবার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেলে সহজে আবার নিদ্রা হয় না। শয়ন করিয়া বেগম ভাবিতে লাগিলেন, "ঈশ্বর পাপ ক্ষমাকারী, ঈশ্বর অনুতাপ গ্রহণ কারী, কিন্তু আবার ঈশ্বর কঠিন শাস্তিদাতা। জগদম্বা বেগম বলিয়াছেন, হাফেজনন্দিনীর শোণিত হইতে দাবাগ্নি উৎপন্ন হইয়া সমুদয় অযোধ্যা ছারখার করিবে। আর স্বপ্নেও সেই প্রজ্বলিত অগ্নিরাশিই দেখিলাম এ সকল নিশ্চয়ই কুলক্ষণ হইবে। জানিনা কি বিপদই সমুপস্থিত হইবে। কিন্তু এ পাপের কি আর প্রায়শ্চিত্ত নাই? হায় এ পাপের কি আর প্রায়শ্চিত্ত নাই?—প্রায়শ্চিত্ত নাই—এই ভাবিতে ভাবিতে বেগমের আবার নিদ্রাবেশ হইল। বেগম আবার নিদ্রাভিভূতা হইয়া পড়িলেন। কিন্তু, এবার নিদ্রাভিভূতা হইবামাত্র স্বপ্নে কি ভয়ঙ্কর দৃশ্যই দেখিতে লাগিলেন। আত্মহত্যার পর শয়নাগারের যে স্থানে হাফেজনন্দিনীর মৃতশরীর পড়িয়াছিল ঠিক সেই স্থানে হাফেজনন্দিনীর মৃত শরীর পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার বক্ষে সেই বিষাক্ত ছুরিকা রহিয়াছে, হাতখানি বুকের উপর পড়িয়া রহিয়াছে। আহত স্থান হইতে স্রোতে শোণিত নির্গত হইয়া সরযূ নদীর ন্যায় প্রশস্ত এক রক্তের নদী প্রবাহিত হইতেছে। দেখিতে দেখিতে হাফেজনন্দিনীর শরীর অদৃশ্য হইল। বেগমের শয্যা সেই শোণিত নদীর পার্শ্বে পড়িয়া রহিয়াছে। এক একবার নদীর ঢেউ আসিয়া তাঁহার শয্যা স্পর্শ করিতেছে। অযোধ্যাবাসী সহস্র সহস্র প্রজার মৃত দেহ সেই রক্ত নদীর স্রোতে পূর্ব্বদিকে ভাসিয়া যাইতেছে। বৃদ্ধ খোজা জহরালী এবং বহরালী নদীতে পড়িয়া তটে উঠিবার নিমিত্ত চীৎকার করিতেছে। ইংরাজ রেসিডেণ্ট মিডল্টন্ সাহেব, ব্রিষ্টো সাহেব এবং আর দশ বার জন ইংরাজ যষ্টি দ্বারা ঠেলিয়া ঠেলিয়া জহরালী এবং বহরালীকে নদীর মধ্যে ভাসাইয়া দিতেছে। তাহারা শতচেষ্টা করিয়াও তটে উঠিতে পারিতেছে না।

বেগম এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখিয়া স্বপ্নাবস্থায় বলিয়া উঠিলেন, "হাফেজনন্দিনী রক্ষা কর, রক্ষা কর, ক্ষমা কর, ক্ষমা কর। আমার এই বৃদ্ধ খোজা দুইটীর প্রাণ রক্ষা কর। ইহারা জননীর ন্যায় বাল্যাবস্থায় আমাকে পালন করিয়াছে।"

স্বপ্নাবস্থায় বেগমের মুখ হইতে এই কথা বাহির হইবামাত্র ক্রমে রক্তনদী অদৃশ্য হইতে লাগিল। বেগম দেখিলেন যে দেলখোসার বারেন্দায় তিনি বসিয়া আছেন। পবিত্র সলিলা সরযূ নদী সম্মুখে প্রবাহিত হইতেছে। সরযূ নদীর অপর পারের সেই বটবৃক্ষের নিকট হইতে স্বর্ণবিনির্ম্মিত রথে আরোহণ করিয়া হাফেজনন্দিনী এবং সীতা নদী পার হইয়া তাঁহার নিকট আসিতেছেন। সে স্বর্ণবিনির্ম্মিত রথ দেলখোসার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। রমণীদ্বয় রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক বেগমের নিকটে আসিলেন, এবং সহাস্যমুখে তাঁহার মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন, "ভয় নাই।"

বেগমের সর্ব্ব শরীর এখনও ভয় ও ত্রাসে কাঁপিতেছে। তিনি এই রমণীদ্বয়ের পদতলে পড়িয়া বলিতেছেন "মা তোমরা আমাকে রক্ষা কর, এ পাপের কি আর কোন প্রায়শ্চিত্ত নাই?"

এই কথা বলিবামাত্রই বেগমের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া দেখিলেন যে, জানালা দিয়া ঘরের মধ্যে সূর্য্যালোক প্রবেশ করিয়াছে।

বেগম প্রত্যহ প্রাতে উঠিয়া প্রথমতঃ নেমাজ করেন; তৎপরে বিষয় কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে বসেন। কিন্তু আজ নেমাজের পর কোন বিষয় কার্য্য দেখিতে ইচ্ছা হইল না। শরীর অসুস্থ হইয়াছে বলিয়া একাকিনী শয়নাগারে বসিয়া গত রাত্রের স্বপ্নের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন—

"একি আশ্চর্য্য স্বপ্নই দেখিলাম। হাফেজনন্দিনীর মৃত্যুর পূর্ব্বে এবং পরে জগদম্বা বেগম প্রতিদিন যে সকল কথা বলিতেন, তৎসমুদয়ই তো স্বপ্নে দেখিলাম। তবে তিনি যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহা সকলই কালেতে পূর্ণ হইবে নাকি?

"তিনি বলিয়াছেন হাফেজ নন্দিনীর শোণিত হইতে দাবাগ্নি প্রজ্জলিত হইয়া সমুদয় অযোধ্যাকে ভস্মীভূত করিবে। অযোধ্যার সমুদয় প্রজাগণ বিনষ্ট হইবে। কিন্তু স্বপ্নেও তো প্রজাগণের মৃত দেহ ভাসিতে দেখিলাম।

তখন তাঁহার কথা শুনিয়া হাসি পাইত। তাঁহাকেও কাফের বলিয়া মনে হইত। কিন্তু এখন দেখি যে ক্রমে ক্রমে তাঁহার সকল কথাই ফলিতেছে। একদিন তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন তুমি নারীধর্ম্ম বিবর্জ্জিত হইয়াছ আমি তখন তাঁহার কথা শুনিয়া আর হাসি সম্বরণ করিতে পারিলাম না। আমি মনে করিলাম, যে সকল রমণী আপন স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া পরপুরুষগামিনী হয়, তাঁহারাই নারীধর্ম্ম বিসর্জ্জন করে। আমি স্বপ্নেও নবাবকে ভিন্ন আর কাহাকেও জানি নাই। আমি নারীধর্ম্ম বিসর্জ্জন করিয়াছি, এ পাগলের উক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। জগদম্বা বেগমকে তখন পাগল বলিয়া মনে করিয়াছি।

"কিন্তু এখন স্বপ্নেও হাফেজনন্দিনীর মুখে সেই কথাই শুনিলাম। হাফেজনন্দিনীও আমাকে বলিলেন, যে, আমি নারীধর্ম্ম বিসর্জ্জন করিয়াই বিনাশের দিকে ধাবিত হইয়াছি। তবে নারীধর্ম্মটা কি ? স্বপ্নে হাফেজনন্দিনী আর একটী কথা বলিলেন, তাহার তো কোন অর্থই বুঝি না। তিনি বলিলেন সীতার তেজ গ্রহণ কর। এ তো সকলই কাফেরী কথা—হিন্দুদিগের কথা। তবে কি একটা হিন্দু গণক কিম্বা পণ্ডিতকে ডাকাইয়া এ সকল কথার অর্থ জিজ্ঞাসা করিব ? কিন্তু তাহা করিলে লোকে যে আমাকে পাগল বলিবে।

"জগদম্বা বলিয়াছেন, আকবর বাদসাহ এবং নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ হিন্দু পণ্ডিতদিগকে স্বপ্নের অর্থ জিজ্ঞাসা করিতেন। আমিও না হয় সেই পণ্ডিত ডাকাইয়া ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করি। কিন্তু স্বপ্নে যাহা দেখিয়াছি তাহা কোন্ মুখে লোকের নিকট বলিব। স্বপ্নে দেখিলাম হাফেজনন্দিনী আমাকে বলিতেছেন যে নারীধর্ম্ম বিসর্জ্জন করিয়া, আমি বিনাশের দিকে ধাবিত হইয়াছি। এ কথা তো লোকের নিকট বলিতেও লজ্জা বোধ হয়।"

বেগম এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে, আবার কোরাণ খুলিতে আরম্ভ করিলেন। কোরাণের প্রতি বেগমের অচলা ভক্তি। কোরাণখানি হাতে লইয়া আবার ভাবিতে লাগিলেন—"স্বপ্নের কথা কি সত্য হয় ? হিন্দু কাফের। হিন্দুর কথা সকলই মিথ্যা। কোরাণ ভিন্ন এ সংসারে কিছুই সত্য নহে। স্বপ্নে কত অদ্ভুত কাণ্ড দেখা যায়। জগদম্বার কাফেরের প্রতি ভক্তি ছিল, তাহাতে তিনি ঐরূপ বলিতেন। কাফের মনে করে

যে, স্বপ্নে তাহাদের দেব দেবীরা আসিয়া কথা বলে। ও কিছুই নহে। কোন কাফের পণ্ডিত ডাকিয়া আমার প্রয়োজন নাই। 'স্বপ্নে দেখিলাম আমি নারীধর্ম্ম বিসর্জ্জন করিয়াছি। আমি তো স্বামী ভিন্ন আর কাহাকেও জানিনা। আমার তিন কাল গিয়াছে। আমার কি আর এই বৃদ্ধকালে নিকা করিবার ইচ্ছা হইয়াছে, যে আমি নারীধর্ম্ম বিসর্জ্জন করিয়াছি ?"

এই চিন্তা করিতে করিতে বেগম অন্যমনস্ক হইয়া কোরাণখানি খুলিলেন। হঠাৎ সুরা কেয়ামৎ তাঁহার সম্মুখে পড়িল।

"কেয়ামৎ" এই শব্দ দৃষ্টিপথে পড়িবামাত্রই বেগমের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, তিনি কিছুকাল স্থিরচিত্তে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক মনে মনে বলিতে লাগিলেন—

"নিশ্চয়ই কোন অমঙ্গল হইবে। হাফেজনন্দিনীর প্রাণরক্ষা করিবার আমার সাধ্য ছিল। যখন সাধ্য থাকিতেও তাহার প্রাণ রক্ষা করি নাই, তখন কেয়ামতে (অর্থাৎ পরকালে) আমাকে ইহার দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। কেবল কেয়ামতে কেন? এখানেই কত শাস্তি হয় তাহা কে বলিতে পারে?

"একবার একটা হিন্দু পণ্ডিত কিম্বা গণক ডাকাইয়া এ স্বপ্নের অর্থ জিজ্ঞাসা করি। দেখি তাহারাই বা কি বলে। কিন্তু স্বপ্ন দেখিয়াছি সে কথা বলিবার কোন প্রয়োজন নাই। তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করা যাইবে, "সীতার তেজ" এ কথার অর্থ কি? নারীধর্ম্ম পালন করিতে হইলে কি করিতে হয়?"

বেগম এই প্রকার চিন্তা করিয়া জহরালী, দারাবালী প্রভৃতিকে ডাকাইয়া বলিলেন যে বৃদ্ধ হিন্দু পণ্ডিত বৃদ্ধ গণক যখন যেখানে দেখিতে পাইবে, তখনই তাহাদিগকে আমার নিকট লইয়া আসিবে। তাহাদিগের দ্বারা দুই একটা বিষয় গণনা করাইতে হইবে।

দারাবালীখাঁ হিন্দুর সন্তান ছিল; পরে মুসলমান হইয়াছে। হিন্দু গণকদিগের প্রতি এখনও তাহার একটু ভক্তি আছে। সুতরাং সে বলিল "মামা সাহেব অনেকানেক গণক এখানে আছে তাহারা ভূত ভবিষ্যৎ সকলই বলিতে পারে!"

দারাবালী প্রভৃতি খোজাগণ ইহার পর ফায়েজাবাদের রাস্তা ঘাটে এবং

হাট বাজারে সন্ন্যাসীর ভেক ধরা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দেখিলেই বেগমের মহলে লইয়া যাইত। বেগমের আদেশ অনুসারে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিত, 'সীতার তেজ কাহাকে বলে?' 'নারীধর্ম্ম পালন করিতে হইলে কি কাজ করিতে হয়?'

একদিন একটা শ্রীবৃন্দাবন অঞ্চলের ব্রাহ্মণ এই সকল প্রশ্নের উত্তরে বলিল—

"রামজী সীতাকি তেজ হায়—সীতারাম ওতো একি হায়।"

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলিল, "রামজীকি সেবাকে লিয়ে কুছ্ দেনেসে সব ধরম্ হোচুকে।"

আর একদিন একটা অযোধ্যার ব্রাহ্মণ প্রশ্নোত্তরে বলিল—

"হনুমানজী সীতাকি তেজ হায়, আউর দোস্‌রা কোন হায়।"

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলিল, "মাই, মেরে কুছ্ দেনেসে সব ধরম হোগা।"

১৭৭৭ সাল হইতে ক্রমান্বয়ে দুই তিন বৎসরকাল প্রায় প্রত্যহই খোজাগণ এই প্রকার দুই একটা ব্রাহ্মণ লইয়া আসিয়া আমোদ করিত। খোজা এবং বাঁদীদিগের আমোদ করিবার এই এক বিলক্ষণ সুযোগ হইল।

চতুর্ব্বিংশতিতম অধ্যায়।

বঙ্গের সুবাদারের এই অবস্থা।

জ্যৈষ্ঠ মাস। গগণমণ্ডল মেঘাবৃত হইয়া রহিয়াছে। প্রবল ঝঞ্ঝাবাতের আশঙ্কা করিয়া দিল্লীর নিকটবর্ত্তী পুলবাল গ্রামের কৃষকগণ দিবাবসান হইবার পূর্ব্বেই গৃহাভিমুখে চলিয়াছে। একজন কৃষক নিজে একটী হুঁকা হাতে করিয়া যাইতেছে। তাহার অগ্রে অগ্রে একটী বালক একপাল গোরু লইয়া চলিয়াছে। গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্রই বড় ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। সম্মুখে একটী পুরাতন তাম্বু রহিয়াছে। তাম্বুর স্থানে স্থানে আবরণ ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। এখন ইহার মধ্যে আর মানুষ বাস করিতে পারে না। বালকটী গোরু লইয়া তাম্বুর নিকটে আসিবামাত্র পালের কয়েকটা গরু তাম্বুর অনাবৃত স্থান দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

গোরু প্রবেশ করিবামাত্রই একটী বৃদ্ধা চীৎকার করিয়া বলিল, "আস্থর, আস্থর, ঘরের মধ্যে গোরু আসিয়াছে।"

একজন বৃদ্ধ মুসলমান তখন বাহির হইতে আসিয়া গোরু তাড়াইতে তাড়াইতে বলিল, "হা আল্লা! দুনিয়ার বাদ্‌সা যে, আজ তার ঘরের মধ্যে গোরু ঢোকে।"

বৃদ্ধা রমণী এই বৃদ্ধ মুসলমানটীকে আবার বলিলেন, "আস্থর, এখানে জল পড়ে। দেখো তো ঘরের আর কোঁন স্থানে শয্যা প্রস্তুত করিতে পার কি না।"

আস্থর। ঘরে কি আর বিছানা আছে? যে তিনখানি গালিচা ছিল, তাহাও কাল বিক্রয় করিয়াছি। আমি নবাবকে ধরিয়া উঠাইতেছি, আপনারা এই বিছানাখানি ঐদিকে সরাইয়া পাতিয়া দিন।

বৃদ্ধা। বাছার এখন একটু নিদ্রা হইয়াছে। এখন টানাটানি করিতে গেলে নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যাইবে। হেকিমেরা বলিয়াছেন, অনিদ্রাতেই বাছার রোগ হইয়াছে। হা পরমেশ্বর রাজ্যশোকে এ চৌদ্দ বৎসরকাল বাছার নিদ্রা নাই। অনিদ্রা হইতে বাছা আমার ক্ষিপ্ত হইল।

আস্থর। এখন নবাবকে এখান হইতে না সরাইলে নবাবের গায়ে জল পড়িবে। বিছানা ভিজিয়া যাইবে।

আর একটী রমণী এই রুগ্ন শয্যার পার্শ্বে বসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, "নবাবের গায়ে জল পড়িবে না। যে স্থান দিয়া জল পড়িতেছে, আমি সেদিকে পিঠ দিয়া বসিয়াছি। আমার পৃষ্ঠেই জল পড়িতেছে।"

এই শেষোক্তা রমণীর কথা শুনিয়া, আস্থরের দুই চক্ষু হইতে দর্ দর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে মনে মনে বলিতে লাগিল—

"হা পরমেশ্বর, দুই শত বাঁদী যাঁহার পরিচর্য্যার্থ নিযুক্ত ছিল, আজ সেই বেগম নিজে আপন পিঠ পাতিয়া দিয়া বৃষ্টির জল হইতে স্বামীর শয্যা ঢাকিয়া রাখিতেছেন!"

ইহাদিগের কথা বার্ত্তায় শয্যোপরি শায়িত রোগীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি জাগ্রত হইয়া বলিলেন, "বড় বৃষ্টি হইতেছে নাকি?"

শয্যা পার্শ্বস্থিতা বৃদ্ধা রমণী বলিলেন, "বাছা তুমি একটু নিদ্রা যাও। অনিদ্রাই তোমার সকল অসুখের কারণ।"

রুগ্ন ব্যক্তি বলিলেন, "মা, আর বড় বিলম্ব নাই। বোধ হয় আর

কিছুকাল পরে চিরনিদ্রা হইবে। সে নিদ্রা হইতে আর জাগিতে হইবে না।”

বৃদ্ধা রমণী এবং শয্যার পার্শ্বস্থিতা দ্বিতীয়া রমণী এই কথা শুনিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। রুগ্ন ব্যক্তি আপন জ্যেষ্ঠ পুত্রদ্বয়কে নিকটে ডাকিয়া আনিতে বলিলেন।

পাঠকগণ বোধ হয় সহজেই অনুমান করিতে পারিবেন যে এই রুগ্ন ব্যক্তিই বঙ্গের শেষ সুবাদার প্রজাহিতৈষী মুসলমান কুলতিলক নবাব মীরকাসিম। তাঁহার শয্যার পার্শ্বস্থিতা বৃদ্ধা রমণী তাঁহার শ্বাশুড়ী জগদম্বা বেগম। ইহাঁর প্রকৃত নাম সাহা চালিমবেগম * বাল্যকালের নাম মেহের উন্নিসা। ইনি নবাব মাহুরান জাঙ্গের বৈমাত্র ভগ্নী ছিলেন। কিন্তু নবাব মাহুরান জাঙ্গের পিতৃ বিয়োগ হইলে পর তাঁহার বিমাতা আপন কন্যাসহ নবাব আলিবর্দ্দির গৃহে অবস্থান করিতেন। মাহুরান জাঙ্গের বিমাতা নীচ বংশোদ্ভবা ছিলেন বলিয়া মাহুরান তাঁহাকে বিমাতা বলিয়া স্বীকার করিতেন না।

রুগ্ন শয্যায় উপবিষ্টা দ্বিতীয়া রমণী নবাব কাসিমালির স্ত্রী। ইনি এখন আপন পৃষ্ঠ দ্বারা বৃষ্টির জল হইতে স্বামীর শরীর ঢাকিয়া রাখিয়াছেন। আর এই বৃদ্ধ মুসলমানটীর নাম সেখ মহম্মদ আসুর। এ ব্যক্তি কাসিমালির অত্যন্ত বিশ্বস্ত ভৃত্য ছিল। কাসিমালির পলায়ন কালে তাঁহার সঙ্গে যে কিছু ধন সম্পত্তি ছিল, তাহার কিয়দংশ নবাব সুজাউদ্দৌলা সৈন্যদিগের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ বিক্রয় করাইয়াছিলেন। আর বক্রী সম্পত্তি বিশ্বাস ঘাতক ভৃত্যগণ কর্তৃক অপহৃত হইল। শুদ্ধ কেবল সেখ মহম্মদ আসুরের হাতে যে অল্প কিঞ্চিৎ স্বর্ণ ও রত্নাভরণ ছিল, তদ্দ্বারাই এ চৌদ্দ বৎসর কাসিমালি জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইলেন। †

* ১৭৭৫ সালের ২৪ জুলাইর বেঙ্গাল কনসালটেসনে (Bengal Consultation 24th July 1775) লিখিত হইয়াছে যে সাহা চালিম বেগমের ১৭৭৫ সনের পূর্ব্বেই মৃত্যু হইয়াছিল। কিন্তু মিরনের মাতা সাহা চালিম্ বেগম যে মীরকাসিমের সঙ্গে পলায়ন করিয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে অনেক প্রবাদ শুনা যায়। বেঙ্গল কনসালটেসনের উল্লিখিত বিবরণ কতদূর সত্য নিশ্চয় বলা যায় না।

† One servant however, by name Sheik Mohomed Ashur, was faithful to his fallen master; he had been entrusted with a small supply of jewel-

কাসিমালির পুত্র দুইটী আসিয়া পিতার শয্যাপার্শ্বে বসিল। ইহাদের পনের ষোল বৎসরের অধিক বয়ঃক্রম হইয়াছে। কিন্তু দরিদ্রতা নিবন্ধন শারীরিক পরিবর্দ্ধন বয়স অনুযায়ী হয় নাই। ইহাদিগকে দেখিলে তের চৌদ্দ বৎসরের অধিক বয়স্ক বলিয়া মনে হয় না।

কাসিমালি পুত্রদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,“বাছারা আমি চলিলাম। আমার মৃত্যুর পর তোমরা নজহফ্ খাঁর নিকট গিয়া বাদসাহের সৈন্যদলে প্রবেশ করিবে। যদি কখন রণকৌশলে পারদর্শিতা লাভ করিয়া সেনাপতির পদে অভিষিক্ত হইতে পার, তবে একবার পিতৃরাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা করিবে। কিন্তু বিদেশীয় লোকের সাহায্যে আর কখন রাজ্য লাভের চেষ্টা করিবে না। বিদেশীয় লোকের সাহায্যে রাজ্য লাভ করিয়াই তোমাদের পিতার এই দুরবস্থা।”

এই কথা বলিয়াই কাসিমালি অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কিছু কাল পরে শোকাবেগ সম্বরণ পূর্ব্বক আবার শাশুড়ী এবং স্ত্রীকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন—

“ক্ষিপ্তাবস্থায় তোমাদিগকে বড় কষ্ট প্রদান করিয়াছি। এই হতভাগ্যের সঙ্গে আসিয়াই এত কষ্ট পাইলে। মুর্শিদাবাদে থাকিলে আর তোমাদের এত কষ্ট হইত না। কেনইবা এ হতভাগ্যের সঙ্গে আসিলে।”

এ পর্য্যন্ত কাসিমালির স্ত্রী মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক কেবল অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিলেন। অধিক কথা বলিবার অভ্যাস তাঁহার কথনও ছিল না। অবশেষে তিনি বাষ্পাকুল কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন ;—

——“জঁহাপনা, তোমার সঙ্গে থাকিতে আমার নিজের কোন কষ্টই কষ্ট বোধ হয় না। কেবল তোমার কষ্ট দেখিয়াই আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। তোমার এবং সন্তানের কষ্ট দেখিয়াই আমার বুক ফাটিয়া যায়। পরমেশ্বর করুন আমি এবারেও যেন তোমার সঙ্গিনী হইতে পারি। এবারও আমাকে সঙ্গে করিয়া চল। তুমি পরিত্যাগ না করিলে আমি কখনও তোমার সঙ্গ ছাড়া হইব না।”

lery, with which he was directed to make his way to Rohilkund, which he effected and there awaited the arrival of his master, to whom he finally made over the charge committed to him, and furnished that wretched chief with the only means that enabled him to spin out a few years of misery and exile.—Broom's History of the Bengal Army page 466.

এই বলিয়াই স্বামীর পদতলে বসিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহার বাক্যাবসানে কাসিমালি সজল নয়নে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—

"হায় আমি কি ঘোর পাতকী। এই পতিপ্রাণা পুণ্যবতীকে আমি গৃহ বহিস্কৃতা করিয়াছিলাম। রাজ্যশোক আমাকে এতই মতিচ্ছন্ন করিয়াছিল!"

আবার শ্বাশুড়ীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—

"মা, মৃত্যুকালে আমাকে ক্ষমা কর। তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়াছি। তোমার উপদেশ না শুনিয়া এই হতভাগ্য কাসিমালির এই দশা হইল। বঙ্গের সুবাদারের এই অবস্থা। এখন বুঝিলাম যে সাধ্বী এবং পবিত্রমনা রমণীগণের অন্তরের মধ্যে স্বয়ং ঈশ্বর বাস করেন। তাঁহাদের মুখ হইতে যে সকল কথা বাহির হয়,সে সমুদয়ই ঈশ্বরের কথা। ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান বিবর্জ্জিত,অর্থগৃধ্নু, প্রবঞ্চক ইংরাজ দস্যুদিগের সাহায্য গ্রহণ করিয়া, আমি আপনার মৃত্যুবাণ আপনিই প্রস্তুত করিলাম। মা, তুমি বরাবরই ইংরাজের সাহায্য লইয়া রাজ্য লাভ করিতে নিষেধ করিয়াছিলে। তখন মনে করিতাম তুমি স্ত্রীলোক, তুমি বিষয় কার্য্য কিছু বুঝিতে পার না। কিন্তু তোমার ন্যায় মহানুভবা রমণীদিগের অন্তরে যে ঈশ্বর বাস করেন তাহা তখন বুঝিলাম না। পাপাসক্ত মনে শুভবুদ্ধি প্রবেশ করে না। রোগী যেরূপ কুপথ্যেরই জন্য লালায়িত হয়, কুটিল মন সেইরূপ অমঙ্গলের দিকে ধাবিত হয়। হায়! হায়! ইংরাজদিগকে টাকা দিবার নিমিত্ত যদি জমিদার তালুকদারের উপর অত্যাচার করিতে না হইত, তবে কাসিমালির নিমিত্ত তাহারা সকলেই অস্ত্র ধারণ করিত, হতভাগ্য কাসিমের জন্য অশ্রু বিসর্জ্জন করিত। মনে করিয়াছিলাম ইংরাজদিগের ঋণ পরিশোধ হইলে পর প্রজার মঙ্গল সাধনে যত্ন করিব, বঙ্গের সমুদয় প্রজাকে সুখী করিব, আলিবর্দ্দির ন্যায় হিন্দু মুসলমান সকলকে সমভাবে দৃষ্টি করিব। কিন্তু হতভাগ্য কাসিমের অদৃষ্টে আর সে দিন হইল না। হতভাগ্য কাসিম আজ এ সংসার হইতে বিদায় হইল। ইংরাজদিগের অত্যাচার হইতে প্রজাদিগকে রক্ষা করিতে আরম্ভ করিবামাত্রই কাসিমের দুর্দ্দিন সমুপস্থিত হইল!"

মৃত্যুর তিন চারি দিন পূর্ব্ব হইতে কাসিমালি এই প্রকার আক্ষেপ করিতেছিলেন। এই কয়েক দিন নিজেও কেবল ক্রন্দন করিলেন, শ্বাশুড়ী, স্ত্রী সন্তান সন্ততি এবং বিশ্বস্ত ভৃত্য আম্বর প্রভৃতিকেও কাঁদাইলেন।

তিন চারি দিনের মধ্যে ইহাদের কাহারও চক্ষের জল নিবারিত হইল না।

মৃত্যুর পূর্ব্বদিন আর বড় কথা বলিবার সাধ্য রহিল না তথাপি বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত ক্ষীণ স্বরে অনেক কথা বার্ত্তা বলিলেন। সে সকল আক্ষেপোক্তি উল্লেখ করিয়া পুস্তকের আয়তন বৃদ্ধি করা নিষ্প্রয়োজন। এ অসার সংসারে সকলই অনিত্য এবং ক্ষণস্থায়ী। শত শত অশ্ব গজ যাঁহার দ্বারে বদ্ধ থাকিত, সহস্র সহস্র দাস দাসী যাঁহার চরণ সেবা করিত, সুরম্য হর্ম্ম্য পরিপূর্ণ রাজপ্রাসাদে যিনি সতত বিরাজ করিতেন, যাঁহার দর্শন লাভার্থ দিন দিন দ্বারে সহস্র সহস্র লোক দাঁড়াইয়া থাকিত ; সেই বঙ্গের সুবাদার কাসিমালির আজ এই দুরবস্থা !

বেলা অবসান হইয়া আসিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে (খৃষ্টীয় অব্দের ১৭৭৭ সালের ৬ জুন তারিখে *) বঙ্গের শেষ সুবাদার প্রজাবৎসল প্রজার চির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী নবাব কাসিমালি খাঁ এই শোক দুঃখ পরিপূর্ণ সংসার পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন।

পতিপ্রাণা কাসিম পত্নীর এমন এক খানি বস্ত্র নাই, যদ্দ্বারা স্বামীর মৃত শরীর সমাবৃত করিয়া সমাধিস্থ করিবেন। প্রভুভক্ত ভৃত্য মহম্মদ আসুর স্বীয় প্রভুর মৃত শরীর আচ্ছাদিত যে একখানি মাত্র † শাল ছিল তাহাই বিক্রয় করিয়া আজ প্রভুর সমাধির ব্যয় নির্ব্বাহ করিল। ধন্য এই অশিক্ষিত প্রভুভক্ত ভৃত্য। সংসারের রাজপদ ধন ঐশ্বর্য্য সকলই অস্থায়ী সকলই কাল সহকারে বিনষ্ট এবং অপহৃত হইল। কিন্তু আসুরের এই প্রভুভক্তির দৃষ্টান্ত জ্বলন্ত অক্ষরে স্বর্ণরাজ্যে লিখিত হইয়া রহিল।

* Cossim Ally Khan is at last dead and buried. His demise was a Delhi, on the 29th of the moon Rabyal Sany that is on the 6th June 1777 —Asiatic Annual Register for 1800, Miscellaneous tracts page 36.

† It is said he died in great misery, and his last shawl was sold to pa for his winding sheet.—Asiatic Annual Register for 1800, Miscellaneou tracts page 35.

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়।

এ মানুষ নহে—এ রাক্ষস।

পাঠক, ফায়েজাবাদ হইতে অযোধ্যার রাজধানী লক্ষ্ণৌ স্থানান্তরিত হইয়াছে। এখন আর ফায়েজাবাদে কি দেখিবে। ফায়েজাবাদে পুত্রশোকে মতী বেগম মতীমহলে বসিয়া কাঁদিতেছেন। স্বামী-শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে পতিপ্রাণা বউ বেগম রাজ্য নাশের আশঙ্কা করিয়া সর্ব্বদাই খাসমহলে নানা চিন্তা করিতেছেন। এখানে এখন আর দেখিবার কিছু নাই। আর দুই তিন বৎসর পরে এখানে আসিয়া দেখিবে ইংরাজেরা চক্রান্ত করিয়া বেগমের সর্ব্বস্ব লুঠ করিতেছে, বেগম ভিখারিণী হইয়া পড়িয়াছেন। অন্নকষ্টে খোর্দ্দমহল হইতে সহস্র সহস্র রমণী ও বালক বালিকা চীৎকার করিতেছে।

যদি ইংরাজ চরিত্র দেখিতে চাহ তবে একবার লক্ষ্ণৌ চল। জলোকার ন্যায় ইংরাজগণ অযোধ্যার রক্ত শোষণ করিতেছে। সমুদয় শোণিত শোষিত হইবামাত্র জলোকার ন্যায় উদরভারে আপনা আপনিই খসিয়া পড়িতেছে; আপনাপনিই ছাড়িয়া যাইতেছে। কত শত শত ইংরাজ অযোধ্যায় যাইতেছে এবং দুই এক বৎসরের মধ্যে বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিয়া আবার অযোধ্যা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে।

এখনও ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রদেশই মহারাষ্ট্রীয়দিগের হাতে রহিয়াছে। ইংরাজদিগের দখলে শুদ্ধ কেবল বঙ্গ বেহার এবং উড়িষ্যা। কিন্তু এ তিন প্রদেশ ছারখার হইয়াছে। বঙ্গ দেশে আর অর্থ নাই। সুতরাং ভারত উদ্যান অযোধ্যাই আজ কাল ইংরাজদিগের একমাত্র অর্থ সঞ্চয়ক্ষেত্র হইয়া পড়িয়াছে।

মাতৃ শাসন হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার নিমিত্ত হীন বুদ্ধি নবাব আসফ-উদ্দৌলা লক্ষ্ণৌ নগরে রাজধানী স্থাপন করিয়াছেন। মার্ত্তুজা খাঁর মৃত্যু হইয়াছে। অর্থলোভী অকৃতজ্ঞ নিস্তেজ হায়দরবেগ খাঁ নবাবের প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। এদিকে নবাবের রাজ্যের যে কিছু রাজস্ব আদায় হইত, তৎসমুদয়ই লক্ষ্ণৌবাসী ইংরাজদিগের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ এবং সেই সকল ইংরাজ ও ইংরাজ রমণীদিগকে উপহার প্রদানার্থ ব্যয় হইতে

লাগিল। নবাবের অন্যান্য বৈমাত্র ভ্রাতা ভগ্নীর পেন্‌সন্ পর্য্যন্ত বন্দ হইয়া গেল। নবাবের রাজকোষ একেবারে অর্থশূন্য হইয়া পড়িল। এ দিকে ইংরাজ সৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ নবাব ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীকে যে দুই লক্ষ ষাট্ হাজার টাকা মাসে মাসে দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন তাহাও বাকী পড়িল। ১৭৭৭ সালে হেষ্টিংস আর এক দল সৈন্য অযোধ্যায় রাখিলেন। তাহার খরচও নবাবকে বহন করিতে হইল *। "কলিকাতা কৌন্সিল সেই টাকার নিমিত্ত নবাবকে বারম্বার লিখিতে লাগিলেন। নবাব দেখিলেন যে কোন ক্রমে ইংরাজদিগের দাবীকৃত টাকা পরিশোধ করিবার সাধ্য নাই। তিনি অনন্যোপায় হইয়া গবর্ণরজেনেরেল ওয়ারেণ হেষ্টিংসের নিকট পত্র লিখিলেন—

'আমার কর্ম্মচারিগণ যে পরিমাণ রাজস্ব আদায় করিতেছে, তদ্দ্বারা কোন প্রকারে ব্যয় নির্ব্বাহ হয় না। আমি আমার সমুদয় রাজ্য আপনার হাতে সমর্পণ করিলাম। আপনি আপনাদের ইংরাজ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া যদি অধিক রাজস্ব আদায় করিতে পারেন করুন; তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই। আমার সমুদয় রাজস্বই লক্ষ্ণৌস্থিত ইংরাজ কর্ম্মচারী-দিগের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ব্যয় হইতেছে। কোম্পানীর প্রাপ্য টাকা পরিশোধ করিবার সাধ্য নাই।"

হেষ্টিংস নবাবের এই পত্র পাইয়া মনে করিলেন যে ইংরেজদিগকে পদ প্রদান করিবার এই এক বিশেষ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। কোর্ট অব ডিরে-ক্টরের মেম্বরদিগের শালা, মামা, চাচাদিগকে চাকরি জুটাইয়া দিতে পারিলে ডিরেক্টরগণও তাহার উপর সন্তুষ্ট থাকিবেন। এই মনে করিয়া হেষ্টিংস এক দল ইংরাজ কর্ম্মচারী অযোধ্যায় প্রেরণ করিলেন। নবাবের পুরাতন কর্ম্মচারী সকল বরখাস্ত হইলেন। কেহ কেহ ইংরাজ কর্ম্মচারীর অধীনে থাকিয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন। অযোধ্যার রাজস্ব আদায়ের ভার ইংরেজদিগের হাতে ন্যস্ত হইল। ইংরাজকর্ম্মচারিগণ রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে ঘোর অত্যাচার আরম্ভ করিল। দেশের প্রজাগণ এ অত্যাচারে আপন আপন সন্তান সন্ততি পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া দেশ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল।

* The famous temporary Brigade.

হেষ্টিংসের প্রেরিত এই ইংরাজ মহাপুরুষদিগের মধ্যে কর্ণেল হ্যানে নামে একটা ইংরাজ ছিল। কর্ণেল হ্যানে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান জজ ইলাইজা ইম্পির আত্মীয় লোক। ইলাইজা ইম্পি হেষ্টিংসকে দুইবার বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। মহারাজ নন্দকুমারের প্রাণদণ্ড করিয়া ইম্পি হেষ্টিংসের মান সম্ভ্রম বজায় রাখিয়াছেন। আবার হেষ্টিংস সাহেবের ইস্তফাপত্র সম্বন্ধীয় গোলোযোগের সময় ইম্পিই হেষ্টিংসের পক্ষপাত করিয়া তাহাকে পদে বাহাল রাখিয়াছেন। ইলাইজা ইম্পির নিকট হেষ্টিংস চিরকৃতজ্ঞপাশে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। সুতরাং ইম্পির একজন আত্মীয়ের অন্নের সংস্থান করিয়া না দিলে চলে না। হেষ্টিংস ইম্পির আত্মীয় কর্ণেল হ্যানেকে অযোধ্যায় প্রেরণ করিলেন। হ্যানে সৈনিক পুরুষের পদ প্রাপ্ত হইয়া অযোধ্যায় আসিল। কিন্তু সে পদের বেতন তত অধিক ছিল না। কর্ণেল হ্যানে অযোধ্যায় আসিয়াই অযোধ্যার অন্তর্গত গোরকপুর এবং বেরুচ এই দুই জেলার ইজারদার হইল। এই দুই জিলার রাজস্ব আদায়ের ভার কর্ণেল হ্যানের হস্তে ন্যস্ত হইল। কিন্তু রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে কর্ণেল হ্যানে যেরূপ অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল, তাহা বর্ণন করিতে লেখনী অগ্রসর হয় না। বঙ্গদেশের রঙ্গপুর, দিনাজপুর এবং পুর্ণিয়ার রাজস্ব আদায় উপলক্ষে দেবীসিংহ এবং গুড্ল্যাড্ সাহেব যে অত্যাচার করিয়াছিল সে অত্যাচার অপেক্ষাও শতগুণে অধিকতর ভয়ানক অত্যাচারানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।

* * * * * * * * * * *

হাফেজনন্দিনীর শোণিতানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। গোরকপুর এবং বেরুচই সর্ব্বাগ্রে এ শোণিতানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। সেখানে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে এখন আর কোন বিভিন্নতা নাই। স্ত্রী পুরুষ সমুদয় শরবিদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় চীৎকার করিতেছে।

নরপিশাচ রাক্ষস-প্রকৃতি কর্ণেল হ্যানে রাজস্ব আদায় উপলক্ষে শত শত জমীদার এবং প্রজাকে লৌহ পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া বৈশাখমাসের প্রচণ্ড সূর্য্যোত্তাপে রাখিয়া দিয়াছে। কর্ণেল হ্যানের কয়েদঘরে অনাহারে সহস্র সহস্র লোক মরিয়া যাইতেছে, প্রহারে চীৎকার করিতেছে। এই হতভাগ্য কারারুদ্ধ কয়েদীগণ অপেক্ষা অত্যাচারের প্রারম্ভে যাহারা সন্তানাদি বিক্রয় করিয়া পলায়ন করিয়াছিল; তাহাদিগকে পরম ভাগ্যবান বলিতে হইবে। সন্তানাদিসহ এখন তো আর তাহাদিগকে এত কষ্ট এত যন্ত্রণা ভোগ

করিতে হইতেছে না। হয়ত এখন তাহারা জঙ্গলে আপন আপন স্ত্রী এবং বক্রী অবিক্রীত সন্তানাদি সহ বিচরণ করিতেছে ও বন্য ফলমূল আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতেছে। মঙ্গলময় পরমেশ্বর সে নিবিড় জঙ্গলের মধ্যেও অপার দয়াগুণে তাহাদের জীবন ধারণের জন্য ফলমূল সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু এ কারারুদ্ধ হতভাগ্যদিগের যন্ত্রণা একেবারে অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। ইহাদিগের যন্ত্রণা দেখিয়া, ইহাদের স্ত্রী পুত্র কন্যা সন্তান সন্ততি আত্মীয় স্বজন যাহারা এখন পর্য্যন্তও কারারুদ্ধ হয় নাই সকলেই অস্ত্রধারণ করিল। স্ত্রী পতির জন্য, মাতা সন্তানের জন্য, ভগ্নী ভ্রাতার জন্য অস্ত্র ধারণ করিয়া দুরাত্মা কর্ণেল হ্যান্নে এবং তাহার সহচারী ইংরাজদিগের শিরশ্ছেদন করিতে কৃত-সংকল্প হইল। বেরুচ এবং গোরকপুরে রাজবিদ্রোহ হইয়াছে বলিয়া ইংরাজগণ চীৎকার করিতে লাগিল।

কে বলে ইহাকে রাজবিদ্রোহ? দস্যুর হস্ত হইতে স্ত্রী আপন স্বামীকে রক্ষা করিবে, স্বামী স্ত্রীকে রক্ষা করিবে, মাতা পুত্রকে রক্ষা করিবে, পুত্র বৃদ্ধা জননীকে রক্ষা করিবে ইহার নাম কি রাজবিদ্রোহ? সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত ন্যায় পরায়ণ প্রজাবৎসল শ্রীরাম সদৃশ কিম্বা আকবর সদৃশ রাজার বিরুদ্ধে যে অস্ত্রধারণ করে সেই কেবল রাজ-বিদ্রোহী। সেই কেবল দণ্ডনীয়।

পাঠক! তোমার ইচ্ছা হয় তুমি ইহাদিগকে রাজবিদ্রোহী বল। কিন্তু কর্ণেল হ্যান্নের শিরশ্ছেদনাভিলাষিণী গোরকপুর ও বেরুচের এই অনাথা রমণীদিগকে আমি কখন রাজবিদ্রোহিনী বলি না। ইহারা শুদ্ধ কেবল আত্মরক্ষার অধিকার সঞ্চালন করিতেছে। পরম মঙ্গলময় পরমেশ্বর হইতে শরীর রক্ষার্থ, স্বামী পুত্র রক্ষার্থ যে অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে—যে অধিকার হইতে মানুষকে কোন পার্থিব রাজা বঞ্চিত করিতে সমর্থ নহে, সেই অধিকারই সঞ্চালন করিতেছে।

কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়! কুল মান বিসর্জ্জন করিয়া, এই অনাথা রমণীগণ যাহাদিগের নিমিত্ত আজ অস্ত্রধারণ করিয়াছে, তাহাদিগের অনেকেরই মৃত্যু হইয়াছে। বাকী যে দেড়শত কয়েদী ছিল, তাহাদিগের মধ্যে আঠার জনের শিরশ্ছেদন করিয়া কর্ণেল হ্যানে এবং তাহার সহচরগণ তাহাদিগের দেহ শূন্য মস্তক কয়েকটা এই অস্ত্রধারিণী রমণীদিগের দিকে নিক্ষেপ করিল।*

* As rebellion, however, and as a rebellion of the most unprovoked

রমণী হৃদয় বড় কোমল। রমণী-হৃদয় স্নেহে পরিপূর্ণ। ভারত রমণী প্রহার সহ্য করিতে পারে; অন্ন কষ্ট সহ্য করিতে পারে; দারিদ্র্য ক্লেশ সহ্য করিতে পারে, যত প্রকার ত্যাগ স্বীকার পৃথিবীতে আছে সকলই তাহাদের সহ্য হয়; কিন্তু পতি পুত্রের শোক কখন সহ্য করিতে পারে না। ভারত রমণী যদি পতি শোক সহ্য করিতে সমর্থা হইতেন তবে তিনি সহমৃতা হইবেন কেন?

অবলার যে দুর্ব্বল হস্ত পতি পুত্রের উদ্ধারের আশা সবল করিয়াছিল, উত্তেজিত করিয়াছিল, পতি পুত্রের দেহ শূন্য মস্তক দর্শনমাত্র সে হস্ত অবশ হইয়া পড়িল, হস্তস্থিত অস্ত্র ভূমিতলে নিপতিত হইল। পতি পুত্র শোকে রমণীগণ ছিন্ন তরুর ন্যায় ভূতলশায়িনী হইলেন। কর্ণেল হ্যানে নিরপরাধী লোকের শিরশ্ছেদন করিয়া অদ্যকার বিদ্রোহ এইরূপে নিবারণ করিল।

কিন্তু গোরকপুর এবং বেরুচের এ আগুণ শীঘ্র শীঘ্র নির্ব্বাণ হইল না। এ হাফেজনন্দিনীর শোণিতসম্ভূত অনল। সমুদয় অযোধ্যা ভস্মীভূত না করিয়া এ অনল নির্ব্বাণ হইবে না।

প্রজাবৎসল জায়গীরদার রাজা মস্তফা খাঁ * এবং রাজা খিনুসিংহ কারারুদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন। সহস্র সহস্র প্রজা অস্ত্র শস্ত্র হাতে করিয়া, কর্ণেল হ্যানের শিরশ্ছেদন করিতে আসিয়াছেন। আবার প্রজাদিগের পশ্চাতে

kind, it was treated by Colonel Hannay; and to one instance of the means taken for suppressing it, as proved by evidence before your Lordship, I will just beg leave to call your attention. One hundred and fifty of the inhabitants had been shut up in one of the mud forts; the people of the country in their rage attacked the fort and demanded the prisoners; they called for their brothers, their fathers and their husbands, who were confined there. It was attacked by the joint assualt of men and women. The man who commanded in the fort immediately cut off the heads of eighteen of the principal prisoners, and tossed them over the battlements to the assailants.—Burke's speech vol II. page 142.

* There happened to be a prisoner in the fort, a man liked and respected in his country, and who, whether justly or unjustly, was honoured and much esteemed by all the people "Give us our Rajah Mustapha Khan cried out the assailants . . . . . . (Colonel Hannay sends a Captain William who beheaded Rajah Mustapha Khan) upon this the rebellion blazed with tenfold fury, and the people declared they would be revenged for the destruction of their zemindars.

হস্তী-পৃষ্ঠে সীতাসদৃশী এক অবগুণ্ঠনবতী অস্ত্র হাতে আসিতেছেন। ঠিক যেন চন্দ্রাননা জনকতনয়া বৈদেহী শতস্কন্ধ রাবণ বিনাশার্থ সংগ্রামক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালন করিতেছেন।

এ অবগুণ্ঠনবতী কে? * আবার কি সেই রমণীশ্রেষ্ঠ ভগবতী হৈমবতী গিরিনন্দিনী অসুর বধার্থ সিংহপৃষ্ঠে সংগ্রাম ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন?

এ গিরিনন্দিনী নহেন। তিনি হইলে নিশ্চয়ই সিংহারোহণে আসিতেন। এ অন্নপূর্ণা সদৃশী রাজা মস্তফা খাঁর সহধর্ম্মিণী, বেরুচের রাণী। প্রজাদিগকে অন্ন প্রদান না করিয়া, দরিদ্র এবং দুঃখীদিগকে অন্ন বিতরণ না করিয়া, ইনি নিজে কখন আহার করেন না। সেই জন্যই এত প্রজা আজ রাজা মস্তফা খাঁর উদ্ধারার্থ প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে আসিয়াছে। স্বয়ং রাণী তাহাদিগের পশ্চাতে থাকিয়া, তাহাদিগকে সংগ্রামক্ষেত্রে পরিচালন করিতেছেন।

প্রজাগণ কারাগারের নিকট পৌঁছিবামাত্রই কর্ণেল হ্যানের আদেশ অনুসারে তাহার অনুচর নরপিশাচ কাপ্তেন উইলিয়াম রাজা মস্তফা খাঁর শিরশ্ছেদন করিয়া ছিন্ন মস্তক ইহাদিগের দিকে নিক্ষেপ করিল। দুর্বৃত্ত হ্যানে এবং দুরাত্মা উইলিয়াম মনে করিয়াছিল যে পূর্ব্বদিনের ন্যায় ছিন্ন মস্তক দর্শনেই প্রজাগণ চলিয়া যাইবে। কিন্তু ইহাতে প্রজাগণের ক্রোধানল শতগুণে প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল।

"আমাদের রাজার জন্য এ প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হইবে, আমাদের রাণীমার জন্য প্রাণ দিতে হইবে" এই চীৎকার শব্দে আকাশ পরিপূর্ণ হইল।

ক্রমে দুই তিন বৎসর পর্য্যন্ত বেরুচ এবং গোরকপুরে প্রজাগণ সংগ্রামক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে লাগিল, প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া সমরে প্রবেশ করিতে লাগিল ধন্য বেরুচের প্রজাগণ, ধন্য বেরুচের রাণী; স্বার্থপরতা এবং কাপুরুষতা বিসর্জ্জন করিয়া অত্যাচারের অবরোধ করিতে যাহারা কৃতসঙ্কল্প হয়, স্বর্গের দ্বার তাহাদিগের নিমিত্ত চিরকালই উন্মুক্ত রহিয়াছে। স্বর্গের রাজাধিরাজ সন্তান বৎসল পরম পিতা, স্নেহময়ী জননী তাহাদিগের নিমিত্ত আপন ক্রোড় প্রসারণ করিয়া বসিয়া আছেন।

---

* রাজা মস্তফা খাঁর স্ত্রী স্বয়ং প্রজাদিগকে সংগ্রামক্ষেত্রে পরিচালন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। কিন্তু কতদূর সত্য তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

ষষ্ঠবিংশতিতম অধ্যায়

পথভ্রান্ত পথিক।

এ সংসারে সকলেই বড় লোকের কথা বলে, ধনী লোক দেখিলে আদর করে। গরিব দীন দরিদ্রকে কেহ ডাকিয়াও জিজ্ঞাসা করে না। গরিবের নাম কেহ মুখেও আনে না। গরিব এবং দীন দরিদ্রের নাম সকলে ভুলিয়া যায়। আমরাও এই সংসারেরই লোক। নবাব, বেগম, রাজা এবং জমীদারদিগের কথা বলিতে আরম্ভ করিয়া, দীনদুঃখী বাণেশ্বর ভট্টাচার্য্যকে একেবারে বিস্মৃত হইয়াছি।

পাঠক পাঠিকাগণ বোধ হয় পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে বাণেশ্বরের নাম পাঠ করিয়া বলিয়া উঠিবেন—"একি অসম্ভব কথা। পূর্ব্ব বাঙ্গালার বিক্রমপুরের একটা ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ শতবৎসর পূর্ব্বে হাইদ্রাবাদ, পুনা প্রভৃতি প্রদেশ ভ্রমণ করিয়াছিল। এ কথা যে বিশ্বাস করিতে পারে সে হনুমানের যে শত যোজন সুদীর্ঘ লেজ ছিল তাহাও বিশ্বাস করিতে পারে। বিক্রমপুরের ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ কীর্ত্তিনাশা নদী পার হইবার সময়েই প্রাণের ভয়ে চীৎকার করেন। তিনি শতবৎসর পূর্ব্বে হাইদ্রাবাদ রোহিলখণ্ড প্রভৃতি দেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন ?

কিন্তু চিন্তাশীল পাঠক, এ সংসারের কার্য্য কলাপ এবং অবস্থার বিষয় একটু চিন্তা কর। তাহা হইলে আর বাণেশ্বরের দেশ পর্য্যটনের কথা তোমার নিকট অসম্ভব বলিয়া বোধ হইবে না। সংসারের ঘটনা স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে যে কোথাকার লোক কোথায় চলিয়া যায় তাহা কি কেহ নির্ণয় করিতে পারে ? বাণেশ্বর ইচ্ছা করিয়া দেশ ভ্রমণ করিতেছে, এ কথা বলিলে অবশ্যই অসম্ভব বোধ হইত। কিন্তু বাণেশ্বর সংসারের দুর্ঘটনার স্রোতে ভাসিতেছে। বাণেশ্বর অমরসিংহের পিতা। গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে গিয়াছিল। কোন ঘটনা সংযোগে তাহার প্রাণ রক্ষা হইয়াছে। পুত্র কন্যার শোকে পাগল হইয়া সে এখন স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিতেছে। ইহার পক্ষে হাইদ্রাবাদ প্রভৃতি দেশ পর্য্যটন করা কি অসম্ভব কথা ?

পাঠকদিগের স্মরণ থাকিতে পারে, যে, রোহিলাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে বাণেশ্বর শ্রীনিবাস পণ্ডিতের নিকট হইতে বিদায় হইয়া রোহিলখণ্ডে চলিয়া যায়। রোহিলা যুদ্ধের সময় বাণেশ্বর রোহিলখণ্ডে ছিল। রোহিলাযুদ্ধে হাফেজ রহমতখাঁর বীরত্ব দর্শনে এবং যুদ্ধাবসানে রোহিলা রমণীদিগের দুরবস্থা দেখিয়া, বাণেশ্বরের হৃদয়স্থিত মৃতপ্রায় গুণগ্রাহিতা এবং সহানুভূতি উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। ইহাতেই বাণেশ্বরের ক্ষিপ্তাবস্থা দূর হইল।

মানবমন বিবিধযন্ত্রে গঠিত। সেই সমুদয় যন্ত্র একত্র হইয়া যখন কার্য্য করে তখনই মানুষ প্রকৃতিস্থ থাকে। আর অন্যান্য সমুদয় যন্ত্রের কার্য্য রহিত হইয়া, যখন কেবলমাত্র দুই একটা যন্ত্র কার্য্য করিতে থাকে, তখনই মানুষ পাগল হয়। অর্থাৎ একটা প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া মানুষ যখন কেবল বিষয় বিশেষের দিকে ধাবিত হয়, অন্য কোন বিষয়ে সে মনোনিবেশ করিতে পারে না, তখন সকলেই তাহাকে পাগল বলে। সে বিষয় বিশেষের জন্য পাগল হইয়া পড়ে। কিন্তু একটা প্রবৃত্তির কার্য্যাধিক্য যখন অন্যান্য প্রবৃত্তির দ্বারা সংযত হয়, তখন আর লোক বিষয় বিশেষের নিমিত্ত পাগল হইতে পারে না, তখন সে প্রকৃতিস্থ থাকে। চিন্তা করিয়া দেখিলে অতি সহজেই উপলব্ধি হইবে, যে, এ সংসারের প্রায় সমুদয় লোকই পাগল। কৃপণ ধন সঞ্চয় করিবার নিমিত্ত পাগল; যশোলিপ্সু যশের জন্য পাগল; সহস্র সহস্র লোক পদ প্রভুত্বের নিমিত্ত পাগল হইয়া রহিয়াছে। তবে সংসারের অধিকাংশ লোক যে সকল বিষয় লাভ করিবার নিমিত্ত পাগল হইয়া রহিয়াছে, সে বিষয় লাভ করিবার জন্য লোক পাগল হইলেও তাহাকে কেহ পাগল বলে না। তাহাকে সকলেই বুদ্ধিমান বলে। কিন্তু যে বিষয়ের নিমিত্ত জন-সাধারণকে পাগল হইতে দেখা যায় না, তাহার জন্য যে ব্যক্তি পাগল হয়, তাহাকেই লোকে পাগল বলে। দল ছাড়া হইয়া সেই কেবল ধরা পড়ে।

* * * * * * * * * * *

বাণেশ্বরের অন্তরে সমুদয় মানব মণ্ডলীর উপর একটা ঘোর বিদ্বেষের ভাব উপস্থিত হইয়াছিল। সেই বিদ্বেষের ভাব তাহার অন্তরস্থিত দয়া, মায়া, স্নেহ, সমুদয়ই বিনাশ করিয়াছিল। সুতরাং বাণেশ্বর পাগল হইয়া পড়িল। কিন্তু হাফেজ রহমতের বীরত্ব দর্শনে বাণেশ্বরের হৃদয়স্থিত মৃত প্রায় গুণ-

গ্রাহিতা উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তৎপরে যুদ্ধাবসানে রোহিলা রমণীদিগের চীৎকার ও আর্ত্তনাদ শ্রবণে বাণেশ্বরের হৃদয়ে আবার দয়া মায়া পুনরুজ্জীবিত হইল। বাণেশ্বরের মন হইতে সে বিদ্বেষের ভাব হ্রাস হইতে লাগিল। সে ক্রমে ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইল। কখনও কখনও ইংরাজ সৈন্যের আক্রমণ হইতে কোন স্ত্রীলোককে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত তাহার ইচ্ছা হইত; কিন্তু তাহার শরীরে একেবারেই বল নাই, সে আর কাহার সাহায্য করিতে পারে নাই।

একদিন একটী ষোড়শবর্ষীয়া ক্ষত্রিয় কন্যাকে একটা মুসলমান সিপাহী ধরিয়া লইয়া চলিল। যুবতীর বৃদ্ধামাতা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ক্রন্দন করিতে করিতে চলিলেন। বাণেশ্বর বৃদ্ধাকে এই রূপ আর্ত্তনাদ করিতে দেখিয়া মনে মনে অত্যন্ত কষ্টানুভব করিতে লাগিলেন। তিনি আর আত্মসংযম করিতে পারিলেন না, দ্রুতপদে যাইয়া সিপাহীকে আক্রমণ করিবামাত্র সিপাহী তরবারি দ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিল। তিনি মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়া রহিলেন। বৃদ্ধা জননীও সিপাহী কর্ত্তৃক আহত হইয়া অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। সিপাহী যুবতীকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া গেল। বৃদ্ধা রমণীর গাত্রে কোন অস্ত্রাঘাত পড়ে নাই, তিনি কিছুকাল পরে চৈতন্যলাভ করিয়া দেখিলেন যে তাঁহার কন্যাকে লইয়া সিপাহী চলিয়া গিয়াছে, আর এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁহার উপকারার্থে আসিয়া আস্ত্রাঘাতে মৃত প্রায় হইয়া পড়িয়াছেন। ক্ষত্রিয় রমণীদিগের ব্রাহ্মণের প্রতি অত্যন্ত ভক্তি। বৃদ্ধারমণী মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, হায় আমার উপকারার্থে সিপাহীকে আক্রমণ করিয়া এই ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইল। তিনি গ্রামস্থ আর দুই একটী স্ত্রীলোককে সঙ্গে করিয়া আনিয়া, মৃতপ্রায় বাণেশ্বরকে আপন গৃহে লইয়া গেলেন। বাণেশ্বরের মৃত্যু হয় নাই। বৃদ্ধা দুই তিন মাস বাণেশ্বরের সেবা শুশ্রূষা করিয়া তাঁহাকে পুনর্জ্জীবিত করিল। বৃদ্ধা আপন আত্মীয়ের ন্যায় বাণেশ্বরের পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। বাণেশ্বরের হৃদয়স্থিত সদ্ভাব ইহাতে আরও উত্তেজিত হইল। তিনি অরোগ্যলাভ করিয়াই বৃদ্ধাকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার কন্যার অনুসন্ধানে অযোধ্যায় চলিলেন। ইঁহারা মনে করিলেন যে সিপাহী হয় ত যুবতীর ধর্ম্ম নাশের চেষ্টা করিয়া পরে ছাড়িয়া দিবে। অনেক রমণীদিগকে এই প্রকার ছাড়িয়া দিয়াছিল। এইরূপ চিন্তা করিয়া ইঁহারা ফায়েজাবাদে যাত্রা করিলেন। দশ বার দিনের মধ্যেই ফায়েজাবাদে আসিয়া পৌঁছিলেন

এবং ছয় সাত মাস কাল ইঁহারা স্থানে স্থানে যুবতীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অবশেষে এক দিন অকস্মাৎ একখানি ভগ্ন গৃহের দ্বারে সেই যুবতীকে দেখিতে পাইয়া, বাণেশ্বর এবং তাহার বৃদ্ধা জননী দৌড়িয়া তাহার নিকটে গেলেন। যুবতী আপন জননীকে দেখিয়া যার পর নাই আনন্দ লাভ করিল। কিন্তু সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল যে, ক্ষত্রিয় সিপাহী নর-পিশাচের হস্ত হইতে তাহার ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছেন, আজ দুই দিন হইল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার সমুদয় অর্থ সম্পত্তি তিনি মৃত্যুকালে তাহাকে দিয়া গিয়াছেন।

কন্যার মুখে এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধা জননীর প্রথমতঃ সন্দেহ হইল যে, হয়তো তাহার কন্যা সিপাহীর নিকট আত্মবিক্রয় করিয়াছে। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তাহা নহে। এ যুবতীর বিলক্ষণ ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান ছিল, তিনি জননীর সন্দেহ দূর করিবার নিমিত্ত সমুদয় অবস্থা তাঁহার নিকট বলিলেন।

যে মুসলমান সিপাহী এই যুবতীকে ধৃত করিয়াছিল, সে বাণেশ্বরকে আঘাত করিবামাত্রই একজন ক্ষত্রিয় সিপাহী তাহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে ইহাদের উভয়ের মধ্যে অত্যন্ত বিবাদ উপস্থিত হইল। ক্ষত্রিয় সিপাহী সক্রোধে মুসলমানকে এক পদাঘাত করিলেন। মুসলমানও তাঁহাকে আক্রমণ করিল। অবশেষে সেই ক্ষত্রিয় মুসলমান সিপাহীকে প্রহার করিতে করিতে একেবারে মৃতপ্রায় করিলেন।

মুসলমান পরাস্ত হইলে পর এই যুবতী ক্ষত্রিয় সিপাহীর পদতলে পড়িয়া বলিল, "বাবা তুমি আমার পিতা। আমার ধর্ম্ম-রক্ষার ভার তোমার হাতে।"

অনেকে মনে করেন যে সিপাহী হইলে সে এক দুর্বৃত্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু এটী স্পষ্ট ভ্রম। পৃথিবীর অন্যান্য লোকের অন্তরে যদ্রূপ দয়া ধর্ম্ম ইত্যাদি সদ্গুণ রহিয়াছে, সিপাহীর মধ্যে তৎসমুদয়ই পরিলক্ষিত হয়। পৃথিবীর অন্যান্য লোকও যদ্রূপ হাঁটে, চলে, খায়, সংগ্রামক্ষেত্র হইতে বাহির হইবামাত্র সিপাহীর মধ্যেও সেই সকল ভাবই দেখিতে পাওয়া যায়। এই ক্ষত্রিয় সিপাহী যুবতীর কাতরোক্তি শ্রবণ করিবামাত্র তাঁহার অন্তরে দয়ার সঞ্চার হইল। সিপাহী বলিলেন, "বাছা, তোমার কোন ভয় নাই। আমি তোমাকে আপন কন্যার ন্যায় মনে করিব। আর তোমার জননীর নিকট আমি কল্য অপরাহ্নে তোমাকে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিব।" কিন্তু এই সিপাহী

তাঁবুতে পৌঁছিবামাত্রই ইহাদিগের তৎক্ষণাৎ তাঁবু ভাঙ্গিয়া সেই রাত্রেই বিশুলিতে যাইবার হুকুম হইল। সিপাহী যুবতীকে আর তাহার জননীর নিকট পৌঁছাইয়া দিয়া আসিতে সমর্থ হইল না। রাত্রে এখন যুবতীকে কোথায় রাখিয়া যাইবে। এ দিকে রোহিলখণ্ডের সর্ব্বত্রই সৈন্য বিচরণ করিতেছে। যুবতীরও একাকিনী আপন বাসস্থানে যাইতে সাহস হইল না। এই স্থান হইতে ইহার বাড়ী প্রায় দশ ক্রোশ দূর হইবেক।

সিপাহী আর কোন উপায় অবধারণ করিতে না পারিয়া, যুবতীকে সঙ্গে করিয়া বিশুলিতে চলিল। এখানে পৌঁছিয়া দেখিল যে নবাব পূর্ব্বেই ফায়েজাবাদে রওনা হইয়াছেন। তখন ইহারাও দুই তিন দিন পরে ফায়েজাবাদে যাত্রা করিল। মনে করিল যে ফায়েজাবাদে যাইয়া পরে যুবতীকে তাহার মাতার নিকট রাখিয়া আসিবে। কিন্তু ফায়েজাবাদে পৌঁছিবার কিছুকাল পরেই এই সিপাহী জ্বর আমাশয় রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িল। কেণ্টনমেণ্টে সকলের প্রায় ব্যারাম হইতে লাগিল। সিপাহী এ যুবতীকে লইয়া বড়ই বিপদে পড়িল। এখন কি করিবে কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। বিশেষতঃ সঙ্গের এ স্ত্রীলোকটিকে লইয়া কেণ্টনমেণ্টের মধ্যে থাকিবার বড় সুবিধা নাই। সিপাহী তখন নবাবের প্রাসাদ হইতে পূর্ব্বদিকে প্রায় এক ক্রোশ দূরে একটী জনশূন্য ভগ্ন গৃহের মধ্যে গিয়া এই যুবতীর সঙ্গে একত্রে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পাঠকগণের স্মরণার্থ বলিতেছি যে এই ভগ্ন গৃহেই অমর সিংহ এবং ছত্রসিংহ ফায়েজাবাদে * আসিয়া অবস্থান করিতেছিল। অমরসিংহ এবং ছত্রসিংহ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যাইবার দুই তিন দিন পরে এই সিপাহী আসিয়া যুবতীর সহিত একত্রে এই গৃহে আশ্রয় লইলেন।

প্রায় দুই তিন মাসের মধ্যেও সিপাহী আরোগ্যলাভ করিতে পারিলেন না। বরং ক্রমেই তাঁহার রোগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। যুবতী তাঁহাকে আপন পিতার ন্যায় সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল। ইহাদিগের পরস্পরের মধ্যে ঠিক পিতা ও কন্যার সম্বন্ধই সংস্থাপিত হইল। দুই মাস পরে উক্ত সিপাহীর মৃত্যু হইল।

কেণ্টনমেণ্টে এই সিপাহীর এক কনিষ্ঠ ভ্রাতাও সিপাহীর কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। মৃত সিপাহী মৃত্যুর এক দিন পূর্ব্বে এই যুবতীকে আপন কনিষ্ঠ

* প্রথম খণ্ডের যে যে স্থানে লক্ষ্ণৌ রাজধানী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে সেই সকল স্থানে ফায়েজাবাদ পাঠ করিতে হইবে।

ভ্রাতার হাতে সমর্পণ করিল; এবং তাঁহার সমুদয় অর্থ সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ এই কন্যাটীকে দিতে বলিল। যুবতী তাহার উপকারী প্রোগুক্ত সিপাহীর কনিষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে দুই দিবস হইল এই গৃহেই রহিয়াছে। অকস্মাৎ তৃতীয় দিন অপরাহ্নে তাঁহার জননী এবং বাণেশ্বরের সঙ্গে ইহার সাক্ষাৎ হইল।

মৃত সিপাহীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা আপন ভ্রাতার প্রদত্ত সমুদয় টাকা এই কন্যাটীকে প্রদান করিয়া, তাহাকে তাহার মাতার হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক কেণ্টনমেণ্টে চলিয়া গেল।

বাণেশ্বর এবং এই রমণীদ্বয় দুই দিন এই ভগ্ন গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইহাঁরা দশ দিন একাদিক্রমে হাঁটিয়া এখানে আসিয়াছেন। দুই তিন দিন বিশ্রাম না করিয়া আর ইহাঁদের কোথাও যাইবার সাধ্য নাই।

দুই দিন পরে যুবতী এবং তাঁহার বৃদ্ধা জননী পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, তাঁহারা আর রোহিলখণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন না। রোহিলখণ্ড একেবারে অরাজক হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং তাঁহারা পরম পবিত্র তীর্থ স্থান কাশীতে গিয়া বাস করিবেন। এই যুবতীর স্বামীও রোহিলা যুদ্ধেই প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন। ইহার পিতা এবং ভ্রাতাদিগেরও মৃত্যু হইয়াছে। এখন আর সংসারে ইহাদের কেহই নাই। যুদ্ধাবসানে ইহাদের বাড়ী ঘর লুঠ হইয়াছে। সুতরাং কাশীতে যাইয়া বাস করিবে বলিয়াই স্থির করিলেন এবং বাণেশ্বরকেও ইহাদের সঙ্গে কাশীতে যাইতে অনুরোধ করিলেন। বাণেশ্বর ইঁহাদিগকে অন্ততঃ কাশী পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিতে সম্মত হইলেন।

এই তিন দিন বাণেশ্বর এবং এই রমণীদ্বয় ভগ্ন গৃহের একটী প্রকোষ্ঠের মধ্যেই বসিয়া থাকিতেন ঘরের অন্যান্য প্রকোষ্ঠে বড় প্রবেশ করিতেন না। আজ কাশীতে যাইবার দিন যুবতীকে মৃত সিপাহী তাঁহার জিনিষ পত্র সমুদয় দিয়া গিয়াছেন। এই সকল জিনিষ পত্র বান্ধিবার জন্য বাণেশ্বর গৃহের এ দিক্ ওদিক্ দড়ী তল্লাস করিতে লাগিলেন। হঠাৎ এই গৃহের পশ্চিম বারেন্দায় যাইয়া দেখিলেন যে বারেন্দার প্রাচীরের স্থানে স্থানে অঙ্গার দ্বারা বাঙ্গালা অক্ষরে কত কি লিখিত রহিয়াছে।

বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করার পর আর বাঙ্গালা অক্ষর কোথাও বাণেশ্বরের চক্ষে পড়ে নাই। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে হয় দেবনাগর না হয় পারস্য অক্ষরই

সর্ব্বত্র প্রচারিত। বাণেশ্বর প্রাচীরে বাঙ্গালা অক্ষর দেখিয়া প্রাচীরের নিকটে যাইয়া, যাহা লিখিত রহিয়াছে তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন। এক স্থানে লিখিত রহিয়াছে—

"দৃষ্ট্বা সীতাং পরামৃষ্টাং দেবো দিব্যেন চক্ষুষা।
কৃতং কার্য্যমিতি শ্রীমান্ ব্যাজহার পিতামহঃ॥"

ইহার নীচেই আবার লিখিত রহিয়াছে—

"হাফেজনন্দিনী সীতা—হাফেজনন্দিনীর যে ধর্ম্মনষ্ট করিবে সে নিশ্চয়ই মরিবে—নিশ্চয়ই মরিবে—স্বয়ং ব্রহ্মা তাহার উদ্ধারার্থ আমাকে সাহায্য করিবেন।"

প্রাচীরের অন্য এক পার্শ্বে লিখিত রহিয়াছে—

"দৃষ্ট্বা সীতাং পরামৃষ্টাং দণ্ডকারণ্য বাসিনঃ।
রাক্ষসাস্তু বিনাশঞ্চ প্রাপ্তুংবুধ্বা যদৃচ্ছয়া॥"

ইহার নীচে লিখিত রহিয়াছে—

"জালালউদ্দীন, এবার আর তোর নিস্তার নাই। হাফেজনন্দিনীকে নিশ্চয়ই রক্ষা করিতে হইবে। তোর মৃত্যু আমার হাতে।"

বাণেশ্বর এই সকল পাঠ করিয়া একেবারে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া পড়িলেন। ভাবিতে লাগিলেন—

"এ কি আশ্চর্য্য! এই হস্তলিপি ঠিক আমার বাছা ভুবনেশ্বরের হস্তাক্ষরের ন্যায় বোধ হয়। আমার পুত্র এখানে কেমন করিয়া আসিবে? তবে কি আমার ন্যায় কোন অভূতপূর্ব্ব ঘটনা সংযোগে তাহারও প্রাণরক্ষা হইয়াছে? যদি প্রাণ রক্ষা হইয়াইবা থাকে, তবে সে এখানে কিরূপে আসিল? পুত্রের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে আবার আমার মতিচ্ছন্ন হইল নাকি? একি স্বপ্ন? না, যথার্থ বিষয় দেখিতেছি।"

এইরূপ চিন্তা করিয়া বাণেশ্বর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনা-আপনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া উঠিলেন,

"পরমেশ্বর, কেন তুমি সময়ে সময়ে আমার মনোমধ্যে আবার আশার সঞ্চার করিয়া আমার শোকানল পুনরুদ্দীপ্ত করিতেছ। আমার কি পাপের প্রায়শ্চিত্ত এখনও হয় নাই?"

ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিবামাত্রই বাণেশ্বরের পিতার বাক্য তাহার স্মৃতিপথারূঢ় হইল। বাণেশ্বর আবার ভাবিতে লাগিলেন—

"আমার পিতা তো একজন মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি আমার পুত্রবধূর অঙ্গের সমুদয় সুলক্ষণ দেখিয়া বলিয়া গিয়াছেন, ইহার গর্ভে ত্রিভুবনবিজয়ী পুত্র জন্মধারণ করিবে। আমার পিতার কথা কি একেবারেই মিথ্যা হইবে? হয় তো আমার ভুবনেশ্বর জীবিত আছে। হয় তো আমার ন্যায় তাহাকেও কোন লোক নদী হইতে উঠাইয়া থাকিবে। এ অযোধ্যায় তো কেহ বাঙ্গালা অক্ষর লিখিতে পারে না।"

বাণেশ্বর আবার সেই প্রাচীরের লিখিত শ্লোক পাঠ করিতে লাগিলেন। শ্লোকের নীচে বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত যে কথা কয়েকটী ছিল তাহা আবার পড়িতে লাগিলেন। বিশেষ মনোযোগের সহিত হস্তাক্ষর পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। হস্তাক্ষর পরীক্ষা করিয়া মনে মনে আবার ভাবিতে লাগিলেন—

"এ নিশ্চয়ই আমার পুত্রের হস্তাক্ষর। এ প্রদেশে একে তো বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত নাই। যদি দুই এক জন লোক অল্প অল্প বাঙ্গালা শিখিয়াও থাকে, তবে তাহাদের হস্তলিপি এই প্রকার উৎকৃষ্ট হইবে না। এ নিশ্চয়ই ভুবনেশ্বরের হস্তাক্ষর।

"কিন্তু লিখিয়াছে "হাফেজনন্দিনী সীতা" হাফেজনন্দিনী কে? হাফেজ মুসলমানের নাম। তবে কি আমার পুত্রের কোন মুসলমানকন্যার প্রতি আসক্তি হইয়াছিল? এ অতি অসম্ভব কথা। আমার ভুবনেশ্বর ষোড়শ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে সকল শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিল। ধর্ম্মের প্রতি, শাস্ত্রের প্রতি বাঁছার অটল ভক্তি। কোন মুসলমানের কন্যার প্রতি কথনও তাহার আসক্তি হওয়া সম্ভবপর নহে। তবে এ আমার ভুবনেশ্বরের হস্তাক্ষর নহে। পুত্রশোকে দিন দিন আমার এই প্রকার ভ্রম উপস্থিত হইতেছে।"

আবার একটু চিন্তা করিয়াই মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—

"মুসলমান কন্যার প্রতি তাঁহার আসক্তি হওয়া অসম্ভব হইবে কি? তাঁহার এথন পূর্ণ যৌবন কাল। যৌবন কাল বড় ভয়ানক। শাস্ত্র ধর্ম্মজ্ঞান সকলেই এই কালের উন্মাদকারী রিপু সকলের নিকট চির কাল পরাজিত। হয় তো আমার ভুবনেশ্বর এখন জাতি ধর্ম্ম সকলই বিসর্জ্জন করিয়াছে। হা পরমেশ্বর! আমার পুত্রের শেষে এই গতি হইল। ইহা হইতে তাহার মৃত্যুই ভালছিল। একেবারে জাতি ধর্ম্ম বিসর্জ্জন করিয়াছে।"

"হা পরমেশ্বর, ইহা হইতে তাহার মৃত্যুই ভাল ছিল"- এই চিন্তা অন্তরে উদয় হইবামাত্রই বাণেশ্বরের চক্ষু হইতে কয়েক বিন্দু অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। বারম্বার "হা ঈশ্বর," "হা ঈশ্বর" এই শব্দ তাহার মুখ হইতে স্পষ্টাক্ষরে বাহির হইল।

উচ্চৈঃস্বরে তাঁহাকে "হা ঈশ্বর! হা ঈশ্বর!" এই কথা উচ্চারণ করিতে শুনিয়া, গৃহস্থিত সেই রমণীদ্বয় তাহার নিকট আসিলেন। বৃদ্ধারমণী জিজ্ঞাসা করিলেন—"ঠাকুর গোসাঞী কি হইয়াছে?"

বাণেশ্বর মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

বাণেশ্বরের প্রতি বৃদ্ধা রমণীর অত্যন্ত শ্রদ্ধা এবং ভক্তির ভাব পূর্ব্ব হইতেই হইয়াছে। বৃদ্ধা কাতরে বলিতে লাগিলেন, "বাবা ঠাকুর, কি হইয়াছে বলুন। এখন আমি আপনার আপন লোক, আপনার কন্যা। আমাকে পর বলিয়া মনে করেন কেন?"

বাণেশ্বর তখন আনুপূর্ব্বিক সমুদয় আত্ম বিবরণ বৃদ্ধা এবং তাঁহার কন্যার নিকট বলিলেন। প্রাচীরে লিখিত শ্লোক বৃদ্ধাকে দেখাইয়া বলিলেন, "এই হস্তলিপি আমার পুত্রের হস্তাক্ষরের ন্যায় দেখা যায়।"

বৃদ্ধা বলিলেন "তবে নিশ্চয়ই আপনার পুত্র জীবিত আছেন। না হয় আমরা চারি পাঁচ মাস অপেক্ষা করিয়া কাশীতে যাইব। আপনি এখানে পুত্রের অনুসন্ধান করুন। আমরা এখানে আপনার সঙ্গেই থাকিব।"

বাণেশ্বর বলিলেন "এখন আর অনুসন্ধান করিলে কি হইবে? আমার পুত্র বোধ হয় স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছে। "হাফেজনন্দিনী সীতা,— জালালউদ্দীন এবার আর তোমার নিস্তার নাই" এই সকল কথা দ্বারা স্পষ্টই বোধ হয় যে একটা মুসলমান কন্যাকে লইয়া জালালউদ্দীন এবং আমার পুত্রের সঙ্গে বিবাদ হইতেছিল। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে আমার পুত্র সেই হাফেজনন্দিনীর জন্য পাগল হইয়াছিল।"

বৃদ্ধা বলিল, "যদি মুসলমান কন্যার উপরই আপনার পুত্রের আসক্তি হইয়া থাকে, তবে সে জন্য কেন পুত্রকে পরিত্যাগ করিবেন? আহা পুত্রকে কি কেহ পরিত্যাগ করিতে পারে? আমার তিন পুত্র যুদ্ধে মরিয়া গিয়াছে। (ক্রন্দন করিতে করিতে) তাহারা মুসলমান বিবাহ করিয়াও যদি বাঁচিয়া থাকিত, আমি তাহাদিগের সঙ্গে থাকিতাম।"

বৃদ্ধা পরে আবার কন্যাকে দেখাইয়া বলিল, "আমার বাছাকে মুসলমান সিপাহী ধরিয়াছিল। সে নিষ্ঠুর মুসলমান যদি বলপূর্ব্বক আমার কন্যার ধর্ম্মনষ্ট করিত, তথাপি আমি কন্যাকে পরিত্যাগ করিতাম না। আমার কন্যার কি দোষ হইত? ডাকাত ডাকাতী করিলে কে কি করিতে পারে?"

এ সংসারে হৃদয়ের সদ্ভাবই বোধ হয় মানুষকে শুভ বুদ্ধি প্রদান করে। এই অশিক্ষিতা বৃদ্ধাই আজ বাণেশ্বরকে সদুপদেশ প্রদান করিতে সমর্থা হইলেন। বৃদ্ধার কথা শুনিয়া বাণেশ্বর স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। মনোমধ্যে তাঁহার নানা চিন্তা উপস্থিত হইতে লাগিল। কিছুকাল পরে বাণেশ্বর যেন মোহ নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইলেন। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "বৃদ্ধা ঠিক কথাই বলিয়াছে। কেনইবা আমি স্ত্রী কন্যা এবং পুত্রবধূকে আত্মহত্যা করিতে বলিয়া পাঠাইয়াছিলাম? যে বাঁদীকে তাহাদিগের নিকট আত্মহত্যার কথা বলিবার জন্য পাঠাইয়াছিলাম, তাহার সঙ্গে আমার স্ত্রীর সাক্ষাৎ হইয়া থাকিলে তিনি নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করিয়াছেন। তিনি তো স্বামীর আজ্ঞা কখন লঙ্ঘন করিতেন না। কেনইবা পুত্র ও জামাতাকে আমার সঙ্গে একত্রে আত্মহত্যা করিতে বলিলাম। ভুবন আমার তখন ষোড়শ বৎসরের বালক। ভুবনের আর কি তখন আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা ছিল? বাছা পিতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবে না বলিয়াই আত্মহত্যার নিমিত্ত গঙ্গায় ঝাঁপ দিল। সকলই আমারই দোষ। শ্রীনিবাস পণ্ডিতের কথা মিথ্যা নহে। নিজের পাপ না থাকিলে কেহ কষ্ট ভোগ করে না।"

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে, বাণেশ্বর উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, "আমি ঘোর পাপী, ঘোর নারকী, তাই এজীবনে এত কষ্ট পাইতেছি।"

বৃদ্ধা ক্ষত্রিয়রমণী বাণেশ্বরকে সান্ত্বনা করিয়া আবার বলিল, "ঠাকুর গোসাঞী, বাবা ঠাকুর, আজ হইতেই চলুন আমরা তিন জনেই এখানকার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া আপনার পুত্রের অনুসন্ধান করি। আপনি যেরূপ ধার্ম্মিক, পরমেশ্বর আপনার পুত্রকে অবশ্য আপনার ক্রোড়ে আনিয়া দিবেন।"

বাণেশ্বর তখন আবার মনে মনে বলিতে লাগিলেন—

"বৃদ্ধা ভাল কথাই বলিয়াছেন। না হয় আমার পুত্র মুসলমানের কন্যা বিবাহ করিয়াছে। পুত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে আমি কখনও তাহাকে পরিত্যাগ করিব না। সে মুসলমান কন্যাকেই আমি পুত্রবধূ বলিয়া মনে

করিব। সে মুসলমান নন্দিনীকেই আমি কন্যার ন্যায় স্নেহ করিব। আমার সকলই গিয়াছে। আমার আর এখন জাত্ মান কি?”

বৃদ্ধাকে সম্বোধন করিয়া প্রকাশ্যে বলিলেন,—

“মা, তুমি ভাল কথাই বলিয়াছ। প্রাচীরেও লিখিত রহিয়াছে, হাফেজ-নন্দিনী সীতা। সে মুসলমান কন্যা যদি সীতার ন্যায় সচ্চরিত্রা হয়, তবে কেন আমি তাহাকে পুত্রবধূ বলিয়া স্নেহ করিব না? আমার পুত্রের আমি অনুসন্ধান করিব। তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে, তাহার সঙ্গে একত্রে থাকিব। আমার তো আর স্বদেশীয় বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে কখনও সম্মিলন হইবে না।”

এই প্রকার স্থির করিয়া, বাণেশ্বর এই বৃদ্ধা রমণী এবং তাঁহার কন্যাকে লইয়া, এই ভগ্ন গৃহে প্রায় ছয় মাস কাল বাস করিতে লাগিলেন। মৃত সিপাহী বৃদ্ধার কন্যাকে প্রায় পাঁচ ছয় হাজার টাকা দিয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং ইঁহাদের খরচ পত্রের কোন অভাব হইল না। ছয় মাস পর্য্যন্ত বাণেশ্বর ফায়েজাবাদের ঘরে ঘরে এবং প্রত্যেক লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, “হাফেজ নন্দিনী কোথায় থাকেন, বাছা তোমরা কেহ বলিতে পার? ভুবনেশ্বর ভট্টাচার্য্য নামে কোন ব্যক্তি এখানে কখনও ছিল? জালালউদ্দীনকে তোমরা কেহ চেন?”

ফায়েজাবাদের কোন লোক এই সকল প্রশ্নের উত্তরে কিছুই বলিতে পারিত না। জালালউদ্দীন নামে চারি পাঁচ জন লোক ফায়েজাবাদে ছিল। তাহাদের ঠিকানা কোন কোন লোক বলিবামাত্র বাণেশ্বর ক্রমে ক্রমে তিন চারি জন জালালউদ্দীনের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, “বাপু হাফেজ নন্দিনী কে এবং তিনি কোথায় আছেন বলিতে পার?”

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া, জালালউদ্দীন নামক মুসলমানেরা হাসিয়া উঠিত—সকলেই মনে করিত হাফেজনন্দিনী এই এক আশ্চর্য্য নাম।

বস্তুতঃ হাফেজ রহমতখাঁর কন্যার যে কি নাম ছিল, তাহা ফায়েজাবাদে কেহই জানিত না। কোন ইতিহাসেও কখন সে নাম উল্লিখিত হয় নাই। অমরসিংহ ছত্রসিংহের সঙ্গে প্রথম কথা বলিবার সময় হাফেজ রহমতখাঁর কন্যাকে হাফেজনন্দিনী বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন, সেই জন্যই এই উপন্যাসে আমরা তাঁহাকে হাফেজনন্দিনী নাম প্রদান করিয়া পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করিয়াছি। কিন্তু তাঁহার নাম কি

ছিল, তাহা আজ পর্য্যন্ত কেহ জানে না। সম্ভ্রান্ত মুসলমান মহিলাদিগের প্রকৃত নাম সহজে জানিবার সাধ্য নাই।

বাণেশ্বর ছয় মাস অনুসন্ধান করিয়াও পুত্রের ঠিকানা করিতে পারিলেন না। একদিন কেণ্টনমেণ্টের একটা ক্ষত্রিয় সিপাহীর নিকট হাফেজ-নন্দিনীর বিষয় জিজ্ঞাসা করিবামাত্র সে বলিল, "হাফেজনন্দিনী নামে কোন স্ত্রীলোক নাই। কিন্তু হাফেজনন্দিনী এই কথাটা একবার আমি পূর্ব্বেও শুনিয়াছি। ছত্রসিংহ নামে আমাদের রেজিমেণ্টে একজন বৃদ্ধ সিপাহী ছিল। সে আর নেহালসিংহের পুত্র অমরসিংহ, ইহারা দুইজনে ফরেক্কাবাদের নবাবের কন্যাকে হাফেজনন্দিনী বলিত। ফরেক্কা-বাদের নবাবের স্ত্রী ও কন্যাকে ধৃত করিবার সময় তাহারা দুইজনও আমা-দের সঙ্গে ছিল।

বাণেশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন যে সে ছত্রসিংহ কোথায় আছে? সিপাহী বলিল—

"এখন সে কোথায় আছে বলিতে পারি না। গোরক্‌পুরে একদল সিপাহী চলিয়া গিয়াছে। তাহারা বোধ হয় সেই রেজিমেণ্ট ভুক্ত হইয়াছে। তুমি গোরক্‌পুরে তাহাদের অনুসন্ধান কর। কিন্তু আমি নিশ্চয় কিছু বলিতে পারি না।"

বাণেশ্বর ভগ্ন গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, বৃদ্ধা এবং তাঁহার কন্যার নিকট বলিলেন যে বোধ হয় গোরক্‌পুরে চলিয়া গেলে আমার পুত্রের অনুসন্ধান পাইতে পারিব। তোমাদিগকে সঙ্গে করিয়া সেখানে যাইতে সাহস হয় না।

বৃদ্ধা বলিলেন, "বাবাঠাকুর তবে আমাদিগের দুইজনকে আপনি কাশীতে রাখিয়া, একাকী গোরক্‌পুরে চলিয়া যাইবেন। আপনি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আপনার কেহ কোন অনিষ্ট করিবে না। কিন্তু আমার কন্যা যুবতী। তাহাকে সঙ্গে করিয়া সেখানে গেলেও বিপদ ঘটিতে পারে। আর এখানেও বিপদের আশঙ্কা রহিয়াছে।

কিন্তু এ সংসারে মানুষের স্বার্থপরতার ন্যায় আর শত্রু নাই। বাণেশ্বর আপন পুত্রের অন্বেষণে গোরক্‌পুর যাইবার নিমিত্তই ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার আর ইহাদিগকে কাশীতে পৌছাইয়া দেওয়ার ইচ্ছা হইল না। তিনি বৃদ্ধাকে বলিলেন, "এখান হইতে কাশী অনেক দূর নহে। জৌন-

পুরের রাস্তা দিয়া তিন চারি দিনের মধ্যেই তোমরা দুই জন কাশীতে পৌঁছিতে পারিবে। এ রাস্তায় আজ কাল চোর ডাকাতের বড় ভয় নাই। আমি বিলম্ব করিয়া গোরকপুর গেলে হয়ত সে ছত্রসিংহ কোথাও চলিয়া যাইতে পারে। এই অবস্থায় গোরকপুর যাইতে আমার বিলম্ব করা উচিত নহে।”

একাকিনী কন্যাকে সঙ্গে করিয়া কাশীতে যাইতে বৃদ্ধার মনে মনে নানা বিপদাশঙ্কা হইতে লাগিল। কিন্তু কি করিবেন। বাণেশ্বর যখন ইহা-দিগকে কাশীতে পৌঁছাইয়া দিতে অসম্মত হইলেন, তখন একান্ত বাধ্য হইয়া বৃদ্ধা আপন কন্যাসহ কাশীতে চলিলেন। পথে দস্যুরা বৃদ্ধার সঙ্গে যে কিছু টাকা কড়ি ছিল তৎসমুদায় অপহরণ করিল। বৃদ্ধা রিক্ত হস্তে কন্যাকে লইয়া কাশীতে পৌঁছিলেন। এদিকে বাণেশ্বর ফায়েজাবাদ হইতে রওয়ানা হইয়া গোরকপুরে চলিয়া গেলেন। বাণেশ্বর সঙ্গে থাকিলে বৃদ্ধার আর এ দুরবস্থা হইত না।

এ সংসারে মানুষ চিরান্ধ হইয়া বাস করিতেছে। হতভাগ্য বাণেশ্বর যদি কেবল কর্ত্তব্যের অনুরোধে স্বার্থপরতা বিসর্জ্জনপূর্ব্বক বৃদ্ধা রমণীকে পৌঁছাইয়া দিবার নিমিত্ত কাশীতে চলিয়া যাইত, তবে নিশ্চয়ই স্ত্রী পুত্রের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইত। অমরসিংহ কাশীতে পৌঁছিয়াই কাশীর ভিন্ন ভিন্ন স্থান এবং ভিন্ন ভিন্ন সড়কের লোকের নিকট বৃদ্ধ পিতার আকৃতি বর্ণন করিয়া বলিয়া রাখিয়াছে, যে, এইরূপ আকৃতির লোক দেখিতে পাইলে যে আমার নিকট সংবাদ দিবে, আমি তাহাকে ৫০০ টাকা পুরস্কার দিব। তদ্ভিন্ন এখন প্রত্যেক দিন প্রাতঃকালেই অমরসিংহ এবং ছত্রসিংহ কাশীর নানাস্থানে ভ্রমণ করে। তাহারা মনে করে যে হয়ত কোন রাস্তা ঘাটে বাণেশ্বরের সহিত একদিন না একদিন তাহাদের সাক্ষাৎ হইতে পারে। কিন্তু হতভাগ্য বাণেশ্বরের স্ত্রী পুত্রের সাক্ষাৎ লাভ করিবার সুযোগ একেবারে নষ্ট হইল।

পাঠক একবার চিন্তা করিয়া দেখ, এ সংসারে আমরা সকলেই অন্ধ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছি। কোন পথ অবলম্বন করিলে যে আমাদের সুখ শান্তি হইবে, তাহা কিছুই বুঝিতে পারি না। এই জন্য আমরা সর্ব্বদাই পরমেশ্বরের প্রতি দোষারোপ করি। কেন পরমেশ্বর মানুষকে এইরূপ চিরান্ধ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন? তিনি যদি পূর্ণ মঙ্গলময় হইতেন,

পরম দয়াবান হইতেন, তবে কি মানুষকে এই প্রকার চিরান্ধ করিয়া সৃষ্টি করিতেন? এই চিরান্ধতা নিবন্ধন সংসারে মানুষ কেবলই দুঃখ ভোগ করিতেছে। কেন তিনি বাণেশ্বর ভট্টাচার্য্যের দুঃখ নিবারণার্থ স্বয়ং বাণেশ্বরের নিকটে আসিয়া বলিলেন না, যে এই রমণীদ্বয়কে পৌঁছাইয়া দিবার নিমিত্ত কাশীতে চলিয়া যাও, তোমার পুত্র কন্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে?

কিন্তু পাঠক, পরমেশ্বরকে নিষ্ঠুর বলিবার পূর্ব্বে আর একবার চিন্তা কর। কে বাণেশ্বরকে গোরকপুর লইয়া চলিল? কেন বাণেশ্বর আপন স্ত্রী পুত্র দর্শন লাভের এই সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইল? স্বীকার করি পরমেশ্বর আমাদিগকে চিরান্ধ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। আমরা এ সংসারের ঘটনার স্রোতে ভাসিতেছি। কোন পথ অবলম্বন করিলে যে সুখ ও শান্তি হয়, তাহা অবধারণ করিবার সাধ্য আমাদের নাই। কিন্তু সেই অন্ধ ঘটনার স্রোত বাণেশ্বরকে কোন্দিকে লইয়া চলিয়াছিল? এবং কে আসিয়া সে স্রোতের গতি ফিরাইয়া দিল? কে সে গতি অবরোধ করিল?

পাঠক, ঈশ্বরকে নিষ্ঠুর বলিবার পূর্ব্বে একবার বাণেশ্বরের অন্তরের ভাব তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখ। সেই অন্ধ ঘটনার স্রোত ভাসাইতে ভাসাইতে বাণেশ্বরকে কাশীধামে লইয়া চলিয়াছিল। স্বার্থপরতা এবং আত্মসুখচিন্তা আসিয়া সে স্রোতের গতি অবরোধ করিল। বাণেশ্বর আর পরম পবিত্র কাশীধামে যাইতে সমর্থ হইলেন না। স্বার্থপরতার অনুরোধে কর্ত্তব্যের পথ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক তিনি বেরুচ এবং গোরকপুরে চলিলেন।

পরম মঙ্গলময় পরমেশ্বর কাহাকেও চিরান্ধ করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। হৃদয়স্থিত ঘোর স্বার্থপরতাই মানুষকে চিরান্ধ করিয়া রাখিয়াছে। স্বার্থপরতাই মানুষকে বিনাশের দিকে পরিচালন করিতেছে। কর্ত্তব্যজ্ঞানই মানুষের একমাত্র চক্ষু। কর্ত্তব্যজ্ঞান বিবর্জ্জিত হইবামাত্রই মানুষ চিরান্ধ হইয়া পড়ে। কর্ত্তব্যজ্ঞান বিবর্জ্জিত বাণেশ্বর আজ পথভ্রান্ত পথিক।

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়।

অসার সংসার—প্রভুর চরণ সার।

বৃদ্ধ বাণেশ্বর ভট্টাচার্য্য গোরকপুরে আসিয়া পৌছিলেন। কেণ্টনমেণ্টের প্রত্যেক সিপাহীর নিকট ছত্রসিংহ, অমরসিংহ এবং হাফেজনন্দিনী কোথায় আছেন, এই প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। গোরকপুরের রেজিমেণ্টের একজন সিপাহীর সঙ্গেও তাহাদিগের পরিচয় ছিল না। কেহই তাহাদিগের কোন ঠিকানা বলিতে পারিল না।

বাণেশ্বর নিরাশ হইয়া বেরুচে চলিয়া গেলেন। সেখানেও প্রত্যেক সিপাহীর নিকট ছত্রসিংহ, অমরসিংহের এবং হাফেজনন্দিনীর বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু কোন অনুসন্ধান পাইলেন না। বাণেশ্বর অন্যূন দুই বৎসরকাল গোরকপুর এবং বেরুচের নানা স্থান পর্য্যটন করিতে লাগিল। দুই বৎসর পরে কর্ণেল হ্যানে নূতন এক রেজিমেণ্টসহ গোরকপুরে আসিল। সেই নূতন রেজিমেণ্টের সিপাহীদিগের নিকট বাণেশ্বর ছত্রসিংহ ও অমরসিংহের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাদের মধ্যে একজন সিপাহী বলিল, যে, ছত্রসিংহ ও অমরসিংহ বোধ হয় এখন বিদায় লইয়া স্বদেশে গিয়াছে। তাহারা সত্বরই এখানে আসিবে। বাণেশ্বর ইহার কথার উপর নির্ভর করিয়া, গোরকপুরে আর কিছুকাল অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে কর্ণেল হ্যানের আগমনে গোরকপুরে ঘোর অত্যাচারানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। গোরকপুর এবং বেরুচে কেবল হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। কর্ণেল হ্যানের অত্যাচারের বিষয় পূর্ব্ব অধ্যায়েই বিবৃত হইয়াছে। এখানে আর সে সকল কথা পুনর্ব্বার উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। সে অত্যাচারের কথা শ্রবণ করিলে পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হয়। বারম্বার পাঠক ও পাঠিকাদিগের সম্মুখে কর্ণেল হ্যানের পৈশাচিক মূর্ত্তি, কাপ্তেন উইলিয়ামের রাক্ষসাকৃতি উপস্থিত করিলে, নিশ্চয়ই তাঁহাদিগের মন কলুষিত হইবে। কর্ণেল হ্যানের অত্যাচারে পতিপুত্রশোকাতুরা অবগুণ্ঠনবতী গোরকপুর এবং বেরুচের ভদ্র মহিলাগণ পর্য্যন্ত অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। কাহার সাধ্য এ অত্যাচার ভাষা দ্বারা প্রকাশ করিতে পারে?

বৃদ্ধ বাণেশ্বর গোরকপুর এবং বেরুচের রমণীদিগকে ঈদৃশ ভীষণ অত্যাচারে নিপীড়িত হইতে দেখিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—

"এ সংসারে তো কেহই সুখী নহে। সকলেই অত্যাচারানলে দগ্ধ হইতেছে। আমার স্ত্রী কন্যা এবং পুত্রবধূর প্রতি যেরূপ অত্যাচার হইয়াছিল, তদপেক্ষা সহস্র গুণ অধিক অত্যাচার এ প্রদেশের সহস্র সহস্র রমণী সহ্য করিতেছে। তবে আমি কেন আর পুত্র পুত্র বলিয়া শোকানলে আবার জ্বলিয়া মরিতেছি। দূর হউক এ অসার সংসার একমাত্র বিভুর চরণই সার। আজ হইতে আর স্ত্রী পুত্রের চিন্তা কখনও মনে স্থান প্রদান করিব না। যে আশালতা একেবারে ছিন্ন হইয়াছে তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করিবার চেষ্টা কেনইবা করিলাম? যাই হরিদ্বারে। শ্রীনিবাস পণ্ডিত যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন, সেই পথ অবলম্বন করিব। অহর্নিশ ঈশ্বর চিন্তায় দিন যাপন করিব। বৃথা এ সংসার। দূর হউক এ অসার সংসার। একমাত্র বিভুর চরণই সার।"

"দূর হউক এ অসার সংসার একমাত্র বিভুর চরণই সার" মুখে এই ধ্বনি করিতে করিতে, বাণেশ্বর হরিদ্বারে চলিলেন। বাণেশ্বরের এই এক নূতন রোগ হইল। তাঁহার মুখে আর কোন কথাই নাই। বাণেশ্বর আবার ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। "দূর হউক এ অসার সংসার একমাত্র বিভুর চরণই সার" এই গান করিতে করিতে তিনি হরিদ্বারে আসিয়া পৌঁছিলেন।

এই অধ্যায় সমাপ্ত করিবার পূর্ব্বে পাঠক ও পাঠিকাগণের কৌতূহল নিবারণার্থ সেই বৃদ্ধা ক্ষত্রিয় রমণী এবং তাঁহার বিধবা কন্যার কাশীতে যেরূপ দুরবস্থা হইয়াছিল, তাহাই এইস্থানে উল্লেখ করিতেছি।

মৃত সিপাহীর নিকট হইতে বৃদ্ধার কন্যা প্রায় পাঁচ ছয় হাজার টাকার স্বর্ণ মোহর প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই টাকা পাইয়াছিল বলিয়াই ইহারা কাশী ধামে যাইয়া বাস করিতে সাহস করিয়াছিল। নহিলে বোধ হয় ফায়েজাবাদ হইতে ইহারা আবার রোহিলখণ্ডে চলিয়া যাইত। ইহারা ক্ষত্রিয় রমণী। প্রাণান্তেও ইহারা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে না। কাশীতে পৌঁছিয়া নিশ্চয়ই ইহাদিগকে অনাহারে মরিতে হইত। কিন্তু অনাথার নাথ পরমেশ্বর। কত কৌশলে যে তিনি জীবের প্রাণরক্ষা করিতেছেন, তাহা কে বুঝিতে পারে। পথে দস্যুরা ইহাদিগের সঙ্গের সমুদয় স্বর্ণ মোহর এবং জিনিস পত্র অপহরণ করিয়াছিল। কেবল দশ কি বারটী মাত্র স্বর্ণমোহর যুবতীর পরিধেয়

বস্ত্রের অঞ্চলে বান্ধা ছিল, তাহা দস্যুদিগের চক্ষে পড়ে নাই। দস্যুরা কত বার সে অঞ্চল পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিল, কিন্তু সে স্বর্ণমোহর কয়েকটী তাহারা দেখিতে পায় নাই। এই কয়েকটী স্বর্ণমোহরই ইহাদিগের একমাত্র সম্বল রহিল। কাশীতে প্রায় দুই বৎসর কাল অতিকষ্টে তদ্দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। দুই তিন বৎসর পরে একেবারে নিরন্নাবস্থায় কাল যাপন করিতে হইল। এক দিন অনাহারে ইহারা বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের নিকট বসিয়া, রোহিলা ভাষায় লোকের নিকট ভিক্ষা চাহিতেছিল। অমর সিংহ সেই সময় বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে প্রবেশ করিতেছিলেন। ইহাদিগকে রোহিলাদেশীয় ভাষায় কথা বলিতে শুনিয়া, অমর সিংহের ইহাদিগের সহিত আলাপ করিবার ইচ্ছা হইল। তিনি ইহাদিগকে কয়েকটী পয়সা দিলেন এবং ইহাদিগের বর্ত্তমান দুরবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বৃদ্ধা অমর সিংহের নিকট সমুদয় আত্ম বিবরণ বিবৃত করিতে লাগিলেন। তাঁহার আত্ম বিবরণ বলিবার সময় তিনি বাণেশ্বরের সমুদয় কথাও বলিলেন। বাণেশ্বর ফায়েজাবাদের ভগ্ন গৃহের প্রাচীরে লিখিত বাঙ্গালা অক্ষর যে আপন পুত্রের হস্তলিপি বলিয়া অবধারণ করিয়া ছিলেন, তৎসমুদয়ই একে একে বিবৃত করিলেন।

বৃদ্ধার সমুদয় কথা শ্রবণে অমর সিংহের হৃদয় হর্ষ বিষাদ এবং আশ্চর্য্যে উদ্বেলিত হইতে লাগিল। বৃদ্ধা যে স্থানে বসিয়া তাঁহার সঙ্গে কথা বলিতে ছিলেন সেই স্থান হইতে ধীরে ধীরে দুই চারি পদ অগ্রসর হইলেন। মহাদেবের মন্দিরদ্বারে আসিয়াই ভূমিতলে পড়িয়া প্রণাম করিলেন, এবং বারম্বার বলিতে লাগিলেন, "ভগবান্ ভূতভাবন কৈলাসপতি, তোমার মহিমা কে বুঝিতে পারে? ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু, প্রভু তোমার অসাধ্য কিছুই নহে।"

মন্দির দ্বারে প্রণাম করিয়া, আবার সেই বৃদ্ধার নিকট আসিলেন। বৃদ্ধা এবং তাহার কন্যাকে বলিলেন—"মা, তোমরা আমার সঙ্গে চল। অনাথা দরিদ্রদিগকে মহারাণী গোলাপ কুমারী আপন গৃহে আশ্রয় প্রদান করিতেছেন। তোমাদের সকল কষ্ট দূর হইয়াছে। আমি জননীর ন্যায় তোমাদিগকে পরিচর্য্যা করিব। যে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তোমাদিগের সঙ্গী ছিলেন, তিনি আমার পিতা, প্রাচীরে আমার হস্তাক্ষর দেখিয়াই আমার অন্বেষণে গোরকপুর চলিয়া গিয়াছেন। আমি তোমাদিগকে গৃহে রাখিয়া এখন গোরকপুর যাত্রা করিব।"

বৃদ্ধা ক্ষত্রিয় রমণী অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলেন। অমর সিংহের কথা শ্রবণ করিয়া এবং তাঁহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া, তিনি মনে করিলেন, যে ইনি নিশ্চয়ই এক জন সাধু পুরুষ হইবেন। কিন্তু বৃদ্ধার মনে হইতে লাগিল যে অমর সিংহ হয়ত মুসলমান কন্যাকে বিবাহ করিয়া জাতিভ্রষ্ট হইয়াছেন। এই চিন্তা বৃদ্ধার মনে উদয় হইবামাত্র তিনি একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। অমর সিংহ বলিলেন "আপনাদের কোন ভয় নাই, আমার সঙ্গে চলুন। মহারাণী গোলাপ কুমারী আপনাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিবেন।"

বৃদ্ধা বলিলেন, "গোলাপ কুমারী কি আপনার সেই হাফেজনন্দিনী?"

অমর সিংহ তখন বৃদ্ধার মনের ভাব বুঝিয়া বলিতে লাগিলেন,—"মা আমার পিতার মনে অনর্থক সন্দেহ হইয়াছে। আমি কোন মুসলমান কন্যাকে বিবাহ করি নাই। হাফেজনন্দিনী আপনাদের ফরক্কাবাদের নবাবের কন্যা। রোহিলা যুদ্ধাবসানে তাঁহাকে এবং তাঁহার জননীকে ধৃত করিয়া আনিবার নিমিত্ত অন্যান্য সৈন্য সহ আমিও প্রেরিত হইয়াছিলাম। নবাবের আক্রমণ হইতে ফরক্কাবাদের নবাব পত্নী এবং নবাব কন্যাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আমি চেষ্টা করিয়াছিলাম। হাফেজনন্দিনীকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা কখনও আমার মনে উদয় হয় নাই।"

অমর সিংহ ক্রমে বৃদ্ধা এবং তাহার কন্যার নিকট হাফেজনন্দিনীর সমুদয় বিবরণ বিবৃত করিলেন। বৃদ্ধা তখন অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া অমর সিংহের সঙ্গে রাণী গোলাপ কুমারীর গৃহে চলিলেন। অনাথাদিগের আশ্রয় দায়িণী মহারাণী গোলাপ কুমারী ইহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিলেন।

বৃদ্ধার নিকটে অমরসিংহ আপন পিতার বিষয় যাহা যাহা শুনিয়াছিলেন, তৎসমুদয় আপন জননী ভগ্নী, স্ত্রী, চাঁদকুমারী এবং রাণী গোলাপ কুমারীর নিকট বলিলেন। অমরসিংহের জননী এখন সর্ব্বদাই অমর সিংহের সন্তান দুইটীকে আপনার নিকটে রাখেন। তিনি পুত্রের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন, আমার শ্বশুর দেবতা ছিলেন। তাঁহার কোন কথাই নিষ্ফল হইবে না। পৌত্রের মুখ চুম্বন করিয়া আবার বলিলেন আমার পৌত্র নিশ্চয়ই বিশ্ববিজয়ী হইবে। প্রায় চারি বৎসর হইল, অমর-সিংহ কাশীতে আসিয়াছেন। তাঁহার একটী কন্যা এবং একটী পুত্র জন্মিয়াছে। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণী এবং অমর সিংহের ভগ্নী সর্ব্বদাই ইহাদিগকে ক্রোড়ে ক্রোড়ে রাখেন, মুহূর্ত্তের নিমিত্ত ইহাদিগকে সঙ্গ ছাড়া করেন না।

অমর সিংহ ছত্রসিংহ এবং চাঁদকুমারীর পুত্র মহাবীর সিংহ তিন জন তৎক্ষণাৎ বাণেশ্বরের অন্বেষণে গোরকপুর যাত্রা করিলেন। সেখানে পৌছিয়া ক্রমে গোরকপুর এবং বেরুচের স্থানে স্থানে বাণেশ্বরকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোথাও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল না। গোরকপুর এবং বেরুচে কর্ণেল হ্যানের অত্যাচার দর্শনে ইহাদিগের তিন জনের শোণিত উষ্ণ হইয়া উঠিল। ইহারা তিন জন সর্ব্বদাই বলিতে লাগিলেন, "মানুষের উপর কি মানুষ এত অত্যাচার করিতে পারে?"

ইহারা প্রায় এক মাস কাল বাণেশ্বরের অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারিলেন না। বাণেশ্বর ইহাঁদিগের পৌছিবার পূর্ব্বেই হরিদ্বারে চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু গোরকপুর এবং বেরুচের লোকের দুরবস্থা দেখিয়া ইহাদিগের কোপানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ইহারা তখন বাণেশ্বরের অনুসন্ধান পরিত্যাগ পূর্ব্বক গোরকপুর এবং বেরুচের অত্যাচারে নিপীড়িতদিগের সাহায্যার্থ ইংরাজ সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই মহাবীরের সাংগ্রামিক জীবনের প্রারম্ভ।

অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায়।

পিতা ও মাতামহের তর্পণ।

গোরকপুর এবং বেরুচের অত্যাচারের বিষয় পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়েই উল্লিখিত হইয়াছে। ১৭৭৮ সনে এ অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছে। এখন ১৭৮০ সাল আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্তও এ অত্যাচারানল নির্ব্বাপিত হয় নাই। এখন পর্য্যন্তও বেরুচ এবং গোরকপুরের স্ত্রী পুরুষগণ অস্ত্র পরিত্যাগ করেন নাই। অমরসিংহ, ছত্রসিংহ এবং মহাবীরসিংহ এই অত্যাচার নিপীড়িত নর নারীদিগের সঙ্গে একত্র হইয়া ইংরাজ সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। কর্ণেল হ্যানের প্রার্থনানুসারে লক্ষ্ণৌ হইতে রেজিমেণ্টের পর রেজিমেণ্ট আসিতে লাগিল। তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল।

মহাবীর নিয়মিত রূপে কখন অস্ত্র শিক্ষা করেন নাই। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! রণকৌশলে তাঁহার পারদর্শিতা দেখিয়া ছত্রসিংহ এবং অমর

সিংহ একেবারে চমৎকৃত হইলেন। এ বীর যুবক বোধ হয় অর্জ্জুননন্দন অভিমন্যুর ন্যায় জননীগর্ভে অবস্থান কালেই অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন। দিন দিন মহাবীর শত শত ইংরাজ সৈন্যের প্রাণসংহার করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে গোরকপুর এবং বেরুচের লোকেরা কর্ণেল হ্যানের সৈন্যগণের আক্রমণ হইতে কেবল আত্মরক্ষার্থই যুদ্ধ করিতে ছিলেন। ইংরাজ সৈন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত না হইলে তাঁহারা আপনা হইতে কখনও ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিতেন না। কিন্তু এখন ইংরাজ সৈন্যই আত্মরক্ষার পথ অবলম্বন করিলেন। মহাবীর এবং অমরসিংহ কর্ণেল হ্যানের শিরচ্ছেদনে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন।

প্রাণের ভয়ে কর্ণেল হ্যানে আবার নূতন রেজিমেণ্টের নিমিত্ত লক্ষ্ণৌ দরবারে পত্র লিখিলেন। কিন্তু এখন নবাব আসফউদ্দৌলাও গোরকপুর এবং বেরুচের প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারিলেন। আপন প্রজাদিগের দুঃখের কথা শুনিয়া তাঁহার হৃদয়ও অত্যন্ত বিচলিত হইল। তিনি কর্ণেল হ্যানের প্রার্থনানুসারে আর নূতন সৈন্য প্রেরণের আদেশ করিলেন না। নিস্তেজ, কিন্তু সহৃদয় আসফউদ্দৌলা এ পর্য্যন্ত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের একটী কার্য্যেরও প্রতিবাদ করেন নাই। কিন্তু পুরাতন ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগের দুর্ব্যবহারে মৃত দেহেও ক্রোধের সঞ্চার হয়। তিনি কর্ণেল হ্যানের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া, গবর্ণর জেনারেল হেষ্টিংস সাহেবের নিকট কর্ণেল হ্যানের সমুদয় কুকার্য্য বিবৃত করিয়া পত্র লিখিলেন, "আপনি সত্বর কর্ণেল হ্যানেকে আমার রাজ্য হইতে চলিয়া যাইতে লিখিবেন। কর্ণেল হ্যানেকে আমি আমার সরকারের কোনকার্য্যে বাহাল রাখিতে ইচ্ছা করি না।"

নির্ব্বোধ নিস্তেজ আসফউদ্দৌলা বুঝিল না যে কর্ণেল হ্যানে হেষ্টিংসের প্রিয় বন্ধু ইলাইজা ইম্পির আত্মীয় লোক। সমুদয় অযোধ্যা সে ছারখার করিলেও হেষ্টিংস তাহাকে বরখাস্ত করিবেন না। আসফউদ্দৌলার পত্রের প্রত্যুত্তরে হেষ্টিংস কোপাবিষ্ট হইয়া লিখিলেন, "আমি কি নিজে ইচ্ছা করিয়া হ্যানেকে তোমার রাজ্যে প্রেরণ করিয়াছি? তুমি ইংরাজ কর্ম্মচারী চাহিয়াছিলে, তাহাতেই একজন উপযুক্ত লোককে প্রেরণ করিয়াছি।"

গবর্ণর জেনারেল হেষ্টিংসের এই পত্র পাইয়া নবাব আসফউদ্দৌলা ভয়ে নির্ব্বাক রহিলেন। এদিকে আবার নূতন সৈন্যের প্রার্থনা করিয়া লক্ষ্ণৌর

তৎকালের প্রধান অমাত্য হায়দরবেগ খাঁর নিকট পত্র লিখিলেন, "আমার ন্যায় উপযুক্ত কলেক্টর * তোমরা কখন পাইবে না। এখন আমার সাহায্যার্থ সৈন্য না পাঠাইলে গোরকপুর এবং বেরুচ সুশাসিত হইবে না।

নিস্তেজ হায়দরবেগ খাঁও এবার একটু সাহস প্রকাশ করিলেন। হ্যানের সাহায্যার্থ আর সৈন্য প্রেরণ করিলেন না। সুতরাং কর্ণেল হ্যানের এখন আর আত্মরক্ষা ভিন্ন অত্যাচার করিবার বড় সুযোগ রহিল না। বিশেষতঃ আর অত্যাচার করিবার প্রয়োজনও নাই। বেরুচ এবং গোরকপুর প্রায় জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। নয় লক্ষ টাকা এই দুই জেলার বার্ষিক রাজস্ব ছিল। কর্ণেল হ্যানে বিগত দুই বৎসর নবাবের প্রাপ্য নয় লক্ষ টাকা আদায় করিয়া তদ্দ্বারা যুদ্ধের ব্যয় বহন করিয়াছেন; এবং নিজে সমুদয় খরচ বাদে ত্রিশ লক্ষ টাকা সঞ্চয় করিয়া, কলিকাতা প্রেরণ করিয়াছেন। দুই বৎসরের মধ্যে কর্ণেল হ্যানে ত্রিশ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিল! এদিকে বঙ্গদেশের রঙ্গপুরের কলেক্টর গুড্ল্যাড সাহেবের সহচর দেবীসিংহ সদৃশ কর্ণেল হ্যানের আসিষ্টাণ্ট আবুতালিবও অনেক অর্থ সঞ্চয় করিলেন।

বেরুচ এবং গোরকপুরের অত্যাচারানল এইরূপে কথঞ্চিত নির্ব্বাপিত হইলে পর, অমর সিংহ ছত্রসিংহকে এবং মহাবীরকে কাশীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বলিলেন। তিনি একাকী পিতার অন্বেষণে অযোধ্যার স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। কিন্তু মহাবীর তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি বিশেষ গম্ভীর ভাবে বলিলেন—

"আমি পিতা এবং মাতামহের তর্পণ না করিয়া এ স্থান পরিত্যাগ করিব না।"

অমরসিংহ এবং ছত্রসিংহ মহাবীরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মহাবীরের কথার অর্থ তাঁহারা কিছুই বুঝিতে সমর্থ হইলেন না।

অমরসিংহ বলিলেন, "এখানে কি তর্পণ করিবে? পিতা এবং মাতামহের পিণ্ড প্রদান করিতে হইলে কাশীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পরে গয়ায় চলিয়া যাইও।"

---

* কর্ণেল হ্যানের আসিষ্টাণ্ট আবুতালিবের ইতিহাসে এই পত্রের উল্লেখ হইয়াছে। আবুতালিব ভিন্ন কোন ইংরাজ ইতিহাসলেখকও কর্ণেল হ্যানেকে সমর্থন করিতে সাহস করেন নাই। চাকুরীর প্রত্যাশায় আবুতালিবই এই প্রকার ইতিহাস লিখিয়াছেন। ভারতবর্ষে কেবল আবুতালিবের ন্যায় লোকই জন্মগ্রহণ করেন।

মহাবীর বলিলেন—

"সে গয়া যাইয়া কলা এবং আতপ চাউলের পিণ্ড তোমার বাপের স্বর্গার্থে তোমার বুড় মাকে দিতে বলিবে। আমার পিতা আমার মাতামহের শুদ্ধ কেবল চাউল কলার পিণ্ডে স্বর্গলাভ হইবে না।"

অমর সিংহ। (হাসিতে হাসিতে) তবে তুমি কিরূপে পিণ্ড প্রদান করিতে চাও। তুমি একটা নূতন শাস্ত্র বাহির করিবে নাকি?

মহাবীর। আমি কি প্রকার পিণ্ড প্রদান করিতে চাহি, শুনিবে? পিতৃঋণ পরিশোধ করা পুত্রের কর্ত্তব্য। আর পিতৃ পিতামহ পূর্ব্বপুরুষদিগের ভ্রম সংশোধন করাও পুত্রের কর্ত্তব্য। আমার পিতা ৺রণবীর সিংহ পলাশির যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া এই ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রভুত্বের বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন। আমার মাতামহ ৺নেহালসিংহ বক্সারের যুদ্ধে আপন প্রাণ দিয়া কোম্পানীর রাজত্ব সংস্থাপন করিয়াছেন। এই বেরুচ এবং গোরকপুরে যত অত্যাচার হইতেছে তাহার মূল কারণ কে? আমার পিতা এবং মাতামহই ইহার মূল কারণ। তাঁহাদের এ ভুল সংশোধন না করিলে, কেবল চাউল কলার পিণ্ডে তাঁহাদের স্বর্গলাভ হইবে না। তোমার পিতা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লোক, গুরু পুরোহিতের ব্যবসা করিতেন। দুই চারি জন লোককে চাউল কলা ঠকাইয়াছেন। এখন দুই সের আতপ চাউল আর দশটা কলা দ্বারা পিণ্ড প্রদান করিলে তাঁহার স্বর্গলাভ হইতে পারে। কিন্তু আমার পিতা এবং মাতামহের স্বর্গলাভ কেবল চাউল কলার পিণ্ডে হইবে না।

অমর সিংহ এবং ছত্রসিংহ এই তেজস্বী যুবকের কথা শুনিয়া একেবারে অবাক হইয়া পড়িলেন। কিছুকাল পরে অমর সিংহ বলিলেন—

"তোমার এসকল ঠাট্টা তামাসার কথা এখন ছাড়িয়া দাও। প্রায় ছয় মাস কাল আমরা কাশী হইতে চলিয়া আসিয়াছি। দিদি চাঁদকুমারী তোমার নিমিত্ত বড় উৎকণ্ঠিত হইবেন। তুমি এখন কাশীতে চলিয়া যাও।"

মহাবীর অত্যন্ত কোপাবিষ্ট হইয়া বলিলেন, "মামা, তুমি আমার কথা ঠাট্টা তামাসা বলিয়া মনে করিতেছ নাকি? পুত্র হইয়া যে আপন পিতা পিতামহের ঋণ পরিশোধের চেষ্টা না করে, পিতা পিতামহের ভ্রম সংশোধনার্থ প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত না হয়, সে তাহার পিতার পুত্র নহে। সে জারজ সন্তান।"

অমরসিংহ মহাবীরের কথা শুনিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "বীরত্বই মানুষের মধ্যে একমাত্র দেবত্ব।" কিন্তু প্রকাশ্যে বলিলেন "তবে তুমি এখন কি করিতে চাহ?"

মহাবীর। আর কি করিব? কর্ণেল হ্যানের শিরচ্ছেদন পূর্ব্বক গোরকপুর এবং বেরুচ হইতে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর সমুদয় লোক বহিষ্কৃত করিয়া দিব।

অমর সিংহ। বাছা, সে বড় দুঃসাধ্য ব্যাপার।

মহাবীর। তোমার ন্যায় টোলে পড়া বামনের নিকট সকলই দুঃসাধ্য। কিন্তু নিশ্চয়ই জানিবে রণবীর সিংহের পুত্র এবং নেহাল সিংহের দৌহিত্রের নিকট কিছুই দুঃসাধ্য নহে।

মহাবীরের কথা শুনিয়া বৃদ্ধ ছত্রসিংহেরও সাংগ্রামিক স্পৃহা উত্তেজিত হইয়া উঠিল। অমর সিংহ টোলের ছাত্র হইলেও এই কয়েক বৎসরের সাংগ্রামিক শিক্ষা তাঁহাকে বিলক্ষণ তেজস্বী করিয়া তুলিয়াছে। ইহারা কর্ণেল হ্যানেকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার নিমিত্ত বেরুচ এবং গোরকপুরের সমুদয় লোক সংগ্রহ করিল। কর্ণেল হ্যানের সৈন্যগণের সঙ্গে অন্যূন তিন বার যুদ্ধ হইল, তিন বারেই ইংরাজ সৈন্যদিগকে পরাজিত হইয়া রণক্ষেত্র হইতে শৃগালের ন্যায় পলায়ন করিতে হইল।

ইহার পর আর কর্ণেল হ্যানের লোকেরা গোরকপুর এবং বেরুচের অধিবাসীদিগের উপর অত্যাচার করিতে সাহস করিল না। এ দিকে গোরকপুর এবং বেরুচে ঘোর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন কাহারও আর যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা হইল না। তখন মহাবীর গোরকপুরের কয়েক জন লোক সঙ্গে করিয়া কাশীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অমর সিংহ ছত্রসিংহকে সঙ্গে করিয়া স্বীয় পিতার অনুসন্ধানার্থ অযোধ্যার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

ঊনত্রিংশত্তম অধ্যায়।

শ্রীনিবাস পণ্ডিত।

শ্রীনিবাস পণ্ডিতের সঙ্গে,পাঠকগণের পুস্তকের প্রথম অধ্যায়েই সাক্ষাৎ হইয়াছে। শ্রীনিবাস পূর্ব্বে বৃক্ষতলে যোগাসনে বসিয়া অহর্নিশ ধ্যান করিতেন। কিন্তু এখন আর তিনি অহর্নিশ নয়ন মুদ্রিত করিয়া বসিয়া থাকেন না। নিশাবসানের দুই ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত এবং সূর্য্যাস্তের পর দুই তিন ঘণ্টা বসিয়া কেবল ধ্যান করেন এবং সমস্ত দিবস নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন। হরিদ্বারে তাঁহার এখন অনেক শিষ্য সেবক জুটিয়াছে। কখনও শিষ্যদিগকে নানা শাস্ত্রে উপদেশ প্রদান করেন; কখনও কোন গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কৃষক ও কৃষকরমণীদিগের সঙ্গে আলাপ করেন; কখনও কৃষক বালক বালিকাদিগকে লইয়া আমোদ প্রমোদ করেন। কৃষক এবং কৃষক রমণীগণ সকলেই তাঁহাকে বাবা বলিয়া সম্বোধন করে। শ্রীনিবাস পণ্ডিত এখন হরিদ্বারবাসী সকলেরই পিতা হইয়া পড়িয়াছেন।

পূর্ব্বে প্রায়ই তিনি বৃক্ষতলে শয়ন, এবং অনশনে দিন যাপন করিতেন। কিন্তু হরিদ্বারের কৃষকগণ কয়েক বৎসর হইল তাঁহার নিমিত্ত এক খানি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছে। পণ্ডিত শ্রীনিবাস এখন কুটীরে বাস করেন এবং আহারাদি সম্বন্ধে কখনও নিয়ম লঙ্ঘন করেন না।—

বাণেশ্বর ভট্টাচার্য্য হরিদ্বারে পৌঁছিয়া, শ্রীনিবাস পণ্ডিতকে কুটীরে বাস করিতে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, যে, পণ্ডিত মহাশয় কি আবার অত্যন্ত সংসারাসক্ত হইয়া পড়িয়াছেন? বাণেশ্বরের মুখে এখনও সেই ধ্বনিই রহিয়াছে, "অসার সংসার প্রভুর চরণ সার।"

বাণেশ্বর "অসার সংসার, প্রভুর চরণ সার" এই কথা বলিতে বলিতে, যখন শ্রীনিবাস পণ্ডিতের কুটীরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিলেন, তখন একটী অশিক্ষিত কৃষক কয়েকটী ফল শ্রীনিবাস পণ্ডিতকে প্রদান করিবার নিমিত্ত ফল কয়েকটী হাতে করিয়া কুটীর দ্বারে দাঁড়াইয়াছিল। সে একেবারে কুটীরের দরজা বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। পণ্ডিত মহাশয় শিষ্যগণকে

উপদেশ প্রদানে যে যে কথা বলিতেছিলেন তাহাই শুনিতেছে। কিন্তু তাহার এক কথাও সে বুঝিতে পারে না।

এই কৃষকের পশ্চাৎ হইতে যাই বাণেশ্বর বলিয়াছে, "অসার সংসার প্রভুর চরণ সার," কৃষক বাণেশ্বরের দিকে ফিরিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল "সার হবে সংসার, এ পাগল্‌মী ছাড়।"

শ্রীনিবাস পণ্ডিত কুটীরের দ্বারের নিকট ইহাদের চীৎকারের শব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিয়া দেখেন যে বাণেশ্বর আসিয়াছেন। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে বাণেশ্বর শ্রীনিবাস পণ্ডিতের নিকট হইতে বিদায় লইয়া রোহিলখণ্ডে গিয়াছিলেন। বাণেশ্বরকে দেখিবামাত্রই শ্রীনিবাস গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার হস্ত ধরিয়া বসাইলেন। শ্রীনিবাস কেবল ভদ্রোচিত ব্যবহার প্রদর্শনার্থ বাণেশ্বরের হাত ধরিয়া বসাইয়াছিলেন তাহা নহে। তিনি হৃদয়াবেগ দ্বারা পরিচালিত হইয়াই এইরূপ করিয়াছিলেন। বাণেশ্বরের প্রতি তাঁহার বিশেষ ভালবাসা ছিল।

বাণেশ্বরের সঙ্গে শ্রীনিবাস কথা বলিতে আরম্ভ করিলে পর শিষ্যগণ নিজ নিজ কার্য্যে চলিয়া গেল।

শ্রীনিবাস জিজ্ঞাসা করিলেন, "এবার কোন কোন প্রদেশ ভ্রমণ করিলে?"

বাণেশ্বর বলিলেন "রোহিলখণ্ড এবং অযোধ্যা।"

শ্রীনিবাস দেখিলেন যে, বাণেশ্বর পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু ভাল হইয়াছেন। তাঁহার শারীরিক অবস্থাও পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল দেখাইতেছে। "পৃথিবী লোক শূন্য হউক," এই কামনা বাণেশ্বরের মন হইতে দূর হইয়াছে কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে, শ্রীনিবাস আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "রোহিলখণ্ডে কি দেখিলে?"

বাণেশ্বর। "ঠাকুর রোহিলখণ্ডের কথা আর কি বলিব। যুদ্ধের পর রোহিলা রমণীদিগকে ইংরাজ এবং নবাব সৈন্যগণ যেরূপ কষ্ট দিয়াছে, তাহা দেখিলে পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হয়। হা পরমেশ্বর! আর যেন পৃথিবীতে কেহ যুদ্ধ করে না। রমণীগণের এত কষ্ট! ইহারা অবলা, কাহারও কোন অনিষ্ট করে না। ইহাদিগের উপর এই অত্যাচার!"

শ্রীনিবাস আশ্চর্য্য হইয়া বাণেশ্বরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বাণেশ্বরের পূর্ব্বের ক্ষিপ্তাবস্থা একেবারে দূর হইয়াছে দেখিয়া, তিনি মনে

মনে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তাঁহাকে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "রোহিলা যুদ্ধে আর কি দেখিলে? এ তো যুদ্ধের পরের কথা বলিলে।"

বাণেশ্বর। ঠাকুর যুদ্ধের কথা তোমাকে আর কি বলিব। রোহিলা-দিগের সরদার হাফেজ রহমত খাঁর আশী বৎসরের ন্যূন বয়ঃক্রম ছিল না। কিন্তু এই বৃদ্ধ সরদার নিঃশঙ্ক হৃদয়ে এমন বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তাহা মনে হইলে, আমারও যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা হয়। তাঁহার তৎকালের অবস্থা স্মরণ হইলে আমি পুত্রশোক, কন্যার শোক সকলই বিস্মৃত হইয়া পড়ি।

বাণেশ্বর এই কথা বলিবামাত্র শ্রীনিবাসের দুই চক্ষু হইতে অশ্রু বিসর্জ্জিত হইতে লাগিল। তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন—"বৃথা জীবন যাপন করিলাম। আমার এখনও আশী বৎসর বয়স হয় নাই। আমার বয়ঃক্রম ষাট্ বৎসরের অধিক হইবে না। কিন্তু জীবনটাকে একেবারে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিয়াছি।"

এইরূপ চিন্তা করিবার পর শ্রীনিবাস পুনর্ব্বার বাণেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"রোহিলা যুদ্ধের পর এ পাঁচ বৎসর কোথায় ছিলে?"

বাণেশ্বর তখন সমুদয় ভ্রমণ বৃত্তান্ত শ্রীনিবাসের নিকট বলিলেন এবং অবশেষে পুত্রের সাক্ষাৎলাভ আশাতে বঞ্চিত হইয়া, শুদ্ধ কেবল ঈশ্বরের ধ্যানে জীবন যাপন করিবেন বলিয়া যে মনে মনে স্থির করিয়াছেন, তাহাও শ্রীনিবাসের নিকট প্রকাশ করিলেন।

শ্রীনিবাস ইহার সমুদয় কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—"এখনও তুমি প্রকৃত পথ অবলম্বন করিতে পার নাই। আমার বোধ হয় সেই নিরাশ্রয়া বৃদ্ধা রোহিলা রমণীকে সঙ্গে করিয়া যখন তাঁহার কন্যার অনুসন্ধান করিতেছিলে, তখনই একবার কর্ত্তব্যের পথে উঠিয়াছিলে। সেই কর্ত্তব্যের পথই তোমাকে হয়ত পুত্র এবং কলত্রসহ সম্মিলনের পথে পরিচালন করিত। কিন্তু রমণীদ্বয়কে একাকিনী কাশীতে প্রেরণ করিয়া নিশ্চয়ই কর্ত্তব্যের পথ পরিত্যাগ করিয়াছ।"

বাণেশ্বর বলিলেন, "আর স্ত্রী পুত্রের চিন্তা মনে স্থান দিব না। আমি আপনার সঙ্গে এই হরিদ্বারে বসিয়া, অহর্নিশ কেবল ঈশ্বর চিন্তায় জীবন যাপন করিব বলিয়াই আসিয়াছি। কিন্তু আপনার মধ্যে এখন বিলক্ষণ পরিবর্ত্তন দেখিতেছি। আপনি পূর্ব্বে বৃক্ষতলে শয়ন করিতেন। এখন কুটীরে বাস করেন। পূর্ব্বে কোন লোকের সঙ্গে বড় কথাবার্ত্তা বলিতেন

না। এখন শত শত লোক আপনার নিকট যাতায়াত করিতেছে ইহার অর্থ আমি কিছুই বুঝিতে পারি না।”

বাণেশ্বরের কথার প্রত্যুত্তরে শ্রীনিবাস বলিতে লাগিলেন, “তোমার কোন্ অবস্থাই আমার অবিদিত নাই। বঙ্গদেশের দুরাত্মা নবাবপুত্র মীরণ তোমার স্ত্রী, কন্যা এবং পুত্র-বধূকে হরণ করিলে পর তোমার যে যে দুরবস্থা হইয়াছে তাহা সকলই আমি তোমার মুখে শুনিয়াছি। কিন্তু আমি কে, এবং কি প্রকারে আমার এরূপ অবস্থা হইয়াছে, তাহা তুমি কিছুই জান না। তুমি কখনও আমার সে সকল কথা শুনিতে ইচ্ছা প্রকাশ কর নাই। তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে, আমি সমুদয়ই তোমার নিকট বলিতাম। কিন্তু “জগৎ লোক শূন্য হউক” এই চিন্তা পূর্ব্বে তোমার হৃদয় মন অধিকার করিয়াছিল। অন্য কোন কথা তোমার চিত্তাকর্ষণ করিত না। অন্য কোন কথা তোমার শ্রবণ করিতেও ইচ্ছা হইত না। সুতরাং আমি আমার অবস্থা তোমার নিকট কখন বলিবারও সুযোগ পাই নাই। কিন্তু বক্‌সারের যুদ্ধের সময় যখন তোমার সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন তোমার দুঃখের কথা শুনিয়া আমার মন অত্যন্ত বিগলিত হইল। তোমার দুরবস্থার কথা আমাকে প্রথম মোহ নিদ্রা হইতে জাগ্রত করিল। তখন আমার নিজের কুকার্য্যের প্রতি দৃষ্টি পড়িল। তখন বুঝিতে পারিলাম যে কর্ত্তব্য লঙ্ঘনই কেবল মানুষকে বিনাশের দিকে পরিচালন করে। তোমাকে আমি সেই সময় হইতেই বড় উপকারী বন্ধু বলিয়া মনে করি। কারণ তোমার দুরবস্থার ইতিহাস আমার মোহ নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া দিয়াছে। তুমি আমার এক প্রকার গুরু।”

বাণেশ্বর। আমার দুরবস্থার ইতিহাস কিরূপে আপনার মোহ নিদ্রা ভঙ্গ করিল ?

শ্রীনিবাস। “আমার কথা ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক শ্রবণ কর। ক্রমে সকল কথাই আজ তোমার নিকট বলিব।

“আমাকে লোকে পণ্ডিত বলিয়া জানে ; কিন্তু আমি পণ্ডিত নহি। তবে ক্রমাবচ্ছিন্ন বিপদরাশি আমাকে পণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে। যৌবন কাল পর্য্যন্ত আমি কখনও শাস্ত্রাধ্যয়ন করি নাই। যৌবনাবসানে কাশীতে অবস্থান কালে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করি। কাশীতেই প্রথম লোকে আমাকে পণ্ডিত বলিয়া অভিহিত করে। কিন্তু শাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারা আমার

কিঞ্চিন্মাত্রও লাভ হইল না। যদি সত্য সত্যই আমি পণ্ডিত হইয়া থাকি, তবে বিপদরাশি এবং আত্ম-চিন্তাই আমাকে পণ্ডিত করিয়াছে। আমার সমুদয় পূর্ব্ব বিবরণ তোমার নিকট বলিতেছি।

"রাজপুতানার উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্তস্থিত প্রদেশই আমার জন্মভূমি। আমার পূর্ব্বপুরুষগণও মহারাজ মানসিংহের ন্যায় দিল্লীর বাদসাহের অধীনে সৈন্যাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত ছিলেন। পিতৃ বিয়োগের পর পিতার ক্ষুদ্র রাজ্যের আমি একমাত্র অধিকারী হইলাম। আমার পিতা প্রজাদিগকে অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতেন। আমার পিতার প্রতি প্রজাগণেরও বিশেষ ভক্তি ছিল বলিয়াই আমার সিংহাসনারোহণের পর আমার প্রতি তাহারা যার পর নাই শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রকাশ করিতে লাগিল। আমার সহধর্ম্মিণীর নাম লক্ষ্মীবাই ছিল। তিনি সত্য সত্যই লক্ষ্মীস্বরূপা ছিলেন। তিনিও প্রজাদিগকে আপন গর্ভজাত সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিতেন। প্রজাগণও তাঁহাকে আপন গর্ভধারিণী বলিয়া মনে করিত। যৌবনে এই প্রকার পরম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলাম।

"কিন্তু এ মানব জীবনে সময়ে সময়ে বিপদের সঙ্গে সংগ্রাম না করিলে মনুষ্য সুখ শয্যায় পড়িয়া অচিরাৎ মনুষত্ব বিহীন হইয়া পড়ে। আমার সেই দশাই ঘটিল। আমার পিতা পিতামহ অস্ত্রবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁহাদের তেজ ছিল, সাহস ছিল। কিন্তু অস্ত্র শিক্ষার অভাবে আমি বাল্যকাল হইতেই কাপুরুষ।

"নাদের সা সসৈন্যে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিবামাত্র আমি অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলাম। আমার প্রজাগণ, সৈন্যগণ সকলেই আমাকে তখন সাহস প্রদান পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন—

"ভয় কি? কত সৈন্য লইয়াইবা নাদের সাহা ভারতে আসিবে। তাহার সৈন্যগণ দলে দলে বিভক্ত হইয়া যদি এক এক দেশ আক্রমণ করে, তবে নিশ্চয়ই তাহারা পরাজিত হইবে। আর সমুদয় সৈন্য লইয়া যদি ভারতের প্রত্যেক দেশ এক এক করিয়া আক্রমণ করিতে থাকে তবে সমুদয় দেশের লোক একত্র হইয়াই কি তাহাকে পরাস্ত করিতে পারিবে না? বিদেশ হইতে আসিয়া কি কেহ পররাজ্য দখল করিতে পারে?"

"কিন্তু প্রজাদিগের এ আশ্বাস বাক্য শুনিয়াও আমার মন আশ্বস্ত হইল না। আমি আত্মরক্ষার্থ পলায়ন করিতে কৃত সংকল্প হইলাম; এবং

আমার স্ত্রীর নিকট মনোগত ভাব ব্যক্ত করিলাম। আমার স্ত্রী আমার কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। স্বাধ্বী রমণীগণের অন্তরে স্বয়ং ঈশ্বর বিরাজ করেন। তাঁহারা অশিক্ষিতা হইলেও, কি ন্যায় কি অন্যায় সহজে অবধারণ করিতে পারেন। হৃদয়ের পবিত্র ভাব তাঁহাদের বিচার শক্তিকে সতেজ করে, জ্ঞান চক্ষুকে সূক্ষ্ম দৃষ্টি প্রদান করে। তিনি বলিতে লাগিলেন, এইরূপ আচরণ নিতান্তই রাজধর্ম্ম বিরুদ্ধ হইবে। প্রজাগণকে শত্রুহস্তে অর্পণ করিয়া রাজা পলায়ন করিলে তাহাকে নিশ্চয়ই নীরয়গামী হইতে হয়।

"কিন্তু আমি স্ত্রীর কথায় কর্ণপাত করিলাম না। তাঁহাকে নির্ব্বোধ বলিয়া মনে করিলাম। আমার স্ত্রী আবার বলিলেন, "না হয় তুমি তীর্থ দর্শন উপলক্ষে কিছুকাল এই সময়ে কাশীতে যাইয়া থাক। আমি প্রজা-দিগের রক্ষার্থ স্বদেশে থাকিব। আমার কেহ কিছু করিতে পারিবে না।" স্ত্রীর এই দ্বিতীয় পরামর্শও আমি গ্রহণ করিলাম না। তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া পূর্ব্ব প্রদেশে কাশী প্রভৃতি অঞ্চলে পলায়ন করিব বলিয়াই স্থির করিলাম। পলায়ন পূর্ব্বক আত্মরক্ষাই আমার একমাত্র শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করিলাম। আমার স্ত্রী নিতান্ত অনিচ্ছা পূর্ব্বক আমার সঙ্গে পলায়ন করিতে সম্মতা হইলেন।

"আমি পলায়ন করিলে পর প্রজাগণ একেবারে অসহায় হইয়া পড়িল। নেতা বিহীনে এবং রাজার অভাবে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল। তাহারা প্রত্যেকেই আপন আপন স্ত্রীপুত্রসহ পলায়ন করিতে লাগিল। প্রত্যেককেই গৃহত্যাগী হইতে হইল। আমার রাজ্য একেবারে জনশূন্য হইয়া পড়িল।

"আমার স্ত্রী এই সময় অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। তিনি পলায়ন কালেই বলিয়াছিলেন, "আমার আসন্ন মৃত্যু কিছুতেই নিবারিত হইবে না। প্রজা-দিগকে এই প্রকার অসহায় অবস্থায় পরিত্যাগ করা অপেক্ষা গুরুতর পাপ এ সংসারে আর কিছুই হইতে পারে না।" আমার স্ত্রীর একটী কথাও নিষ্ফল হইল না। প্রয়াগ পর্য্যন্ত পৌঁছিবামাত্রই তাঁহার প্রসব বেদনা উপস্থিত হইল। সঙ্গে দাস দাসী অধিক ছিল না। একটীমাত্র দাসী ছিল। আমি নিজেই তাঁহাকে নিদ্রিত করিবার নিমিত্ত বাতাস করিতে লাগিলাম। পৌর্ণমাসী রজনী। তিনি কিছুকালের নিমিত্ত নিদ্রিতা হইয়া পড়িলেন। কিন্তু প্রসব বেদনা আরম্ভ হইবামাত্র আবার তিনি

জাগ্রত হইলেন। জাগ্রত হইয়াই আমাকে বলিলেন, তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছেন চন্দ্রমণ্ডল হইতে স্বয়ং লক্ষ্মী তাঁহাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছেন। তিনি আর এ সংসারে থাকিবেন না। স্বপ্নে লোকে কত অদ্ভুত কাণ্ড দর্শন করে। আমি তাঁহার কথায় কোন বিশ্বাস স্থাপন করিলাম না। কিন্তু ইহার দুই ঘণ্টা পরেই রাত্রি তৃতীয় প্রহরের পর তিনি একটী কন্যা প্রসব করিলেন। এবং প্রসবের অব্যবহিত পরেই তাঁহার মৃত্যু হইল।

"স্ত্রীর মৃত্যুর পর এই কন্যাটীকে কিরূপে বাঁচাইব, তাহাই আমার এক মাত্র চিন্তা হইল। এই কন্যাটীর প্রাণ বাঁচাইবার নিমিত্ত দিবারাত্রি আমি এবং আমার সঙ্গিনী সেই দাসী, দুই জনে যত্ন করিতে লাগিলাম। কন্যাটীকে লইয়া অন্যূন এক বৎসর প্রয়াগে অবস্থান করিলাম। বৎসরেক পরে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিলাম যে আমার পিতৃরাজ্য জনশূন্য হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। বারম্বার পথ পর্য্যটনে আমার সঙ্গিনী দাসীরও মৃত্যু হইল। তখন কন্যার প্রতিপালনের ভার সম্পূর্ণরূপে আমারই হাতে পড়িল।

"একাকী পিতৃরাজ্যে বাস করিবার আর ইচ্ছা হইল না। দেড় বৎসর বয়স্কা কন্যাটীকে সঙ্গে করিয়া কাশীতে যাত্রা করিলাম। কাশীতে পৌঁছিয়া প্রায় দশ বৎসর কাল সেখানেই অবস্থান করিতে লাগিলাম। এই সময় আমার অন্য কোন কার্য্য ছিল না। আমি কাশীতে অবস্থান কালে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলাম। পিতৃরাজ্য হইতে যে কিছু অর্থ আনিয়াছিলাম, তদ্দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতাম।

"কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি শাস্ত্র অধ্যয়ন দ্বারা আমার কিছুই লাভ হয় নাই। অনেক শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছি, অনেক বিষয় জানিতে পারিয়াছি, এই প্রকার এক অভিমানের ভাব আমার অন্তরে উদয় হইল। শাস্ত্র অধ্যয়ন দ্বারা কেবল একটী নূতন রোগের সৃষ্টি হইল। অহঙ্কার এবং অভিমানে হৃদয় পূর্ণ হইল।

"আমার কন্যাটী দিন দিন বড় হইতে লাগিল। আমার হৃদয়ের যত কিছু ভালবাসা স্নেহ এবং দয়া সকলই সেই কন্যাতে অর্পিত হইল। কন্যাও পিতা ভিন্ন আর কিছুই জানিত না। কোন স্থান হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবামাত্র কন্যা দৌড়িয়া আসিয়া আমার গলা জড়াইয়া ধরিত। পৌর্ণমাসী রজনীতে ইহার জন্ম হইয়াছিল সেই জন্য তাহাকে আমি পূর্ণিমা নাম প্রদান করিলাম।

"পূর্ণিমার বয়ঃক্রম যখন এগার কি বার বৎসর হইল, তখন একদিন তাহাকে গৃহে রাখিয়া আমি কার্য্যোপলক্ষে কোন স্থানে গিয়াছিলাম। কিন্তু গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আর পূর্ণিমাকে দেখিতে পাইলাম না। সমস্ত দিবস স্থানে স্থানে তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। কোথাও তাহাকে দেখিতে না পাইয়া মনে করিলাম যে, বঙ্গদেশের তীর্থযাত্রিকগণ আমার কন্যাকে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। বঙ্গদেশের লোকদিগের প্রতি আমার চিরঘৃণা এবং বিদ্বেষের ভাব ছিল।

"আমি এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব না করিয়া, সে দিন বঙ্গদেশের যে সকল যাত্রিক গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল, তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বঙ্গদেশাভিমুখে ধাবিত হইলাম। কন্যার অনুসন্ধানে অন্যূন দশ বৎসর আমি বঙ্গ দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পর্য্যটন করিতে লাগিলাম। কিন্তু কোথাও তাহার তত্ত্বানুসন্ধান না পাইয়া প্রায় দশ বার বৎসর পরে পুনর্ব্বার কাশীতে যাত্রা করিলাম। বঙ্গদেশ পর্য্যটনকালে কলিকাতা নগরে আমার সঙ্গে প্রয়াগ অঞ্চল নিবাসী নেহাল সিংহ নামক এক সুবেদারের আলাপ পরিচয় হয়। যখন আমি বঙ্গদেশ হইতে কাশীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলাম, তখন আবার নেহাল সিংহের সহিত বক্সারেই সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সেই বক্সারের যুদ্ধেই নেহাল সিংহের মৃত্যু হয়। তোমার সঙ্গেও আমার প্রথম বক্সারেই সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু বক্সারের যুদ্ধের পর তুমি আমার কথা না শুনিয়া, "জগৎ লোক শূন্য" দেখিবার জন্য এলাহাবাদে চলিয়া গেলে, আমি একাকী কাশীতে আসিয়া মহাদেবের মন্দিরদ্বারে ধরণা দিয়া পড়িলাম। মনে মনে স্থির করিলাম যে আমার কন্যা কোথায় আছে, তৎসম্বন্ধে স্বপ্নাদেশ না হইলে নিশ্চয়ই আমি প্রাণত্যাগ করিব।

"কিন্তু কন্যা কোথা আছে, কে তাহাকে অপহরণ করিয়াছে, তৎসম্বন্ধে কোন স্বপ্নাদেশ হইল না। দুই দিবস কাল ধরণা দিয়া পড়িয়া রহিলাম। তখন কেবল তোমার প্রতিকৃতি এবং অন্যান্য শত শত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মুখচ্ছবি আমার মনোমধ্যে উদয় হইতে লাগিল। তোমার এবং সেই সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মুখাকৃতি আমার নিকট কি ভয়ঙ্কর বোধ হইতে লাগিল। দেখিতে লাগিলাম যেন শুদ্ধ কেবল স্বার্থপরতা দ্বেষ হিংসা অহঙ্কার অভিমান এবং অর্থগৃধ্নুতা তোমার এবং অন্যান্য পণ্ডিতগণের মুখমণ্ডল পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। তোমরা সকলেই জন্তুর ন্যায় জিগীষা পরবশ হইয়া

পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে ন্যায় শাস্ত্রের বাক্‌যুদ্ধ করিতেছ। তোমাদিগকে স্বপ্নাবেশে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া আমার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। তোমাদিগের সংসর্গ আমার অসহনীয় হইয়া উঠিল। আমি তৎক্ষণাৎ ধরণার অবস্থা হইতে জাগ্রত হইয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক গঙ্গার পারে চলিয়া গেলাম। সায়ংকালে নদী পার্শ্বস্থ সুশীতল সমীরণ সংস্পর্শে আমার শরীর একটু স্নিগ্ধ হইল, এবং উত্তেজিত মন একটু সাম্যভাবাবলম্বন করিল। আমি স্বপ্নাবস্থায় তোমাদের যে আকৃতি দেখিয়াছিলাম,সেই আকৃতি স্মরণ করিয়া আবার চিন্তা করিতে লাগিলাম। এই সকল বিষয় ভাবিতে ভাবিতে,তোমাদের বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে লোকের যে দুরবস্থা দেখিয়াছিলাম,তাহাই মনে হইতে লাগিল। বঙ্গদেশ পর্য্যটন কালে বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকের হাহাকার ধ্বনি সর্ব্বদাই আমি শুনিতাম। অরাজকতা নিবন্ধন বঙ্গের এক এক গ্রামের প্রজাদিগের উপর ইংরাজ বণিকগণ ঘোর অত্যাচার করিতেছিল। এক গ্রামের দশজন লোক একত্র হইলে অনায়াসে ইংরাজের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিত। কিন্তু এক জনের উপর যখন অত্যাচার হয়, তখন আর দশ জন ইংরাজের প্রসাদাকাঙ্ক্ষী হইয়া, ইংরাজদিগকে সে অত্যাচারের সাহায্য করে। পরে এক এক করিয়া ক্রমে সে অত্যাচার সকলের প্রতিই অনুষ্ঠিত হইতে থাকে।

"তোমার এবং অন্যান্য পণ্ডিতের মুখাকৃতি এবং বঙ্গদেশের প্রজার সেই দুরবস্থা ভাবিতে ভাবিতেই আমার জ্ঞানের উদয় হইল। আমার মোহ নিদ্রা ভঙ্গ হইল। যে জন্য সংসারে মানুষ এত কষ্ট পাইতেছে, যে জন্য বঙ্গদেশ অত্যাচারানলে দগ্ধ হইতেছে, তাহার মূল কারণ নির্ণয় করিতে তখন সমর্থ হইলাম। তখন আমার নিজের হৃদয়স্থিত পাপের প্রতিও দৃষ্টি পড়িল। তখন নিশ্চয়ই অবধারণ করিলাম যে, এ সংসারে আমরা সকলেই নিজ নিজ পাপের ফল ভোগ করিতেছি। হৃদয়স্থিত ঘোর স্বার্থপরতা এবং নীচাশয়তাই আমাদের বিনাশের একমাত্র কারণ। সেই স্বার্থপরতা নীচাশয়তা এবং কাপুরুষতার অনুরোধে আমরা আত্মরক্ষার্থ যে পথ অবলম্বন করি, সে একমাত্র আত্মবিনাশের পথ।

"এইরূপ সিদ্ধান্ত করিবামাত্র আমার স্ত্রীর উপদেশ স্মরণ হইতে লাগিল। তখন সেই লক্ষ্মীস্বরূপা আমার প্রাণসমা পত্নীর শোকে আমার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। মনে করিতে লাগিলাম, যে, আমি স্বার্থপরতা, নীচাশয়তা

এবং কাপুরুষতার অনুরোধে আত্মরক্ষার্থ ভ্রমে আত্মবিনাশের পথ অবলম্বন করিয়া,আমার সহধর্ম্মিণীর প্রাণ সংহার করিয়াছি। তিনি তো প্রজাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কখনও পলায়ন করিতে ইচ্ছা করেন নাই। স্বদেশে থাকিলে কখনও তাঁহার মৃত্যু হইত না। শুদ্ধ কেবল অন্তঃসত্বাবস্থায় আমার সঙ্গে পথ পর্য্যটন ক্লেশে প্রাণ হারাইলেন।

"আমি তখন আপনাকে আপনি স্ত্রী হত্যার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করিলাম,আত্মগ্লানিতে আমার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। "আমি স্ত্রী ঘাতক" "আমি স্ত্রী ঘাতক" "আমি স্ত্রী ঘাতক" এই শব্দগুলি তিনবার স্পষ্টাক্ষরে আমার মুখ হইতে বাহির হইল।

"এই সময় কাশীর কোতোয়ালের তিন জন পিয়াদা আমার নিকট দিয়া যাইতেছিল। অন্য কোন লোক যে আমার নিকট দিয়া যাইতেছে তাহা আমি দেখিতে পাই নাই। সেই তিন জন পিয়াদা "আসামী পাইয়াছি" বলিয়া, চীৎকার পূর্ব্বক আমাকে ধৃত করিল, এবং তৎক্ষণাৎ বন্ধন করিয়া, আমাকে কোতোয়ালের নিকট লইয়া চলিল। কোতোয়ালের নিকট আমাকে উপস্থিত করিবামাত্র কোতোয়াল বলিল—"এ লোকটা সন্ন্যাসী হইবে, ইহাকে কেন ধৃত করিয়া আনিয়াছিস্?"—

"পদাতিকগণ বলিল, "হুজুর ও স্বীকার করিয়াছে, যে ওই খুন করিয়াছে।"

"পদাতিকের কথা শুনিয়া কোতোয়াল তখন বলিল, "তবে সেই স্ত্রীলোকটার নিকট ইহাকে লইয়া যাও। তাহার এখনও মৃত্যু হয় নাই। তাহাকে জিজ্ঞাসা কর এই ব্যক্তিই তাহার উপপতি ছিল কি না।"

"কোতোয়ালের আদেশানুসারে পদাতিকগণ আমাকে সঙ্গে করিয়া একটা স্ত্রীলোকের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। স্ত্রীলোকটা তরবারির আঘাতে মৃত্যু শয্যায় পড়িয়া রহিয়াছে। আমাকে দেখাইয়া পদাতিকগণ স্ত্রীলোকটাকে জিজ্ঞাসা করিল, এই ব্যক্তি তোর উপপতি ছিল না?—"

"স্ত্রীলোকটা আমাকে দেখিয়াই চমকিয়া উঠিল; এবং বারম্বার কপালে করাঘাত পূর্ব্বক বলিতে লাগিল, "ঠাকুর তোমার সর্ব্বনাশ করিয়াই আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। আমি টাকার লোভে তোমার মেয়েকে চুরী করিয়া মহারাণীকে দিয়াছিলাম। সেই টাকা লইয়াই আমার সঙ্গে ঝগড়া হইয়াছে।

আমাকে ঠাকুর আর শাপ দিও না। আমার পাপের ফল হাতে হাতে পাইয়াছি। তোমার মেয়ে এখন রাণী হইয়াছে।"

"আমি স্ত্রীলোকটার কথা প্রথমতঃ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু পরে শুনিলাম যে, এই স্ত্রীলোকটার একটা উপপতি ছিল। ইহার বৃদ্ধাবস্থায় সে ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য উপপত্নী গ্রহণ করে। পরে ইহাদের উভয়ের পূর্ব্বোপার্জ্জিত টাকা লইয়া উভয়ের মধ্যে বিবাদ হয়। সেই বিবাদ উপলক্ষে ইহার উপপতি ইহার প্রাণ বিনাশ করিবার অভিপ্রায় ইহাকে তরবারির আঘাত করিয়া সমুদায় টাকা অপহরণ পূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছে।

"পদাতিকগণের নিকট স্ত্রীলোকটা আমাকে নির্দ্দোষী বলিবামাত্র তাহারা আমাকে ছাড়িয়া দিল। আমি পুনর্ব্বার নদীর পারে আসিয়া ভাবিতে লাগিলাম যে বাঙ্গালী যাত্রিকগণ আমার কন্যাকে অপহরণ করিয়াছে বলিয়া, অনর্থক আমি তাহাদিগকে সন্দেহ করিয়াছিলাম। এই স্ত্রীলোকটাই আমার কন্যাকে চুরি করিয়া, রাজা বলবন্তসিংহের নিকট দিয়াছে। রাজা বলবন্তসিংহের প্রতি অত্যন্ত কোপাবিষ্ট হইয়া, তৎক্ষণাৎ তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত গঙ্গা পার হইয়া রামনগরে চলিলাম। কিন্তু রাজা কিম্বা নবাবদিগের সাক্ষাৎ লাভ করা সহজ ব্যাপার নহে। তিন চারি দিনের মধ্যেও বলবন্তসিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল না। অবশেষে অনেক কষ্টে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। কিন্তু দরবারের মধ্যে তাঁহার নিকট আমার বক্তব্য বিষয় বলিবার সুযোগ হইবে না বলিয়া পূর্ব্বেই একখানি পত্র তাঁহার নিকট লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। সেই পত্রখানি হাতে দিয়া বলিলাম, "মহারাজ গোপনে এই পত্রখানি পাঠ করিবেন।"

"পত্র প্রদানের পর দিবস বলবন্তসিংহ আমাকে ডাকাইয়া নিয়া গোপনে এক নির্জ্জন গৃহে বসিয়া আমার সঙ্গে কথা বার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। আমাকে কোপাবিষ্ট দেখিয়া পদতলে পড়িয়া, আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন; এবং পূর্ণিমা এবং রাণী গোলাপকুমারীর সঙ্গে আমাকে সাক্ষাৎ করিতে বলিলেন।

* চৈৎসিংহের মাতা পন্না অর্থাৎ পূর্ণিমা যে নীচ কুলোদ্ভবা ছিলেন না তাহা বলবন্তনামার লেখকও একস্থানে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু বলবন্তনামায় লিখিত আছে যে পূর্ণিমা বলবন্ত সিংহের পঞ্চম স্ত্রী। বলবন্তনামা লেখক বলেন গোলাপকুমারীর গর্ভে বলবন্ত

"আমার পূর্ণিমাকে বলবন্তসিংহ ধর্ম্মপত্নী স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন; তাঁহাকে রাণীর পদ প্রদান করিয়াছেন, এই কথা শুনিয়া আমি ক্রোধ সম্বরণ করিলাম। পূর্ণিমাকে দেখিবার নিমিত্ত আমার বড়ই ইচ্ছা হইল। মনে করিলাম আমার পূর্ণিমা আমাকে দেখিবামাত্র পূর্ব্বের ন্যায় দৌড়িয়া আসিয়া আমার গলা জড়াইয়া ধরিবে।

"কিন্তু এ সংসারের ধন সম্পত্তি অনেক সময়ে হৃদয়কে পাষাণের ন্যায় কঠিন করে। সৌভাগ্যের গর্ব্ব, বিলাসপ্রিয়তা, ঐশ্বর্য্যাভিমান, প্রভুত্ব-লিপ্সা মানব হৃদয়কে সময়ে সময়ে স্নেহ, দয়া, ভক্তি ও বিনয় পরিশূন্য করে।

"রাজা বলবন্তসিংহের আদেশানুসারে চারি পাঁচ জন দাসী আমাকে অন্দরের মধ্যে লইয়া চলিল। রাণী গোলাপকুমারী এবং পূর্ণিমা উভয়ের সঙ্গেই আমার সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা উভয়েই আমার প্রতি যথোচিত পিতৃভক্তি প্রদর্শন করিলেন। কিন্তু আমার পূর্ণিমাকে আর আমার পূর্ণিমা বলিয়া বোধ হইল না। পূর্ণিমার হৃদয় যেন আবেগহীন হইয়াছে। তাঁহার হৃদয়াবেগ উষ্ণতা পরিশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। সাদর সম্ভাষণে পূর্ণিমা আমাকে যাহা কিছু বলিলেন, সে সকল কথা তাঁহার কণ্ঠ হইতে বাহির হইতেছে বলিয়া আমার মনে হইতে লাগিল। সে সকল হৃদয়ের কথা নহে।

"পূর্ণিমার মুখাবলোকন করিয়া আমি আশানুরূপ আনন্দ লাভ করিতে পারিলাম না, বরং আমার মনে মনে আরও কষ্ট হইতে লাগিল। আমি তখন মনে করিলাম, যে, এ সংসারে পূর্ণিমাই আমার একমাত্র জীবনের অবলম্বন ছিল; কিন্তু তাহার বিবাহ হইয়াছে, তাহার সন্তান হইয়াছে, তাহার জন্য আমার কোন চিন্তা করিতে হইবে না। অতএব আমি এখন সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবানের চরণ অবলম্বন করিব। এই প্রকার স্থির করিয়া হরিদ্বারে চলিয়া আসিলাম। এখানে নির্জ্জনে বসিয়া সর্ব্বদাই ঈশ্বরের ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতাম। তখন বৃক্ষতলই আমার একমাত্র আশ্রয় হইল। প্রায় দুই তিন বৎসর পর্য্যন্ত এইরূপে সর্ব্বদাই নয়ন মুদ্রিত করিয়া ঈশ্বর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতাম। শরীর ধারণার্থ দুই এক দিন পরে

সিংহের পুত্র জন্মে নাই বলিয়াই তিনি ক্রমে তিন স্ত্রী গ্রহণ করেন। তৎপরে পূর্ণিমাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু পূর্ণিমাকে বিবাহ করিবার সময় সেই তিন স্ত্রীর মধ্যে যে কেহ জীবিত ছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ নাই।

এক একবার আহার করিতাম। কিন্তু দুই তিন বৎসরের মধ্যেও ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারিলাম না। কোথায় যে সে অনন্ত ঈশ্বর রহিয়াছেন, কিরূপে যে তাঁহাকে লাভ করা যায়, তৎসম্বন্ধেও কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। তখন আমার মনে নানা সন্দেহ উপস্থিত হইতে লাগিল। মনে করিতে লাগিলাম যে, হয়ত সে অনন্ত মহান্ ঈশ্বরকে লাভ করিবার প্রকৃত পথ আমি অবলম্বন করিতে পারি নাই। তখন আবার ধ্যান পরিত্যাগ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম। কখনও নয়ন মুদ্রিত করিয়া চিন্তা করিতে বসিতাম, কখনও নদীর পারে বসিয়া চিন্তা করিতাম। একদিন অকস্মাৎ একটী কৃষককে ক্ষেত্রে কার্য্য করিতে দেখিয়া, আমার সেই ভগবৎগীতার কর্ম্মযোগের কথা স্মরণ হইল। সেইদিন হইতে কর্ম্মযোগের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম। অত্যল্পকাল মধ্যেই আবার আপন জীবনের বিবিধ ভ্রম এবং কুসংস্কার দেখিতে পাইলাম। ক্রমে আমার হৃদয়স্থিত মোহান্ধকার দূর হইতে লাগিল। অবশেষে আমি এই সিদ্ধান্ত করিলাম, এ সংসার মানুষের একমাত্র কার্য্যক্ষেত্র। এ সংসারে, কর্ম্মযোগ ভিন্ন আর মুক্তির উপায় নাই। কর্ম্ম বিনা জ্ঞান নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে। কর্ম্ম বিহীন হৃদয় আবেগ শূন্য হয়। মনুষ্য মাত্রেই ঈশ্বরের সেনা। এ সংসারে প্রত্যেককেই সৈনিক পুরুষ হইতে হইবে। ঈশ্বর প্রদত্ত প্রকৃতি বিবর্জ্জিত হইয়া, আমরা সকলেই বৃথা জীবন যাপন করিতেছি।

"আমার এইরূপ সিদ্ধান্ত করিবার কিছুকাল পূর্ব্বে কি পরে ঠিক্ স্মরণ নাই, তুমি এখানে আসিয়াছিলে। আমার ইচ্ছা ছিল তোমাকে এখানে রাখি। কিন্তু তুমি আমার কথা না শুনিয়া, তখন রোহিলখণ্ডে চলিয়া গেলে। আমি তদবধিই এখানে আছি।"

শ্রীনিবাস পণ্ডিতের কথা সমাপ্ত হইবামাত্র বাণেশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার দুরবস্থা দেখিয়া, আপনার হৃদয়ের মোহান্ধকার কিরূপে দূর হইল তাহাতো বলিলেন না ?"

শ্রীনিবাস ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন "তুমি আমার কথা বোধ হয় বিশেষ প্রণিধান পূর্ব্বক শ্রবণ কর নাই। সে কথাতো আমি এখনই বলিয়াছি। স্বপ্নাবেশে যখন তোমার এবং শত শত পণ্ডিতদিগের সেই ভয়ঙ্কর মুখাকৃতি দেখিলাম ; যখন তোমাদিগকে হিংস্র জন্তুর ন্যায় জিগীষা

পরবশ হইয়া, পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরকে ন্যায় শাস্ত্রের বাক্‌যুদ্ধ করিতে দেখিলাম ; যখন তোমাদিগের মধ্যে কেবল দ্বেষ হিংসা অভিমান, অহঙ্কার স্বার্থপরতা এবং কাপুরুষতা অবলোকন করিলাম। তখনই আমার মনে হইল যে জন বিশেষের স্বার্থপরতাই সংসারের সকল কষ্ট এবং সকল যন্ত্রণার মূল। একমাত্র স্বার্থপরতাই তোমাকে এত কষ্ট, এত যন্ত্রণা প্রদান করিতেছে। আমিও স্বার্থপরতা এবং কাপুরুষতা নিবন্ধন স্ত্রীর উপদেশ লঙ্ঘন পূর্ব্বক প্রজাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াই নানা বিপদ ও যন্ত্রণা সহ্য করিতেছি।

বাণেশ্বর। আমার কি স্বার্থপরতা ছিল? আমার উপরইতো দুর্বৃত্ত মীরণ অত্যাচার করিল।

শ্রীনিবাস। তোমার দেশের অপর কোন ব্রাহ্মণের প্রতি যদি মীরণ এইরূপ অত্যাচার করিত তবে তুমি তাহার সাহায্য করিতে?

বাণেশ্বর। তাহা করিতাম কি না তাহা কিরূপে বলিব? আর আমার সাহায্য করিবার ক্ষমতাইবা কি ছিল? মীরণ দেশের নবাব। আমি তাহার কি করিতে পারি?

শ্রীনিবাস। ক্ষমতা থাকিলেও তুমি কখন সাহায্য করিতে না। তোমার ক্ষমতা আছে বই কি। এখনও তোমার মন হইতে স্বার্থপরতা এবং কাপুরুষতা বিদূরিত হয় নাই। এখনও তুমি ঘোর স্বার্থপরায়ণ। নহিলে ফায়েজাবাদ হইতে সে রোহিলা রমণীদ্বয়কে একাকিনী কাশীতে পাঠাইলে কেন?

বাণেশ্বর। এইরূপ স্বার্থপরতা তো পৃথিবীর সকল লোকের মধ্যেই রহিয়াছে।

শ্রীনিবাস। কষ্ট যন্ত্রণাও পৃথিবীর সকল লোকেই ভোগ করিতেছে।

বাণেশ্বর। তবে সংসারের প্রত্যেক লোক কি আপনার স্ত্রী পুত্র পরিত্যাগ করিয়া কেবল পরোপকার করিতে থাকিবে?

শ্রীনিবাস। ইহার মধ্যে পরোপকারের কোন কথা নাই। মানুষ ঈশ্বর হইতে যে প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই প্রকৃতি রক্ষা করিতে পারিলেই সে সুখী হইতে পারে। আর সেই প্রকৃতি বিবর্জ্জিত হইলেই সে কষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করে। শরীর সম্বন্ধেও এই নিয়ম। মানসিক কার্য্যকলাপ সম্বন্ধেও এই নিয়ম। শরীর স্বাভাবিক প্রকৃতি ভ্রষ্ট হইলেই রোগ হয়। রোগই শারীরিক দুঃখ কষ্টের একমাত্র কারণ। আর মনও স্বাভাবিক ধর্ম্ম কিম্বা স্বাভা-

বিক অবস্থা বিবর্জ্জিত হইবামাত্র কুকার্য্যে রত হয়। সেই কুকার্য্য এবং কর্ত্তব্য লঙ্ঘনই মানুষের বিপদের মূল কারণ।

বাণেশ্বর। মনের স্বাভাবিক অবস্থা কি?

শ্রীনিবাস। স্বাভাবিক অবস্থায় মন হৃদয়াবেগ দ্বারা পরিচালিত হইয়া কর্ত্তব্য সাধন করে। তখন কুটীলতা, দ্বেষ হিংসা স্বার্থপরতা মর্ম্মের সে গতিকে অবরোধ করে না। কর্ত্তব্য সাধন করিলে সদ্গতি লাভ হইবে সে চিন্তা তখন মনে প্রবেশ করে না।

বাণেশ্বর। আপনার এ কথার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিলাম্ না।

শ্রীনিবাস। এ কথাটা বুঝিতে পারিলে না। তবে তোমার নিজের কার্য্যের কথা দ্বারাই তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছি। তুমি কি উদ্দেশ্যে রোহিলখণ্ড হইতে সেই বৃদ্ধা রোহিলা রমণীকে সঙ্গে করিয়া স্থানে স্থানে তাহার কন্যার অন্বেষণার্থ ভ্রমণ করিয়াছিলে?

বাণেশ্বর। আমার কোন উদ্দেশ্যই ছিল না। সেই রমণীর দুঃখ দেখিয়া মনে বড়ই কষ্ট হইল। তখন মনে করিলাম যে, আমার প্রাণ দিয়াও যদি ইহার কন্যাকে ইহার ক্রোড়ে আনিয়া দিতে পারি, তবে ইহার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিব।

শ্রীনিবাস। তবে শুদ্ধ কেবল তাহার দুঃখ দেখিয়া তোমার মনের মধ্যে এইরূপ একটী আবেগ কিম্বা সদ্ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল?

বাণেশ্বর। তা বই কি? মনের মধ্যে এইরূপ একটা সদ্ভাবের উদয় হইয়াছিল বলিয়াই তাহাকে সঙ্গে করিয়া ফায়েজাবাদে চলিয়া গেলাম।

শ্রীনিবাস। তবে মনের সেই সদ্ভাবই কেবল তোমাকে এই কষ্টকর কার্য্যে, এই দুঃসাধ্য ব্যাপার সাধনে, নিযুক্ত করিল।

বাণেশ্বর। হাঁ—তাই তো—

শ্রীনিবাস। তবে সেই মনের সদ্ভাবের নামই হৃদয়াবেগ। অগ্র পশ্চাৎ, ভাল মন্দ, হিতাহিত, কিছুই বিবেচনা না করিয়া, মানুষ শুদ্ধ যখন এই প্রকার হৃদয়ের সদ্ভাব দ্বারা পরিচালিত হইয়া, কর্ত্তব্য সাধন করে তখনই সে প্রকৃত কর্ম্মযোগী। তখনই তাহার মনের স্বাভাবিক অবস্থা সংরক্ষিত হয়। আর প্রত্যেক কার্য্যের পূর্ব্বেই যাহারা কেবল লাভালাভ হিসাব করে, তাহারা স্বার্থপরায়ণ, নীচাশয় এবং কাপুরুষ। চরমে তাহাদিগকে তোমার এবং আমার ন্যায় দুরবস্থাপন্ন হইতে হয়।

বাণেশ্বর। মানুষ কি কখন লাভালাভ এবং হিতাহিতের হিসাব না করিয়া কার্য্য করিতে পারে?

শ্রীনিবাস। নিশ্চয়ই পারে। প্রকৃতিভ্রষ্ট না হইলে নিশ্চয়ই পারিবে। তুমিও তো তাহা এ জীবনে একবার করিয়াছ। তুমি তো লাভালাভ হিসাব করিয়া বৃদ্ধার সঙ্গে ফায়েজাবাদ যাও নাই।

বাণেশ্বর। এমন মানুষ তো সংসারে দেখি না যে লাভালাভের হিসাব না করিয়া কর্ত্তব্য সাধন করে।

শ্রীনিবাস। সংসারের এইরূপ মানুষ আছে, কি না, কিম্বা থাকিলে কত জন আছে, বলিতে পারি না। কিন্তু পরমেশ্বরের প্রতি এবং পরমেশ্বরের ন্যায় বিচারের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলে, মানুষ অনায়াসেই আপন হৃদয়স্থিত সদ্ভাব দ্বারা পরিচালিত হইয়া দুঃসাধ্য ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতে পারে। অগ্নিতে ঝাঁপ দিতে পারে, পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিতে পারে। যাহার ঈশ্বরেতে বিশ্বাস নাই, সে প্রকৃত কর্ম্মযোগী হইতে পারে না। এক প্রকার, না এক প্রকার ফলের প্রত্যাশায় সে কর্ত্তব্য সাধন করে। সেই ফল প্রত্যাশাই ক্রমে ঘোর স্বার্থপরতায় পরিণত হয়। স্বার্থপরতাই মানুষের বিনাশের কারণ। আমি স্বার্থপরতার অনুরোধে আপন প্রজাদিগকে শত্রু হস্তে পরিত্যাগ করিয়া, এ দুরবস্থা ভোগ করিতেছি। তোমাদিগের বঙ্গদেশের সমুদয় লোক কেবল আপনা স্ত্রী পুত্র রক্ষণই আত্ম রক্ষার পথ মনে করিয়া দিন দিন বিপদগ্রস্ত হইতেছে।

বাণেশ্বর। তবে আপনি বঙ্গদেশের লোকদিগকে কি করিতে বলেন? পূর্ব্বে কয়েক দিন মীরণের অত্যাচার ছিল। এখন তো ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর লোক মীরণ অপেক্ষাও শতগুণে অত্যাচার করিতেছে।

শ্রীনিবাস। সত্যের প্রতি, ঈশ্বরের ন্যায় বিচারের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, প্রত্যেক বাঙ্গালী যদি দেশব্যাপ্ত অত্যাচার নিবারণার্থ চেষ্টা করে, তবে আর কাহাকেও এ অত্যাচারানলে দগ্ধ হইতে হয় না। ঈশ্বরের ন্যায় বিচারের প্রতি বিশ্বাস নাই, এই জন্য বাঙ্গালী কাপুরুষ। আর আত্মাভিমান এবং অহঙ্কার তাহাদিগের হৃদয়স্থিত সদ্ভাব বিনাশ করিয়াছে বলিয়াই তাহারা ঘোর স্বার্থপর। এই স্বার্থপরতা এবং কাপুরুষতাই তাহাদের বিনাশের মূল কারণ।

বাণেশ্বর। ঠাকুর, দেশশুদ্ধ সমুদয় লোকই যখন স্বার্থপরায়ণ এবং কাপুরুষ হইয়া পড়িয়াছে, তখন দুই এক জন লোক স্বার্থপরতা পরিত্যাগ এবং কাপুরুষতা পরিহার করিলে কি উপকার হইবে ?

শ্রীনিবাস। তুমি বারম্বার উপকার অনুপকারের কথা তুলিতেছ কেন ? লাভালাভ, উপকার অনুপকারের কোন কথা ইহার মধ্যে নাই। যে ব্যক্তি আপনার হৃদয়স্থিত স্বার্থপরতা এবং কাপুরুষতা পরিত্যাগ করিবে সেই কেবল পশুত্ব পরিহার করিয়া মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইবে। দশ জনে স্বার্থপরতা এবং কাপুরুষতা পরিহার না করিলে, আমিও স্বার্থপরতা এবং কাপুরুষতা পরিহার করিব না, এইরূপ যাহার মনের ভাব সে কখনও মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে না।

বাণেশ্বর। তবে সাক্ষাৎ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করাকেই আপনি মনুষ্যত্ব লাভ করা বলিতেছেন।

শ্রীনিবাস। মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইলে মরিতে হইবে কেন ?

বাণেশ্বর। তা বই কি। দেশশুদ্ধ লোক যখন স্বার্থপরায়ণ এবং কাপুরুষ তখন প্রথমে যে ব্যক্তি কাপুরুষতা পরিহার করিবে নিশ্চয়ই তাহাকে মরিতে হইবে।

শ্রীনিবাস। মনুষ্যত্ব লাভ করিবার নিমিত্ত যদি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে হয় তাহাও ভাল। তুমি এবং আমি যে শোক দুঃখ এ জীবনে সহ্য করিতেছি, তাহাপেক্ষা কি মৃত্যু শত গুণে প্রার্থনীয় নহে ?

বাণেশ্বর। এ ঠিক কথা বলিয়াছেন। মৃত্যুই আমাদের পক্ষে ভাল ছিল। কিন্তু অদৃষ্টে দুঃখ থাকিলে সে মৃত্যুকেও লাভ করা যায় না। মরিবার নিমিত্ত তো গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়াছিলাম। কিন্তু পাপী বলিয়া ভগবতী গঙ্গাও আমাকে গ্রহণ করিলেন না। বেরুচ এবং গোরকপুরের লোকেরা বেশ করিতেছে। তাহারা এখন আর মৃত্যুকে ভয় করে না। স্ত্রী পুরুষ একত্র হইয়া ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছে।

শ্রীনিবাস। বেরুচ এবং গোরকপুরে কি হইয়াছে ?

বাণেশ্বর। যাহা হইয়াছে তাহা আর কি বলিব। ইংরাজের লোকেরা খাজানা আদায় উপলক্ষে দেশশুদ্ধ স্ত্রী পুরুষের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলে পর, দেশের স্ত্রী পুরুষ একত্র হইয়া অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক ইংরাজদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছে।

শ্রীনিবাস। বেরুচ এবং গোরকপুরের নিকটস্থ অন্যান্য জেলার লোক আসিয়া তাহাদিগের সঙ্গে যোগ দিয়াছে নাকি?

বাণেশ্বর। অযোধ্যা এবং রোহিল খণ্ডের অন্তর্গত প্রায় সমুদয় জেলায় এইরূপ অত্যাচার হইতেছে। কোন জেলার লোকই সুখে নাই। তবে গোরকপুর এবং বেরুচেই ঘোরতর অত্যাচার হইয়াছে।

শ্রীনিবাস এই অত্যাচারের কথা শ্রবণ মাত্রই তাঁহার দুই চক্ষু হইতে আবার অশ্রু বিসর্জ্জিত হইতে লাগিল। তিনি সজল নয়নে বলিতে লাগিলেন, "হা বিধাত! আমার পিতা পিতামহ অস্ত্র বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। অনাথ এবং দুর্ব্বলকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহারা অস্ত্র ধারণ করিতেন। আমি কুলাঙ্গার, পিতার কুপুত্র, অস্ত্র শিক্ষা না করিয়াই ঈদৃশ ঘৃণিত জীবন প্রাপ্ত হইয়াছি। "মানুষ মাত্রেই ঈশ্বরের সেনা। এ সংসারে প্রত্যেককেই সৈনিক পুরুষ হইতে হইবে। হায় হায় ঈশ্বর প্রদত্ত প্রকৃতি বিবর্জ্জিত হইয়াই বৃথা জীবন যাপন করিতেছি।"

বাণেশ্বর শ্রীনিবাসের এই আক্ষেপোক্তি শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "ঠাকুর কিরূপে আমাদের দেশের লোক সৈনিক পুরুষ হইবে; কি প্রকারে তাঁহারা অস্ত্র শিক্ষা করিবে? মীরজাফর বঙ্গের সুবাদার হইবার পর আর হিন্দুদিগকে সৈনিক দল ভুক্ত করেন না। তাঁহার বিশ্বাসী কেবল দুই এক জন মুসলমানকেই সৈনিক পুরুষের পদ প্রদান করিতেছেন। মেদিনীপুরের রাজা রামরামসিংহ বিদ্রোহী হইলে পরই এই নিয়ম করিয়াছেন।

শ্রীনিবাস বাণেশ্বরের এই কথা শ্রবণ মাত্র কোপাবিষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন, "নরপিশাচ, কামাসক্ত, লম্পট মীরজাফরের কথা মুখেও আনিবে না। যে রাজা প্রজাদিগকে নিরস্ত্র করিয়া, প্রজাদিগকে অস্ত্র হীন করিয়া, আপন রাজপদ রক্ষা করিতে ইচ্ছা করে সে রাজা নহে, সে দস্যু। রাজা সর্ব্বদাই প্রজাদিগের মঙ্গল সাধনের চেষ্টা করিবেন, প্রজাগণ যাহাতে মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে তাহাই করিবেন। কিন্তু বঙ্গের দস্যু—কামাসক্ত, লম্পট মীরজাফর—প্রজাদিগের হস্ত পদ কর্ত্তন করিয়া তাহাদিগের উপর প্রভুত্ব করিতে চাহেন। বঙ্গবাসীগণ যদি মানুষ হইত, তবে এ নরপিশাচ মীরজাফরকে তৎক্ষণাৎ সিংহাসনচ্যুত করিতে চেষ্টা করিত। রাজা কে? রাজা প্রজার ভৃত্য। প্রজাগণ যাহাকে স্বেচ্ছা পূর্ব্বক রাজা বলিয়া স্বীকার করিবেন সেই প্রকৃত রাজা। প্রজাগণের রাজ ভক্তির উপর যাহার সিংহাসন

সংস্থাপিত নহে সে কি রাজা ? সে যে দস্যু। মীরজাফরকে তুমি রাজা বলিলে কেন ? মীরজাফর সত্য সত্যই দস্যু। তাঁহার সে অপবিত্র নাম মুখে আনিলেও হৃদয় কলুষিত হয়।

বাণেশ্বর। মহাশয়, ঈশ্বরের চক্ষে, ন্যায়ের দৃষ্টিতে এবং রাজধর্ম্মানুসারে মীরজাফর দস্যু হইতে পারে। কিন্তু মীরজাফরের বিরুদ্ধে যদি কেহ অস্ত্র ধারণ করে, তবে তো তাহাকে রাজ বিদ্রোহী বলিয়া দণ্ডনীয় হইতে হইবে। এই তো সে দিন আমি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিলাম, গোরকপুরের দেড়শত লোককে কর্ণেল হ্যানে খাজানা আদায় করিবার নিমিত্ত কয়েদ রাখিয়া বিবিধ যন্ত্রনা এবং শারীরিক কষ্ট প্রদান করিতেছিল। সেই সকল কয়েদীর স্ত্রী পুত্র অস্ত্র হাতে করিয়া, তাহাদিগের উদ্ধারার্থ কর্ণেল হ্যানের মালকাছারিতে পৌঁছিবামাত্র কর্ণেল হ্যানের হুকুমানুসারে তাহার লোকেরা প্রায় বিশজন কয়েদীর * মাথা কাটিয়া তাহাদের স্ত্রী পুত্রদিগের দিকে সেই ছিন্ন মস্তক নিক্ষেপ করিল। লক্ষ্ণৌর নবাব দরবারে এই সংবাদ পৌঁছিলে পর ইংরাজ রেসিডেণ্ট এবং নবাব আসফ উদ্দৌলার বিচারে সাব্যস্ত হইল যে, রাজবিদ্রোহীর প্রাণদণ্ড করিলে কোন অপরাধ হয় না। সুতরাং কর্ণেল হ্যানে আঠার জন লোককে খুন করিয়াও দোষী সাব্যস্ত হইল না।

বাণেশ্বরের মুখে এই বিশজন লোকের প্রাণ সংহারের কথা শ্রবণমাত্রই শ্রীনিবাস অকস্মাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া গেলেন। শ্রীনিবাসের হৃদয় বাল্যকাল হইতেই দয়া মায়া এবং স্নেহে পরিপূর্ণ ছিল। তাঁহার চরিত্র অতি নির্ম্মল ছিল। তিনি ধনীর সন্তান হইলেও কামাসক্ত ছিলেন না। একজন শিষ্য তখন গৃহে প্রবেশ করিয়া শ্রীনিবাসের মস্তকে জল সিঞ্চন করিতে লাগিল। কিছুকাল পরে শ্রীনিবাস চেতনাপ্রাপ্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "হায় হায় অর্থের লোভে মানুষের উপর মানুষ এত অত্যাচার করে।"

এই বলিয়াই তিনি নয়ন মুদ্রিত করিলেন। কিছুকাল পরে তিনি বদ্ধাঞ্জলি হইয়া করপুটে বলিয়া উঠিলেন, "ভগবান্ অনাথের নাথ এ দেশীয় লোকের পাপের ভোগ কি এখনও শেষ হয় নাই। আজ চল্লিশ বৎসর যাবত এই অত্যাচারানল জ্বলিতেছে। পরমেশ্বর ভারতবাসী নরনারী-দিগকে এ দুঃখ যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার কর।"

* Eighteen persons were beheaded.—Vide The papers relating to the trial of Hastings.

ইহার পর শ্রীনিবাস এবং বাণেশ্বর একত্রে আহারাদি করিয়া পরামর্শ করিলেন যে, তাঁহারা উভয়েই একত্র হইয়া অযোধ্যায় গমন করিবেন। বাণেশ্বর যোগাসনে জীবন যাপন করিবেন বলিয়া এখানে আসিয়াছেন। কিন্তু শ্রীনিবাস তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, চিত্তশুদ্ধি না হইলে কোন যোগই সংসিদ্ধ হইবে না। কর্ম্মযোগ ভিন্ন জ্ঞান পরিপক্ক হয় না। কর্ম্মশূন্য জ্ঞান মানব মনে কেবল অভিমান এবং অহঙ্কারস্বরূপ রোগ উৎপাদন করে। অভিমান এবং অহঙ্কার হইতে স্বার্থপরতা সমুৎপন্ন হয়। স্বার্থপরতা হইতে কাপুরুষতা জন্মে। সেই কাপুরুষতাই মানুষকে পশুজীবন প্রদান করে।

বাণেশ্বর মুখে "অসার সংসার প্রভুর চরণ সার" বলিতেছেন; কিন্তু এখনও সময়ে সময়ে পুত্রের সাক্ষাৎলাভ আশা তাঁহার অন্তরে উদয় হয়। তিনি প্রথমতঃ অযোধ্যায় যাইতে অসম্মত হইলেন। তখন শ্রীনিবাস পণ্ডিত তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, "হয়তো এবার অযোধ্যায় গেলে তোমার পুত্রের সঙ্গেও সাক্ষাৎ হইতে পারে।

বাণেশ্বর বলিলেন, "সে আশা আর আমার নাই। আমার পুত্র এখনও জীবিত থাকিলে হাফেজনন্দিনীর প্রেমপাশেই আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন। কিন্তু অযোধ্যাবাসী লোকের ঘরে ঘরে অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি যে, হাফেজনন্দিনী নামে কখনও কোন স্ত্রীলোক অযোধ্যায় ছিল না।

শ্রীনিবাস বলিলেন "তুমি নিতান্ত নির্ব্বোধ। হাফেজনন্দিনী নামে কোন স্ত্রীলোক অযোধ্যায় থাকিবার একেবারেই সম্ভব নাই। ফায়েজাবাদের সেই সিপাহী তোমার নিকট বোধ হয় যথার্থ কথা বলিয়াছে। ফরেক্কাবাদের নবাবের কন্যাকে হয়ত তোমার পুত্র হাফেজনন্দিনী নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। আপন প্রণয়িনীকে একটা নূতন নাম প্রদান করিয়াছিলেন। ফরেক্কাবাদের নবাব হাফেজ রহমতখাঁর সঙ্গে আমার পিতা পিতামহের আলাপ পরিচয় ছিল। আমার বোধ হয় হাফেজ রহমতখাঁর কন্যার প্রণয়পাশেই তোমার পুত্র আবদ্ধ হইয়াছেন। অযোধ্যায় ভ্রমণকালে "ফরেক্কাবাদের নবাব কন্যা কোথায় আছেন" এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে নিশ্চয়ই তুমি তোমার পুত্রের অনুসন্ধানে কৃতকার্য্য হইবে। তুমি আবার আমার সঙ্গে একত্রে অযোধ্যায় চল। সেখানে তোমার পুত্রেরও অনুসন্ধান করিব; আর অযোধ্যাবাসী সেই অত্যাচার নিপীড়িতদিগকে যদি কোন প্রকারে আমরা সাহায্য করিতে পারি তবে তাহার চেষ্টা করিব।

বাণেশ্বর বলিলেন আমরা কিরূপে সাহায্য করিব? আমাদের কি আর অস্ত্র ধারণ করিবার ক্ষমতা আছে। আপনি যথার্থ কথাই বলিয়াছেন, যাহার অস্ত্র ধারণ করিবার ক্ষমতা নাই সে মানুষই নহে। অশীতি বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ হাফেজ রহমতখাঁ ঠিক্ কুরুশ্রেষ্ঠ ভীষ্মদেবের ন্যায় রোহিলাযুদ্ধে শরশয্যায় শয়ন করিলেন। আমি তাঁহার বীরত্ব দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম।

শ্রীনিবাস বাণেশ্বরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন হায় এ জীবন বৃথা যাপন করিলাম। হাফেজ রহমতখাঁ আশী বৎসর বয়সের সময় সংগ্রাম ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধ করিয়াছে। আর আমি যৌবনকালে দ্বাবিংশতি বৎসর বয়সের সময় নাদের সাহার আক্রমণের কথা শুনিয়াই রাজ্য ছাড়িয়া পলায়ন করিলাম। ধিক্ এ জীবনে, ধিক্ এ জীবনে। এখনও আমার আশী বৎসর বয়স হয় নাই। প্রায় চৌষট্টী বৎসর হইয়াছে। যদি সহজে অস্ত্র শিক্ষার সুবিধা থাকিত তবে না হয় এই বৃদ্ধ বয়সে অস্ত্র শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিতাম। তিন বৎসর অস্ত্রশিক্ষা করিয়া এ অত্যাচার নিপীড়িতদিগের সাহায্যার্থে একবার অস্ত্রধারণপূর্ব্বক মানবজীবন সার্থক করিতাম।

মনে মনে, এইরূপ চিন্তা করিয়া বাণেশ্বরকে বলিলেন, "চল একবার অযোধ্যায় যাই। অন্ততঃ এক জন রোগীকে এক বিন্দু জল, ক্ষুধার্ত্তকে দুইটী অন্ন প্রদান করিয়াও তাহাদের সাহায্য করিতে পারিব।"

বাণেশ্বরের পুত্রদর্শন আশা মনোমধ্যে আবার পুনরুদ্দিপ্ত হইল। তিনি অযোধ্যায় যাইতে সম্মত হইলেন। শ্রীনিবাস এবং বাণেশ্বর একত্র হইয়া অযোধ্যায় যাত্রা করিলেন।

ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

কুটিলতার প্রায়শ্চিত্ত।

কুটিলতা এবং কপটাচরণ সর্ব্বদাই মানুষকে কুপথে পরিচালন করে। অন্তরস্থিত কুটিলতানিবন্ধন মানুষের হিতাহিত এবং ন্যায় অন্যায় বিচারশক্তি একেবারে বিনষ্ট হয়। কুটিল মন সর্ব্বদাই অন্যের ব্যবহার এবং আচরণের

মধ্যে একটা না একটা দুরভিসন্ধি অনুসন্ধান করে, সুতরাং কুটিলের অনেক সময়েই বন্ধুকে শত্রু এবং শত্রুকে বন্ধু বলিয়া মনে হয়।

হৃদয়-স্থিত কুটিলতা নিবন্ধন বেনারসের রাজা চেৎসিংহ স্বীয় বিমাতা মহারাণী গোলাপকুমারীকে এবং জ্যেষ্ঠতাত পুত্র মনিয়ার সিংহকে এখনও শত্রু বলিয়া মনে করেন। গোলাপকুমারী কোন সৎপরামর্শ প্রদান করিলেও তিনি তাঁহাকে শত্রু মনে করিয়া, তাঁহার কোন উপদেশানুসারে কার্য্য করেন না।

পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, যে নবাব সুজা উদ্দৌলার মৃত্যুর পর ১৭৭৫ সালের মে মাসে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে যখন নবাব আসফ উদ্দোলার নূতন সন্ধি সংস্থাপন হয়, তখন চেৎসিংহের রাজ্য অযোধ্যার সুবেদারি হইতে পৃথক করা হয় এবং বেনারস গাজিপুর জৌনপুর প্রভৃতি প্রদেশ সুবে বাঙ্গালার অন্তর্ভূত করা হয়।

এই সময় দিল্লীর বাদসাহের কোন ক্ষমতা ছিল না। সুতরাং সুবে বাঙ্গালা, সুবে আউদ্ কেবল নাম মাত্রেই সুবে। দেশের প্রকৃত অবস্থানুসারে তখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীই সুবে বাঙ্গালার স্বাধীন রাজা। আর অযোধ্যার উজীরই সুবে অযোধ্যার রাজা।

চেৎসিংহের রাজ্য সুবে আউদ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, সুবে বাঙ্গালার অন্তর্ভূত করিবার প্রস্তাব হইলে পর, রাণী গোপালকুমারী চেৎসিংহকে এ প্রস্তাবে সম্মত হইতে নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন। রাণী বিশেষ করিয়া চেৎসিংহকে বুঝাইয়া বলিয়াছিলেন যে, বেনারাসের রাজগণ দিল্লীর বাদসাহকে কর প্রদান পূর্ব্বক চিরকাল রাজ্য ভোগ করিতেছেন। অযোধ্যার উজীরের সঙ্গে বেনারাসের রাজার পূর্ব্বে কোন সম্বন্ধ ছিল না। এখন অযোধ্যার উজীর কেবল দিল্লীর বাদসাহের প্রতিনিধি স্বরূপ বাদসাহের প্রাপ্য কর আদায় করিবার ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। উজীর নিজে বাদসাহের অধীনতা স্বীকার না করিলেও, বেনারসের রাজাকে মনে করিতে হইবে যে বাদসাহের প্রাপ্য কর উজীরের মারফতে আদায় হইতেছে। উজীরের কোন ক্ষমতা নাই যে তিনি এ রাজ্য অন্য কোন সুবাদারের হাতে অর্পণ করেন।

কিন্তু চেৎসিংহ রাণী গোলাপকুমারীর পরামর্শ শ্রবণ করিলেন না। তিনি মনে করিলেন যে রাণী গোলাপকুমারী তাঁহার শত্রু। তাঁহার মনে

আরও এক দুরভিসন্ধির উদয় হইল। কুটিল এবং নিস্তেজ মনে এইরূপ ভাবেরই উদয় হয়। তিনি মনে মনে আশা করিতে লাগিলেন যে, এই বন্দোবস্ত দ্বারা ভবিষ্যতে তিনি স্বাধীন রাজা হইতে পারিবেন। ইংরাজেরা বিদেশীয় লোক। বাণিজ্য করিতে এ দেশে আসিয়াছে। হয়তো কয়েক বৎসর পরে ইহারা চলিয়া যাইবে। এ দিকে দিল্লীর বাদসাহও ক্ষমতাশূন্য হইয়া পড়িয়াছেন। কেবল এক অযোধ্যার উজীরই তাঁহার উপর প্রভুত্ব করিতেছেন। সুতরাং উজীরের অধীনতা হইতে নিষ্কৃতি পাইলেই তিনি একেবারে স্বাধীন রাজা হইয়া পড়িবেন।

এই প্রকার বৃথা আশা দ্বারা প্রতারিত হইয়া চেৎসিংহ দিল্লীর বাদ্‌সাহের প্রাপ্য কর সুবে বাঙ্গালার দেওয়ান ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীকে দিতে সম্মত হইলেন।

চেৎসিংহের সঙ্গে কি প্রকার বন্দোবস্ত হইবে, সেই বিষয় লইয়া কলিকাতা কৌন্সিলে বাদানুবাদ হইতে লাগিল। কলিকাতা কৌন্সিলে সর্ব্ব-শুদ্ধ পাঁচজন মেম্বর। তন্মধ্যে গবর্ণর জেনেরেল ওয়ারেণ হেষ্টিংস সভাপতি। জেনেরেল ক্লেবারিং, কর্ণেল মন্‌সন্, রিচার্ড বারওয়েল এবং ফিলিপ ফ্রান্সিস্ এই চারিজন কৌন্সিলের মেম্বর।

কৌন্সিলের প্রথম প্রস্তাব হইল, চেৎসিংহের নিকট হইতে কোন কর গ্রহণ করা হইবে কি না।

এই প্রস্তাবে রিচার্ড বারওয়েল সাহেব বলিলেন, চেৎসিংহের নিকট হইতে কোন কর গ্রহণ করা উচিত নহে। চেৎসিংহের রাজ্য আমাদের রাজ্যের সংলগ্ন। তাঁহাকে মিত্র রাজা মনে করিয়া সর্ব্বদাই তাঁহার সঙ্গে বন্ধুভাব সংরক্ষণ করিতে হইবে। তাঁহার উপর কোন কর ধার্য্য করিলে তিনি কর প্রদানের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার নিমিত্ত আমাদিগের কোন শত্রুর সঙ্গে যোগ দিতে পারেন।

কিন্তু গবর্ণর জেনেরেল এবং কৌন্সিলের অন্য তিন জন মেম্বরের বারওয়েলের সঙ্গে ঐক্য হইল না। অধিকাংশের মতানুসারে স্থিরীকৃত হইল, যে চেৎসিংহের নিকট হইতে উজীর যে পরিমাণ কর গ্রহণ করিতেন, তদপেক্ষা তিন লক্ষ টাকা ন্যূন কর ধার্য্য করা হইবে। অধিকাংশের মতানুসারে ২২৬৬১৮০ বাইশ লক্ষ ছেষট্টী হাজার একশত আশী টাকা কর ধার্য্য করা হইল।

কিন্তু উজীরের আমলে নামেই কেবল পঁচিশ লক্ষ টাকা কর ধার্য্য ছিল।। চেৎসিংহকে বার্ষিক পাঁচ ছয় লক্ষের অধিক কর দিতে হইত না।

দ্বিতীয় প্রস্তাব—নূতন সন্ধিপত্রে এই প্রকার প্রতিজ্ঞা থাকিবে যে চেৎসিংহ আপন রাজ্যে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা সহকারে ক্ষমতা সঞ্চালন করিবেন। তাঁহার এই কর প্রদান ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধীনতা স্বীকার করিতে হইবে না। এই নির্দ্ধারিত করের অতিরিক্ত একটী পয়সাও তাঁহার নিকট দাবী করা যাইবে না।

এই প্রস্তাবে ফ্রান্সিস বলিলেন (Yes) হাঁ।

গবর্ণর জেনেরেল। (Yes) হাঁ।

বারওয়েল। (Yes) হাঁ।

জেনেরেল ক্লেবারিং বলিলেন, চেৎসিংহ নিয়মিত রূপে কর আদায় করিলেই সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকিবেন। কুর্ণেল মনসন এই প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন, ইহাতে কোম্পানীর কোন লাভ নাই। ইহাতে কোম্পানীর অধিকার এক প্রকার খর্ব্ব করা হইবে।

অধিকাংশের মতানুসারে স্থিরীকৃত হইল, চেৎসিংহ পূর্ণ স্বাধীনতা সহকারে স্বরাজ্যে আপন ক্ষমতা সঞ্চালন করিবেন। ইংরাজদিগকে কেবল তাহার নির্দ্দিষ্ট কর দিতে হইবে। ইংরাজেরা কোন কারণেই ভবিষ্যতে কখন তাহার কর বৃদ্ধি করিতে পারিবেন না, কিম্বা তাহার উপর অন্য কোন প্রকার দাবী দাওয়া করিতে পারিবেন না।

এই সকল প্রস্তাব স্থিরীকৃত হইলে পর চেৎসিংহ ইংরাজদিগকে কর প্রদান করিবেন বলিয়া এক কবুলনামা লিখিয়া দিলেন। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষে ইংরাজেরা অঙ্গীকার করিলেন যে চেৎসিংহের উপর তাঁহারা ভবিষ্যতে আর কোন দাবী করিতে পারিবেন না; চেৎসিংহের দেয় কর কখন বৃদ্ধি করিতে পারিবেন না।

১৭৭৫, ১৭৭৬, ১৭৭৭ এই তিন সনের দেয় কর চেৎসিংহ নিয়মিত রূপে প্রদান করিলেন। ১৭৭৮ সনে ইংরাজদিগের সঙ্গে ফরাশিদের যুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল। এই যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ গবর্ণর জেনেরেল ওয়ারেণ হেষ্টিংস চেৎসিংহের নিকট বার্ষিক আর অতিরিক্ত পাঁচলক্ষ টাকা দাবী করিলেন। পূর্ব্বোল্লিখিত সন্ধি অনুসারে ইংরাজদিগের এই প্রকার টাকা দাবী করিবার কোন ক্ষমতা ছিল না। কৌন্সিলের মেম্বর জেনেরেল

ক্লেবারিং এবং মন্‌সনের মৃত্যু হইয়াছে। ফ্রান্সিস্‌সাহেব এবং হুইলার সাহেব গবর্ণর জেনেরেলের এই অন্যায় দাবীতে সম্মতি প্রদান করিলেন না। কিন্তু এখন ওয়ারেণ হেষ্টিংসের মতানুসারেই কৌন্সিলের সকল কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে। ওয়ারেণ হেষ্টিংস এবং বারওয়েল সাহেব এক পক্ষ। হুইলার এবং ফ্রান্সিস অপর পক্ষ। সমানে সমানে মত ভেদ স্থলে সভাপতির মতানুসারেই কার্য্য হয়। হেষ্টিংসের মতই প্রবল হইল। চেৎসিংহের উপর অতিরিক্ত পাঁচলক্ষ টাকার দাবী হইল।

চেৎসিংহ টাকা দিতে প্রথমতঃ আপত্তি করিলেন। কিন্তু পরে ইংরাজদিগের ভয়ে অগত্যা কেবল এক বৎসরের নিমিত্ত পাঁচলক্ষ টাকা দিতে সম্মত হইলেন; এবং অবিলম্বে পাঁচলক্ষ টাকা ইংরাজদিগকে প্রদান করিলেন।

কিন্তু ওয়ারেণ হেষ্টিংস যে চেৎসিংহের সর্ব্বনাশ করিবার চক্রান্ত করিতেছেন, তাহা এখন পর্য্যন্ত চেৎসিংহ বুঝিতে পারেন নাই। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের পদত্যাগের ইস্তফা পত্র লইয়া যখন কলিকাতায় গোলযোগ হইয়াছিল, যখন ওয়ারেণ হেষ্টিংসকে পদচ্যুত করিয়া জেনেরেল ক্লেবারিং গবর্ণরের পদ গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখন চেৎসিংহের পক্ষ একজন লোক জেনেরেল ক্লেবারিংএর সাহায্যার্থ মুর্শিদাবাদ পর্য্যন্ত প্রেরিত হইয়াছিলেন। এই কথা ক্রমে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের কর্ণগোচর হইল। ওয়ারেণ হেষ্টিংস চেৎসিংহের সর্ব্বনাশ করিবেন বলিয়া, সেই সময় হইতে কৃত সংকল্প হইয়াছেন। কিন্তু ১৭৮১ সনের পূর্ব্বে তাঁহার এই দুরভিসন্ধি সংসাধনের সুযোগ উপস্থিত হইল না।

এদিকে ১৭৭৮ সনে চেৎসিংহ অতিরিক্ত পাঁচলক্ষ টাকা প্রদান করিয়া মনে মনে আশা করিলেন যে, ইংরাজেরা আর তাহার নিকট কোন অতিরিক্ত কর চাহিবেন না। কিন্তু ১৭৭৯ সনেও ওয়ারেণ হেষ্টিংস বার্ষিক অতিরিক্ত পাঁচ লক্ষ টাকা চাহিলেন।

চেৎসিংহের রাজ্যের মোট রাজস্ব চল্লিশ লক্ষ টাকা। ইহার মধ্যে প্রায় তেইশ লক্ষ টাকা ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীকে কর দিতে হয়, সুতরাং এই অতিরিক্ত পাঁচ লক্ষ টাকা তাঁহার আর দিবার সাধ্য নাই। তিনি অত্যন্ত বিনীতভাবে হেষ্টিংসের নিকট লিখিলেন যে তাঁহার এই অতিরিক্ত টাকা প্রদান করিবার সাধ্য একেবারেই নাই। হেষ্টিংস তাহার উপর কোপাবিষ্ট হইয়া লিখিলেন যে এ টাকা অবশ্য তাহাকে দিতে হইবে।

কাপুরুষ চেৎসিংহ গৃহের মণিমুক্তা বিক্রয় করিয়া ১৭৭৯ সনের বাবত আবার পাঁচলক্ষ টাকা দিলেন।

১৭৮০ সনে আবার চেৎসিংহের উপর পাঁচলক্ষ টাকার দাবী হইল। চেৎসিংহ কাতরে হেষ্টিংসকে আপন দুরবস্থার কথা জানাইলেন। কিন্তু হেষ্টিংস অবিলম্বে তাঁহাকে টাকা দিতে হুকুম করিয়া পাঠাইলেন। চেৎসিংহ অনন্যোপায় হইয়া এই অতিরিক্ত দাবী হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার নিমিত্ত হেষ্টিংসকে দুই লক্ষ টাকা উৎকোচ দিতে সম্মত হইলেন। হেষ্টিংস প্রথমতঃ উৎকোচ লইতে অসম্মত হইয়া, কেবল কোম্পানীর প্রাপ্য পাঁচলক্ষ টাকার দাবী করিলেন। তখন, চেৎসিংহ লিখিয়া পাঠাইলেন যে কিছু সময় প্রদান না করিলে টাকা সংগ্রহের উপায় নাই। হেষ্টিংস কৌন্সিলের পুস্তকে লিখিলেন যে চেৎসিংহ ইচ্ছা করিলে অনায়াসে টাকা দিতে পারে। অনতিবিলম্বে আমার পদচ্যুত হইবার সম্ভব আছে। কৌন্সিলের অপর দুইজন মেম্বর এই টাকা লইতে সম্মত নহে। এই সকল বিষয় জ্ঞাত হইয়াই চেৎসিংহ টাকা দিতে বিলম্ব করিতেছে। অতএব টাকা দিতে বিলম্ব করিবার নিমিত্ত চেৎসিংহের আর অতিরিক্ত একলক্ষ টাকা জরিমানা করা হউক। বেনারসের রেসিডেন্ট অবিলম্বে চেৎসিংহের নিকট হইতে এই টাকা আদায় করিবেন।

নির্ব্বোধ কাপুরুষ চেৎসিংহ অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলেন। আপনার স্ত্রী এবং জননীর গাত্রাভরণ বিক্রয় করিয়া,১৭৮০ সনের অতিরিক্ত পাঁচ লক্ষ টাকা এবং জরিমানার এক লক্ষ সমুদয়ই পরিশোধ করিলেন।

কিন্তু হেষ্টিংসের ন্যায় স্বার্থপর এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞান শূন্য লোক সংসারে অতি অল্পই পরিলক্ষিত হয়। দস্যুবৃত্তি অবলম্বী ওয়ারেণ হেংষ্টিংস চেৎসিংহের কেবল অর্থ শোষণ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। চেৎসিংহের উপর আবার ২০০০ দুই সহস্র অশ্বারোহী প্রদানের হুকুম জারি হইল। কৌন্সিলের অন্যতম মেম্বর ফ্রান্সিস এবং হুইলার সাহেব এইরূপ অন্যায় দাবী অনুমোদন করিলেন না। কিন্তু হেষ্টিংস এবং তাঁহার সহচর বারওয়েলের মতানুসারে এই দাবীও ন্যায় সঙ্গত বলিয়া সাব্যস্ত হইল।

চেৎসিংহের ১৩০০ তেরশতমাত্র অশ্বারোহী সেনা ছিল। তাহাদিগের এক এক দল সৈন্যকে রাজস্ব ইত্যাদি আদায় উপলক্ষে রাজ্যের স্থানে স্থানে রাখিতে হইত। চেৎসিংহ অগত্যা হেষ্টিংসের মনোরঞ্জনার্থ এক হাজার সৈন্য সংগ্রহ করিয়া রাখিলেন।

এই সময় কোম্পানীর ধনাগার প্রায় শূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। অনতিবিলম্বে এক কোটী টাকা সংগ্রহ করিতে না পারিলে রাজ্য রক্ষার উপায় নাই। হেষ্টিংস চেৎসিংহের ভীরুতা দর্শনে তাহার উপর আরও অত্যাচার করিতে উৎসাহিত হইলেন, এবং তাহার ধনাগার লুণ্ঠন করিবার দুরভিসন্ধি করিলেন। *

১৭৮১ সনের আগষ্ট মাসের প্রারম্ভে অর্থ সংগ্রহার্থ ওয়ারেণ হেষ্টিংস স্বয়ং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিলেন। অর্থসংগ্রহার্থ তিনি আপন মনে মনে যে সকল দুরভিসন্ধি করিয়াছিলেন, তাহা কৌন্সিলের অন্যান্য মেম্বরদিগের নিকট ব্যক্ত করিলেন না। কিন্তু উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থান কালে তিনি কৌন্সিলের পূর্ণ ক্ষমতা সহকারে একাকী সকল কার্য্য করিবার নিমিত্ত অন্যান্য মেম্বরের অনুমতি চাহিলেন। মেম্বরগণ তাহাকে অনুমতি প্রদান করিলেন।

১৪ই আগষ্টের পুর্ব্বেই তিনি বেনারসের প্রান্তে আসিয়া পৌছিলেন। চেৎসিংহ তাঁহার আগমন বার্ত্তা শ্রবনে সসৈন্যে আপন রাজ্যের প্রান্ত প্রদেশে যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কিন্তু অর্থগৃধ্নু নীচাশয় হেষ্টিংস চেৎসিংহকে সাদর সম্ভাষণ পর্য্যন্ত করিলেন না। এদিকে চেৎসিংহ দীনতা প্রদর্শনার্থ আপন উষ্ণীষ হেষ্টিংসের ক্রোড়ে রাখিয়া বলিতে লাগিলেন—

"আমার যদি কোন অপরাধ হইয়া থাকে, আমাকে ক্ষমা করুন। আমার এ রাজ্য এবং ধন সম্পত্তি সকলই আমি আপনার হাতে সমর্পন করিতেছি।"

হীনবুদ্ধি চেৎসিংহ এখনও বুঝিতে পারেন নাই যে, ইংরাজ হৃদয় দয়া পরিশূন্য। ইহাদিগের নিকট বিনয় এবং সৌজন্য প্রদর্শন করিলে ইহারা শত গুণে অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে। একমাত্র পাশব বলই ইহাদিগকে অন্যায়াচরণ হইতে বিরত রাখিতে পারে।

চেৎসিংহ প্রায় নিরাশ হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এদিকে হেষ্টিংস তৎপরদিবস প্রাতে বেনারসে পৌছিয়া মাধব দাসের উদ্যানে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

---

* হেষ্টিংস আত্ম সমর্থনার্থ যে মিনিট লিখিয়াছিলেন তাহাতে তিনি নিজ মুখে স্বীকার করিয়াছেন I was resolved to draw from his guilt the means of relief to the Company's distress

চেৎসিংহ আবার হেষ্টিংসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত হেষ্টিংসের অনুমতি চাহিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু হেষ্টিংস সাক্ষাৎ করিতে আসিতে তাঁহাকে অনুমতি দিলেন না। চেৎসিংহ এখন বুঝিলেন যে নিশ্চয়ই হেষ্টিংস তাহার রাজ্য নষ্ট করিতে কৃত সংকল্প হইয়াছেন। সুতরাং বিশ লক্ষ টাকা ইংরাজি কিম্পকে দিবার প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। এপর্য্যন্ত হেষ্টিংস চেৎসিংহের কোন কথার প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেন না। কিন্তু এখন টাকা প্রদানের প্রস্তাব শ্রবণে বলিয়া পাঠাইলেন যে, পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকার করিলে চেৎসিংহের সকল অপরাধ মার্জ্জনা করা হইবে। রাজ্যের কতকাংশ বিক্রয় না করিয়া আর চেৎসিংহের পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দিবার সাধ্য নাই। সুতরাং তিনি নিরুপায় হইয়া নির্ব্বাক রহিলেন।

পরদিবস হেষ্টিংসের আদেশানুসারে বেনারসের রেসিডেণ্ট চেৎসিংহের নিকট যাইয়া তাঁহাকে ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কিন্তু চেৎসিংহের আর টাকা দিবার সাধ্য নাই। ভয় প্রদর্শনে কোন ফল হইল না। হেষ্টিংস তৎপর দিবস চেৎসিংহকে তাহার বারানসীর বাড়ীতে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিবার নিমিত্ত মার্কহ্যাম সাহেবকে কয়েকজন সৈন্য সহ প্রেরণ করিলেন। মার্কহ্যাম সাহেব চেৎসিংহের নিজের ভৃত্য এবং সিপাহীদিগকে তাড়াইয়া দিয়া চেৎসিংহকে কয়েদ করিলেন।

পাঠক ও পাঠিকা চেৎসিংহের এই দুরবস্থার কথা শুনিয়া মনে করিবেন যে বেনারাসের মহারাজ চেৎসিংহ এতাদৃশ ভীরুতা প্রদর্শন করিলেন কেন? তিনি মনে করিলে তৎক্ষণাৎ হেষ্টিংসের শিরশ্ছেদন করিতে পারিতেন। এ অপমান কেবল কুটিলতার প্রায়শ্চিত্ত। কুটিলহৃদয় চেৎসিংহ সর্ব্বদাই মনে করেন যে ইংরাজদিগের সাহায্য না পাইলে হয়তো রাণী গোলাপ কুমারী কিম্বা মনিয়ার সিংহ তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিবেন। কিন্তু ধিক্ চেৎসিংহের রাজপদ, ধিক্ তাহার জীবন। চেৎসিংহ একবার চিন্তা করিল না যে এই নীচাশয় বিদেশীয় বণিকের হস্তে অপমানিত হওয়া অপেক্ষা আপন বিমাতা কিম্বা জ্যেষ্ঠতাত পুত্র মনিয়ারসিংহ কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হওয়াও শ্রেয়ঃ।

চেৎসিংহ আপন হৃদয়স্থিত কুটিলতা নিবন্ধন রাণী গোলাপকুমারী এবং মনিয়ার সিংহকে শত্রু বলিয়া মনে করিতেন। এ সংসারে কুটিলতার প্রায়শ্চিত্ত এই প্রকারেই হয়। আজ চেৎসিংহের কুটিলতার প্রায়শ্চিত্ত হইল।

একত্রিংশত্তম অধ্যায়।

কাপুরুষতা।

হৃদয়স্থিত কুটিলতা এবং স্বার্থপরতাই কাপুরুষতা উৎপাদন করে। বীরোচিত হৃদয়ে কুটিলতা এবং স্বার্থপরতা প্রবেশ করিতে পারেনা; সুতরাং বীরের হৃদয়ে কাপুরুষতার বিন্দুমাত্রও পরিলক্ষিত হয় না। আজ হৃদয়স্থিত কুটিলতা নিবন্ধন চেৎসিংহ কারারুদ্ধ হইলেন। কিন্তু কাপুরুষতার প্রয়শ্চিত্ত এখনও হয় নাই।

বেনারাসের অধিপতি চেৎসিংহ সর্ব্বজন-ঘৃণিত ফিরিঙ্গীদিগের কর্তৃক কারারুদ্ধ হইয়াছেন এই কথা সর্ব্বত্র প্রচার হইবামাত্র, ঘরে ঘরে হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। মনিয়ার সিংহ তাঁহার উদ্ধারার্থ রামনগরে সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

মহারাজা বলবন্ত সিংহের প্রতি প্রজা সাধারণের অত্যন্ত ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল। বলবন্ত সিংহের রাজত্ব কালে প্রজাগণ পরম সুখে কাল যাপন করিত। * চেৎসিংহও প্রজাদিগের উপর কখনও অত্যাচার করিতেন না। সুতরাং; প্রজাগণ চেৎসিংহের নিমিত্ত অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

---

* বলবন্ত সিংহের রাজত্বকালে যে প্রজাগণ পরম সুখে ছিল তাহা কাপ্তেন হার্পার (Captain Harper) সাহেবের সাক্ষ্য দ্বারাই প্রতিপন্ন হয়। হার্পার সাহেব সিলেক্ট কমিটীতে আপন জবানবন্দীতে বলেন The provinces of Beneras and Gazipoor were more highly cultivated, compared with those parts of Behar (situated within the British territory). He (Captain Harper) attributed this comparative prosperity of those provinces to the more secure and lenient Government they lived under.

কিন্তু আমাদের স্বদেশীয় একজন বাঙ্গালী লিখিয়াছেন যে বলবন্ত সিংহের সময় প্রজাগণ বড় কষ্টে ছিল। এই বাঙ্গালী বাবু উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থান করেন। হিন্দি ভাষাতে ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার লিখিত পুস্তক কেহ পাঠ করে না বলিয়াই ইতিহাস লিখিবার উদ্যম পরিত্যাগ করিতে হইল। পাঠকদিগের জ্ঞাতার্থে এই বাঙ্গালী বাবুর লেখনীপ্রসূত কথা কয়েকটা এই স্থানে উদ্ধৃত করিতেছি। আবুতালিব পারস্য ভাষায় লিখিত তাঁহার অযোধ্যার ইতিহাসে কর্ণেল হ্যানেকে পর্য্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন। পাঠক দেখিবেন যে এই বাঙ্গালী বাবুও একজন হিন্দু আবুতালিব। বাঙ্গালী বাবু বলেন— "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে অধিকার হোনে কে পহিলে বনারস কী জো অবস্থা থী উসে বর্ত্তমান কী অবস্থা কে সাথ মিলাকর দেখনেসে ব্রিটিস অধিকার সে ইসকা কাহাতক উপকার

লোক পরম্পরায় রাণী গোলাপকুমারী শুনিলেন যে চেৎসিংহকে ইংরাজেরা কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। চেৎসিহের ভৃত্যগণও তাঁহার নিকট যাইতে পারে না। গোলাপকুমারী এখনও চেৎসিংহকে আপন গর্ভজাত সন্তানের ন্যায় স্নেহ করেন। চেৎসিংহ কি অবস্থায় আছেন, তাহা জানিয়া আসিবার নিমিত্ত নিজের একজন ভৃত্যকে চেৎসিংহের বারানসীর প্রাসাদে প্রেরণ করিলেন। ভৃত্য দুই প্রহরের কিছুকাল পরে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বলিল যে, ইংরাজদিগের সৈন্যগণ তাহাকে রাজবাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে দিল না; সে চেৎসিংহকে দেখিতে পায় নাই।

এই সময় মহাবীর সিংহ গোরকপুর হইতে কাশীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। ভৃত্য রাজবাটীতে প্রবেশ করিতে পারে নাই শুনিয়া মহাবীর রাণীকে বলিলেন, "মা আপনি আজ্ঞা করিলে আমি যাইয়া মহারাজের তত্ত্ব লইয়া আসিতে পারি।"

রাণী বলিলেন, "বাছা তুমি বড় কলহপ্রিয়। সহজে লোকের সঙ্গে তোমার বিবাদ হয়। কিন্তু সাবধান কাহারও সঙ্গে বিবাদ করিবেনা। শুদ্ধ কেবল দেখিয়া চলিয়া আসিবে রাজপুত্রকে কি অবস্থায় রাখিয়াছে।"

মহাবীর বিশেষ উৎসাহ সহকারে চেৎসিংহের প্রাসাদে চলিলেন। রাজবাড়ীর সমুদয় সিপাহী, পাহারাওয়ালা এবং ভৃত্য বাহির বাড়ী বসিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে। রামনগর হইতে রাজার অনেকানেক কর্ম্মচারী এবং সিপাহী আসিয়া বিড়াল কুকুরের ন্যায় বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে। রাজবাড়ীর দ্বারে এক জন ইংরাজ কাপ্তান এবং তিন চারিজন গোরা, চারি পাঁচ জন সিপাহী বন্দুক হাতে করিয়া দ্বার রক্ষা করিতেছে।

মহাবীর দ্বারে আসিয়া কাপ্তেনের নিকট বলিলেন, "আমি বাড়ীর মধ্যে যাইব। আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে।"

কাপ্তান সগর্ব্বে বলিয়া উঠিল, "বাড়ীর মধ্যে যাইবার হুকুম নাই। চলিয়া যাও।"

হুঁরা হৈ প্রত্যক্ষ বোধহোতা হৈ। রাজা বলবন্ত সিংহ আউর রাজা চেৎসিংহ কী আমলদারিমে বনারসমে কুছ আইন বা কানুন জারী ন থা।

কিন্তু অনেকানেক আইন কানুন দ্বারা যে দেশের দরিদ্রতা বৃদ্ধি হইতেছে তাহা বাঙ্গালী বাবু বুঝিতে পারেন না।

মহাবীর। মহারাজ চেৎসিংহ কিরূপ অবস্থায় আছেন, তাহাই কেবল দেখিয়া যাইব। আমার আর কোন উদ্দেশ্য নাই।

কাপ্তেন। তুমি চলিয়া যাও। ভিতরে যাইতে পারিবে না।

মহাবীর। রাণীমার হুকুম আমাকে অবশ্য পালন করিতে হইবে। পথ ছাড়িয়া দেও।

মহাবীর এই কথা বলিবামাত্রই কাপ্তান সক্রোধে মহাবীরকে এক চপটাঘাত করিল।

চপটাঘাত প্রাপ্তিমাত্র মহাবীর, "শালা ফিরিঙ্গী" এই বলিয়াই কাপ্তেনের হাতের বন্দুকটী দক্ষিণ হস্ত দ্বারা কাড়িয়া লইয়া, বাম হস্ত দ্বারা তাহার ঘাড় ধরিয়া টানিয়া দ্বারের বাহির করিল। অন্য এক জন সিপাহী তখন অগ্রসর হইয়া মহাবীরকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়িল। কিন্তু গোলযোগ নিবন্ধন গুলি মহাবীরের গাত্র স্পর্শ করিল না। মহাবীর তখন তাড়াতাড়ি নিজের হাতের বন্দুক সিপাহীর কপালে লাগাইয়া তাহাকে এক গুলিতেই ধরাশায়ী করিলেন। এদিকে তিন পদাঘাতে কাপ্তেনের মস্তক একবারে চূর্ণ করিলেন।

এই বিবাদ দেখিয়া চতুর্দ্দিগ হইতে লোক দৌড়াইয়া আসিতে লাগিল। সকলের মুখেই "মার ডালো শালা ফিরিঙ্গী লোককো" "মার ডালো শালা ফিরিঙ্গী লোককো" এই শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। ক্রমে দুই তিন শত লোক একত্র হইয়া যে কয়েক জন ইংরাজ সৈন্য সেখানে ছিল, তাহাদের সকলেরই প্রাণ সংহার করিল। এক জন ইংরাজ সৈন্যও প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে সমর্থ হইল না। রেসিডেণ্ট হেষ্টিংসের নিকট এই গোলযোগের সংবাদ পাঠাইলেন। কিন্তু রেসিডেণ্টের পত্র প্রাপ্তির পূর্ব্বেই হেষ্টিংস লোক পরাম্পরায় শুনিলেন যে চেৎসিংহকে তাহার প্রজাগণ কারামুক্ত করিয়াছে, সমুদয় ইংরাজ সৈন্যের প্রাণ বিনাশ করিয়াছে, এবং তাঁহার শিরশ্ছেদনার্থ সেই সকল সৈন্য মাধব দাসের বাগানে আসিতেছে।

হেষ্টিংস বারাণসীতে এখনও মাধবদাসের উদ্যানেই অবস্থান করেন। সৈন্যগণ তাঁহাকে ধৃত করিতে আসিতেছে শুনিয়া, তিনি তৎক্ষণাৎ বেনারস হইতে পলায়ন করিবার নিমিত্ত আপন শরীর রক্ষক বলভদ্রসিংহ জমাদারকে হস্তী এবং অশ্ব আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন।

এদিকে বেলা প্রায় অবসান হইয়াছে। তাঁহার আহারের সময় উপস্থিত,

আহার্য্যদ্রব্য সমুদয়ই প্রস্তুত। সেলামত আলি খানসামা টেবিলের উপর কাপড় বিছাইতেছে। রেস্ফত্ আলি খানসামা গরম কাবাব এবং মুরগীর রোষ্ট হস্তে করিয়া টেবিলের নিকট দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। হেষ্টিংস পায়জামা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সায়ংকালিক পরিচ্ছদ পরিধান করিতেছেন। কামিজটী মাত্র পরিধান করিয়াছেন, পেণ্টালুনের বোতাম লাগাইতেছেন, এখন পর্য্যন্তও কোট পরিধান করেন নাই। এই সময় বলভদ্রসিংহ জমাদার বাহির হইতে চীৎকার করিয়া বলিল—

"হাত্তীকা পর হাওদা, ঘোড়েকা পর জীন্। জল্দি আও জল্দি আও ওয়ারেণ হেষ্টিং।"

বলভদ্রসিংহ বাহির হইতে এই কথা বলিবামাত্র হেষ্টিংস মনে করিলেন যে, হয়ত চেৎসিংহের সৈন্যগণ তাঁহার বাসস্থানের নিকটে আসিয়া পৌছিয়াছে। তাঁহার আর কোট পরিধান করিবার সময় হইল না। পরিধানে কেবল এক কামিজ এবং পেণ্টালুন। পায় মোজা কি বুট কিছুই নাই। শুদ্ধ কেবল বামপদে একখানি স্লিপার (চটী জুতা)। ওয়ারেণ্ হেষ্টিংস ঊর্দ্ধশ্বাসে গৃহের বাহির হইয়া অশ্বারোহণ করিলেন। "বল বড্রো—হাটী—মাল—কাণ্টু বাবু" এই বলিয়াই অশ্বপৃষ্ঠে চুনারের কেল্লার দিকে ধাবিত হইলেন।

"বলবড্রো—হাটী—মাল—কাণ্টু বাবু" এই কথার অর্থ বোধ হয় পাঠকগণ সহজে বুঝিতে পারিবেন না।

"বলভদ্র তুমি এবং কান্তবাবু মালামাল সঙ্গে করিয়া এই হস্তী আরোহণে যাইবে," এই কথাই হেষ্টিংসের বলিবার অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু এত কথা বলিবার অবকাশ নাই। সুতরাং 'বলবড্রো—হাটী—মাল কাণ্টু বাবু' বলিয়াই চলিয়া গেলেন।

সেলামত আলি এবং রেস্ফত আলি খানসামা অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে অশ্বসহ হেষ্টিংস দৃষ্টির বহির্ভূত হইলেন। বলভদ্র সিংহ কান্ত পোদ্দারের অন্বেষণে রেসিডেন্সিতে চলিয়া গেল। সেলামত আলি এবং রেস্ফত্ আলি টেবিলের উপর কাবাব এবং রোষ্ট রাখিয়া চেয়ারে বসিয়া আজ আহার্য্য দ্রব্যের যথোচিত সদ্ব্যবহার করিতে লাগিল।

এদিকে বলভদ্র সিংহ জমাদার মাধব দাসের উদ্যান হইতে

রেসিডেন্সিতে * আসিয়া কান্ত পোদ্দারের অনুসন্ধান করিতে লাগিল। রেসিডেন্সির লোকেরা বলিল কান্ত বাবুকে রাজা চেৎসিংহ ডাকাইয়া লইয়া গিয়াছেন। কান্ত বাবু রামনগর গিয়াছেন।

কাপুরুষ চেৎসিংহ কারামুক্ত হইবার পর গঙ্গা পার হইয়া, রামনগর চলিয়া গেলেন। মনিয়ার সিংহ তাহার উদ্ধারার্থ সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। এবং অত্যন্ত বিনীতভাবে রেসিডেন্টের নিকট বলিয়া পাঠাইলেন যে, এ গোলযোগ তাহার ইচ্ছানুসারে হয় নাই। তিনি এ গোলযোগের বিন্দু বিসর্গও জানেন না। তিনি এখনও আপনাকে বন্দী স্বরূপ মনে করেন। রেসিডেণ্ট চেৎসিংহের কথায় কোন প্রত্যুত্তর করিলেন না। তখন চেৎসিংহ রেসিডেন্সি হইতে কান্ত পোদ্দারকে ডাকাইয়া আনিলেন। কান্তের হাত ধরিয়া বলিতে লাগিলেন, "আপনি আমাকে রক্ষা করুন। হেষ্টিংস সাহেবকে বলিয়া কহিয়া আমাকে উদ্ধার করুন।"

কান্ত পোদ্দারের স্বভাব প্রকৃতি চেৎসিংহের অবিদিত ছিল না। জলপানির বাবত কিছু হাতে না পড়িলে কান্ত কোন বিষয়ে বড় মনোযোগ করিতেন না। কিন্তু চেৎসিংহের নগদ টাকা ঘরে নাই। আপন স্ত্রীর গাত্রাভরণ হইতে দুইটী বহুমূল্য মুক্তা † আনিয়া নজর স্বরূপ কান্তের হস্তে প্রদান করিলেন। হায় কি কাপুরুষতা! বানারসের মহারাজ আজ কান্ত পোদ্দারকে উৎকোচ প্রদান করিতেছেন। চেৎসিংহের এই কাপুরুষতা দেখিয়া মনিয়ার সিংহ তাহার সংসর্গ একেবারে পরিত্যাগ করিলেন। কান্তকে ডাকাইয়া আনিবার পূর্ব্বে মনিয়ার সিংহ হেষ্টিংসকে গ্রেপ্তার করিবার নিমিত্ত চেৎসিংহকে পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু চেৎসিংহ তাহার কথা শুনিলেন না।

কান্ত পোদ্দার চেৎসিংহের নিকট হইতে এই বহু মূল্য মুক্তা লাভ করিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইল। "আমার চেষ্টার কোন ত্রুটী হইবে না।" এই

---

* ইংরাজদের রেসিডেণ্ট সাহেব যে বাড়ীতে থাকেন তাহাকে রেসিডেন্সি বলে।

† কান্ত পোদ্দার বানারস হইতে যে সকল মুক্তা ও হীরক আনিয়াছিল তৎসমুদয় মহারাজ কৃষ্ণনাথের আত্মহত্যার পর ইষ্ট কোম্পানী কর্ত্তৃক ক্রোক হইয়াছিল। মহারাণী স্বর্ণময়ী বিলাত আপীলে মোকদ্দমায় জয়লাভ করিয়া ঐ সকল অমূল্য মুক্তা পুনঃপ্রাপ্ত হয়েন।

বলিয়া বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক দ্বারে আসিবা মাত্রই বলভদ্র সিংহের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইল।

বলভদ্র বলিল "পোদ্দার, তোমাকে শীঘ্র শীঘ্র সাহেবের মালামাল সহ চুনারে যাইতে হইবে। সাহেব কেবল এক কামিজ আর এক পেণ্টালুন পরিয়া চলিয়া গিয়াছেন। আমাকেও তোমার সঙ্গে যাইতে বলিয়া গিয়াছেন।"

কান্তপোদ্দার বলভদ্রের কথা শুনিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "একি বিপদ ? এখন এখানে থাকিয়া এক এক বার চেৎসিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেই কিছু না কিছু লাভ হইবে। এই সময় চুনারে যাইতে হইলে তো সর্ব্বনাশ। এখন যদি ইহাদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ হয় তাহাতেই বা আমার ভয় কি। আমি মুদি পোদ্দার লোক। যুদ্ধের নাম শুনিলে পূর্ব্বদিনই যুদ্ধক্ষেত্র হইতে তিন ক্রোশ দূরে যাইয়া পালাইয়া থাকিব। সে কামানের হুরুম হুরুম শব্দ আমার কাণেও প্রবেশ করিবে না।"

প্রকাশ্যে কান্ত বলিলেন, "বলভদ্র, আজ আর এ অন্ধকার রাত্রে কোথায় যাইব। আমরা বিদেশী লোক, রাস্তা ঘাট চিনি না। যাহা হয় কাল পরামর্শ করিয়া স্থির করিব।

বলভদ্র। তুমি তো আচ্ছা আদ্‌মি। সাহেব আহার না করিয়া এক কামিজ এক পেণ্টালুন পরিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তুমি কাল পারামর্শ করিবে, এখনই চল্।

কান্ত। বাছা, বলভদ্র এ বিপদের সময় এত চটা চটি করা উচিত নহে। আমি বুড়া মানুষ। কোন বিষয়ের অগ্র পশ্চাৎ না দেখিয়া কাজ করি না। তোমার কোন ভয় নাই। কান্ত পোদ্দার জীবিত থাকিতে সাহেবের কি করিতে পারে ? কাল আমি চলিয়া যাইব।

বলভদ্র। সাহেবের সঙ্গে এক খানি বই কাপড় নাই। তুমি এখনই চল। আর বিলম্ব করা যায় না।

কান্ত। বাছা, তুমিও হিন্দুর সন্তান আমিও হিন্দু। এই তীর্থস্থানে আসিয়াছি ; এখানে তিন রাত্র বাস না করিয়া কেমন করিয়া চলিয়া যাইব। সাহেব লোকের তো আর পূজা আহ্নিক নাই। এক কাপড়ে দশ দিন চলিবে। কাপড় ছাড়িয়া লেঙ্গটা হইয়া সাহেব লোক স্নান করে। আমি কাল প্রাতে একবার গঙ্গাস্নান করিয়া, না হয় প্রত্যুষে দুইটা ভাতে ভাত খাইয়া চলিয়া যাইব।

বলভদ্র। তুমি মজার লোক। কালও আবার ভাতে ভাত। যে মনিবের লবণ খাইতেছ, তাহার আহার হইল না। তুমি আবার কালও ভাতে ভাত!

কান্ত। বাছা, স্থির হও, তোমার ভয় নাই। সাহেবের কোন কষ্টের কথা শুনিলে আমার বুক ফাটিয়া যায়। সাহেবের যাহাতে কষ্ট না হয় তাহার চেষ্টা আমি কাল করিব।

বলভদ্র সিংহ দেখিল যে কান্ত পোদ্দার একান্তই রাত্রে যাইতে সম্মত হইল না। সে তখন মাধব দাসের বাগানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, সেলামত আলি এবং রেসফত আলিকে বলিল যে, তোমরা দুইজন এই হাতীতে চড়িয়া সাহেবের কাপড় এবং খানা সঙ্গে করিয়া চলিয়া যাও। সাহেব রাস্তায় অবশ্য বিশ্রাম করিবেন। পথে কোন আড্ডায় দেখা হইলে সাহেবকে বলিয়া কহিয়া খাওয়াইবে। মনিবের যাহাতে কষ্ট না হয় তাহাই করিবে। আমি কান্ত পোদ্দারকে সঙ্গে করিয়া কাল চলিয়া যাইব।

যে আহার্য্য দ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা সেলামত আলি এবং রেস্‌ফত্ আলির উদরস্থ হইয়াছে। তাহারা এখন দুইজনে সজল নয়নে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বলিল, "সোবান আল্লা! জমাদার সাহেব, আমাদের কি সেই অন্যান্য খান্‌সামার ন্যায় মনে করেন। আপন মনিবের জন্য এ জান দিতে পারি। আজ সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া ভাল খানা তৈয়ার করিয়াছিলাম। সাহেব যখন খানা না খাইয়া চলিয়া গেলেন, তখন দেলটার মধ্যে বড় ক্ষোভ হইল। ঐ খানা কি আর সাম্‌নে রাখিয়া দেখ্‌তে ইচ্ছা হয়। পাতকুয়ার মধ্যে তখনই সব ফেলিয়া দিয়াছি। আপনি তবে আর দুইটা টাকা দিন্। এখনই এক ঘণ্টার মধ্যে দুইটা মুরগীর রোষ্ট তৈয়ার হইবে। তাই সঙ্গে করিয়া চলিয়া যাইব।

বলভদ্র সিংহ একজন রাজপুত সিপাহী। প্রভুভক্তি ইহাদের জাতীয় স্বভাব। সেলামত আলি এবং রেসফত আলির সকল কথাই সে বুঝিতে পারিল। কিন্তু এখন আর কি করিবে। সন্ধ্যাকালে হেষ্টিংস অশ্বারোহণে চলিয়া গিয়াছেন। এখন রাত্রি প্রায় দুই প্রহর হইয়াছে। এখন খানা প্রস্তুত করিয়া চলিয়া যাইতে হইলে হেষ্টিংসের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবার সম্ভব নাই। সুতরাং পরদিন সকলে একত্রে যাইবে বলিয়াই স্থির করিল।

এদিকে ওয়ারেণ হেষ্টিংস এক কামিজ আর এক পেণ্টুলন পরিধান করিয়া বায়ুবেগে অশ্ব পৃষ্ঠে ধাবিত হইয়াছেন। তাহার কোট এবং বুট

পরিধান করিবার সুযোগ ছিল না। কিন্তু হাতের কাছে টুপী ছিল। সেই হ্যাট মাথায় দিয়া চলিতেছেন। পদদ্বয় জুতা শূন্য। প্রথম রাত্রে অন্ধকার ছিল। জ্যোৎস্না উঠিবামাত্র তদবস্থাপন্ন হেষ্টিংসকে গ্রাম্য লোকেরা দেখিবামাত্রই "বিলাতি ভূত" "বিলাতি ভূত" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতে লাগিল।

একজন হীনবুদ্ধি কৃষক ক্ষেত্র হইতে এক বোঝা খড় মাথায় করিয়া আপন গৃহাভিমুখে চলিয়াছে। সে আপন পশ্চাতে অশ্বের পদশব্দ শুনিয়া পিছের দিগে চাহিবা মাত্রই হেষ্টিংসকে দেখিতে পাইল। তদবস্থাপন্ন হেষ্টিংসকে দেখিবামাত্রই মাথার বোঝা ভূমিতলে ফেলিয়া, "বাবারে ভূত" ভূত" এইরূপ চীৎকার করিতে করিতে আপন গৃহে পৌঁছিয়াই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। তাহার স্ত্রী পুত্র এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা এক ঘণ্টার মধ্যেও তাহাকে আর চেতন করিতে পারিলেন না। তখন গ্রাম্য ওঝাকে ডাকিয়া আনিল। ওঝা অনেক মন্ত্র পাঠ করিয়া তাহাকে জাগ্রত করিল।

ওঝা ব্রাহ্মণ ছিল। বেনারস এবং মৃজাপুর প্রভৃতি অঞ্চলের ব্রাহ্মণকে মহারাজ বলে। কৃষকের স্ত্রী ওঝাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাজ সত্যই ইঁহাকে ভূতে পাইয়াছিল নাকি?"

ওঝা বলিল "বাছা, ভূত ওকথা আর মুখেও আনিবে না। একটা শুদ্ধ বিলাতি ভূত? আজ আমাদের মহারাজ চেৎসিংহ যুদ্ধ করিয়া একশত ফিরিঙ্গীর মাথা কাটিয়াছেন। ফিরিঙ্গী কাশীতে মরিলে তো আর সেখানে থাকিতে পারে না। হিন্দু মরিলে শিব হয়। ফিরিঙ্গী কাশীতে মরিলে তৎক্ষণাৎ ভূত হইয়া মক্কার দিকে চলিয়া যায়। আজ কাল তোমরা সকলেই ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া, ঘরের মধ্যে বসিয়া থাক। এক শত ভূত মক্কার দিকে ছুটিয়াছে।"

গ্রামের মধ্যে ওঝার এই কথা সর্ব্বত্র প্রচার হইবামাত্র তিন দিনের মধ্যে আর গ্রাম্য কৃষক ঘরের বাহির হইল না। অশ্বের পদশব্দ শুনিলেই সকলে ঘরের দরজা বন্ধ করিত। তিন দিন এক ক্রমে সমুদয় কৃষকের কাজ কর্ম্ম বন্ধ রহিল।

হেষ্টিংস আসিয়া চুনারে পৌঁছিলেন। এদিকে দুই দিনের মধ্যেও কান্ত পোদ্দার মালামাল সহ পৌঁছিল না। হেষ্টিংস মহা বিপদে পড়িলেন। তাঁহার সঙ্গে দুই হাজার টাকা মাত্র ছিল। তাহাও কান্ত পোদ্দারের

নিকট রহিয়াছে। চুনারে ইংরাজদিগের যে সকল লোক ছিল, তাহা-দিগের এক একজনকে পত্রসহ স্থানে স্থানে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। অযোধ্যার রেসিডেণ্ট * মিডলটন সাহেবকে, গোরকপুরে কর্ণেল হ্যানকে, কানপুরে মরগ্যানকে সসৈন্যে অবিলম্বে বানারসে আসিতে পত্র লিখিলেন। এবার হেষ্টিংসের এই অবিমৃষ্যকারিতা নিবন্ধন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্ব নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইত। কিন্তু একমাত্র চেৎসিংহের কাপুরুষতাই কোম্পানীর রাজত্ব চিরস্থায়ী করিল।

—:০*০:—

দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায়।

কাপুরুষতার প্রায়শ্চিত্ত।

বারাণসীর এই গোলযোগ উপলক্ষে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্ব একেবারে সমূলে উৎসন্ন হইবার উপক্রম হইল। অযোধ্যার প্রত্যেক জেলার প্রজাগণ ইংরাজ কলেক্টরদিগের অত্যাচারে নিপীড়িত হইয়া ইংরাজদিগকে দেশ বহিষ্কৃত করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু মুস্তফা খাঁ প্রভৃতির মৃত্যু হইয়াছে বলিয়াই তাঁহারা নেতা এবং পরিচালক শূন্য হইয়া পড়িয়াছে। নেতা বিহীনে কোন কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারে না। কাশী অঞ্চলের সমুদয় প্রজা চেৎসিংহের অপমানের কথা শুনিয়া স্থানে স্থানে দলবদ্ধ হইতেছে। এতদ্ভিন্ন ইংরাজদিগের আপন অধি-কারের মধ্যে বেহার অঞ্চলের সমুদয় প্রজা চেৎসিংহের সাহায্য করিবে বলিয়া দলে দলে বানারসে আসিতেছে। ওয়ারেণ হেষ্টিংস উৎকোচের প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ হইয়া, সিতাব রায়ের পুত্র কল্যাণ সিংহের নিকট বেহার অঞ্চল ইজারা দিয়াছিলেন। কল্যাণসিংহের অত্যা-চারে বেহার অঞ্চলের প্রজাগণও বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে। নেতা পাইলেই তাহারা সংগ্রাম ক্ষেত্রে অগ্রসর হয়। এ দিকে বঙ্গদেশেও রঙ্গপুর দিনাজপুর এবং পুর্ণিয়ার বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

---

* ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ব্রিষ্টো সাহেবকে পদচ্যুত করিয়া হেষ্টিংস আবার মিডলটনকে অযোধ্যার রেসিডেণ্টের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

ইংরাজি ইতিহাস লেখকগণ বলেন যে ওয়ারেণ হেষ্টিংসই ভারতবর্ষে ইংরাজ রাজত্ব সংস্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু এটী তাঁহাদের স্পষ্ট ভ্রম। বরং ওয়ারেণ হেষ্টিংসের দস্যুবৃত্তি নিবন্ধন সময়ে সময়ে ইংরাজ রাজত্ব সমূলে বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছিল।

বারাণসীর গোলযোগের পর চতুর্দ্দিক হইতে এই প্রকার যুদ্ধার্থী-দিগকে বারাণসীতে সমবেত হইতে দেখিয়া মহাবীর সিংহ মনে মনে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। অন্যূন প্রায় পনের হাজার লোক একত্রিত হইল। ইহার মধ্যে অধিকাংশ লোকই বেহার অঞ্চলবাসী ছিল। মহাবীর মনে করিলেন যে এই বার পূর্ব্ব পুরুষের ভ্রম সংশোধন করিবেন।

মহাবীর ইহাদিগকে সঙ্গে করিয়া চেৎসিংহের নিকট গমন করিলেন। কিন্তু চেৎসিংহ ইংরাজদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তিনি এখনও রেসিডেণ্টের নিকট যাইয়া দিন দিন ক্ষমা প্রার্থনা করিতে-ছেন। এখনও বলিতেছেন "আমার রাজত্ব ধন সম্পত্তি সকলই আপনাদের হস্তে সমর্পণ করিতেছি, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।"

রেসিডেণ্ট চেৎসিংহের প্রস্তাব ও কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া হাঁ, না কিছুই বলিতে পারিলেন না। হেষ্টিংস সন্ধি করিবেন কি যুদ্ধ করিবেন তৎসম্বন্ধে তিনি কিছুই জানিতেন না।

চেৎসিংহ মনে মনে আশা করিতে লাগিলেন যে কান্ত পোদ্দারকে তিনি অনেক মণি মুক্তা প্রদান করিয়াছেন। কান্ত এখন চুনারে গিয়াছে। সে নিশ্চয়ই হেষ্টিংসকে বশীভূত করিতে পারিবে।

চেৎসিংহকে যুদ্ধে অগ্রসর হইতে অনিচ্ছুক দর্শনে বেহার এবং গোরক-পুরের লোকেরা ভগ্নোৎসাহ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিল। কিন্তু মহাবীর তত্রাচ তাহাদিগের মধ্যের প্রধান প্রধান লোককে নানা প্রকার কথা দ্বারা আশ্বস্ত করিয়া বারাণসীতে রাখিলেন। হীনবুদ্ধি চেৎসিংহ এখনও যদি কাপুরুষতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মনিয়ার সিংহের পরামর্শানুসারে হেষ্টিংসকে কারারুদ্ধ করে, তবে আপন রাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু চির কাপুরুষতা নিবন্ধন এ শুভ বুদ্ধি তাহার মনোমধ্যে উদয় হইল না।

মহাবীরের মাতা চাঁদকুমারী আপন পুত্রকে এই যুদ্ধের প্রধান উদ্যোগী মনে করিয়া, অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলেন। তিনি অহর্নিশ পুত্রকে এই উদ্যম হইতে বিরত রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, চাঁদকুমারী বাঙ্গালী মহিলাদিগের সংসর্গে জীবন যাপন করিয়াছেন। তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যে ও আচরণে বাঙ্গালী রমণীর স্বভাব ও প্রকৃতি পরিলক্ষিত হয়। সংসর্গ দোষের ন্যায় আর গুরুতর দোষ কিছুই নহে। সংসর্গ দোষ লোকের মজ্জাগত দোষ হইয়া পড়ে। সংসর্গ দোষ লোকের হাড় পর্য্যন্ত স্পর্শ করে। অরণ্যে বাস করাও ভাল, তত্রাচ যেন কেহ কুসংসর্গে বাস করে না। বাঙ্গালী রমণীস্বভাবসুলভ ভীরুতা চাঁদকুমারীর মজ্জাগত দোষ হইয়া পড়িয়াছে। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে পুত্রকে বলিতে লাগিলেন—

"বাছা তুমি বিনা আমার এ সংসারে আর কেহ নাই। আমি এ প্রাণ থাকিতে তোমাকে যুদ্ধে যাইতে দিব না। আমার এই বুকে ছুরী দিয়া আগে আমাকে বধ কর। তার পর তুমি যুদ্ধে যাও।"

হাতে একখানা ছুরী লইয়া আবার বলিলেন—"বাছা তুমি যুদ্ধে গেলে এই ছুরী বুকে দিয়া আমি আত্মহত্যা করিব। এ যুদ্ধে গেলে তোমার মাতৃহত্যার পাপ হইবে।"

মহাবীর জননীর এই সকল আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া, হাসিতে হাসিতে বলিলেন "মা, তোমার বাবা আসিলেও আমাকে এ যুদ্ধ হইতে বিরত রাখিতে পারিবেন না। এই যুদ্ধে জয় লাভ করিতে পারিলেই আমার মাতামহ এবং পিতার স্বর্গলাভ হইবে। আমি কি সাধে যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছি। এ যুদ্ধ নহে—এ তোমার পিতার পিণ্ড প্রদান।

চাঁদকুমারী। বাছা, আমি সাতবার গয়ায় যাইয়া পিণ্ড দিব। তাহাতেই আমার পিতার স্বর্গলাভ হইবে। তোমার এ যুদ্ধে যাইয়া কাজ নাই।

মহাবীর। তোমার পিতা এবং আমার পিতার কুকার্য্য নিবন্ধনই দেশ শুদ্ধ লোক অত্যাচারানলে দগ্ধ হইতেছে। শুদ্ধ কেবল গয়ায় পিণ্ড প্রদান করিলে ইহাদের পাপক্ষয় হইবে না। আমার এ শরীরের রক্ত দ্বারাই ইহাদের পিণ্ড দিতে হইবে।

চাঁদকুমারী কাঁপিয়া উঠিয়া বলিলেন—"বাছা ও রক্ত পাতের কথা আমার শুনিলেও ভয় হয়। চিকিৎসক যখন কাহাকেও অস্ত্র করে তখন আমি সেখানে থাকিতে পারি না। তুই বাছা এ দুর্ব্বুদ্ধি পরিত্যাগ কর। অমর, ছত্রসিংহ কেহই এখন এখানে নাই। তাহারা কেহ এখানে থাকিলেও আমার এত ভয় হইত না। যুদ্ধের সময় অমর উপস্থিত থাকিলে, সে আপন প্রাণ দিয়াও তোর প্রাণ রক্ষার চেষ্টা করিত।

মহাবীর। (হাসিতে হাসিতে) তোমার ভ্রাতার প্রতি কি অপার স্নেহ। ভ্রাতার প্রাণ নষ্ট হইয়াও যদি পুত্রটীর প্রাণ থাকে তবে সে তোমার সুখের বিষয়। আর প্রতি দিন মুখে বল যে, ভাইকে তুমি প্রাণাপেক্ষা ভাল বাস।

চাঁদকুমারী পুত্রের কথা শুনিয়া কিছুকাল নির্ব্বাক রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে বলিলেন, "বাছা একান্তই যদি তোর যুদ্ধে যাইতে হয়, তবে সকলের পিছে থাকিস্। তোর পিতা তোর মাতামহ সর্ব্বদাই সৈন্যের অগ্রে অগ্রে থাকিতেন। তাহাতেই আমার এই বিপদ হইয়াছে। আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে।

মহাবীর মাতার কথায় আর কোন প্রত্যুত্তর করিলেন না। কিন্তু তিনি মনে মনে জানিতেন যে সংগ্রামক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেই তাঁহাকে "নিরাশ-দল" (Forlorn hope) ভুক্ত হইতে হইবে। সংগ্রাম কালে যে এক দল সৈন্য সম্মুখে থাকে তাহাদিগকেই "নিরাশদল" বলা যায়। মহাবীর এবং অমরসিংহ গোরকপুরে যে কয়েকবার যুদ্ধ করিয়াছেন, সে কয়েক বারই অন্যান্য সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য স্বয়ং তাঁহারা অগ্রে যাইয়া নিরাশদল ভুক্ত হইতেন। মহাবীর মনে করিলেন যে মাতার নিকট এই কথা বলিলে তিনি আরও শোকার্ত্ত হইয়া পড়িবেন। সুতরাং আপন জননীর নিকট সে সকল কথা কিছু ব্যক্ত করিলেন না।

এ দিকে চেৎসিংহকে একেবারে সংগ্রামবিমুখ দেখিয়া, মহাবীর গোরক-পুর এবং বেহারের যে কয়েকজন লোককে বারাণসীতে রাখিয়াছিলেন তাহাদিগকেও বিদায় দিলেন। বিদেশ হইতে যে পনের হাজার সৈনিক পুরুষ বারাণসীতে আসিয়া একত্র হইয়াছিল তাহারা, একে একে সকলেই নিরাশ হইয়া আপন আপন গৃহে চলিয়া গেল।

চেৎসিংহ আপন পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগকে সঙ্গে করিয়া লতিপপুরের দুর্গে যাইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। রামনগরের দুর্গ রক্ষণাবেক্ষণার্থ গজরাজ সিংহকে রামনগরের প্রাসাদে রাখিয়া গেলেন। চেৎসিংহকে এখনও ইংরাজদিগের সঙ্গে সন্ধি করিবার নিমিত্ত সচেষ্ট দেখিয়া মনিয়ার সিংহ আপন গৃহে যাইয়া মনোদুঃখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে মনিয়ার সিংহেরও কোন দুরভিসন্ধি ছিল না। বলবন্তসিংহের মান সম্ভ্রম রক্ষা করাই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল।

দশ পনের দিন পরে, হেষ্টিংসের দুরবস্থার কথা স্থানে স্থানে প্রচার হইল। কর্ণেল মরগ্যান তখন কানপুরে ছিলেন। তিনি লোক পরম্পরায় হেষ্টিংসের বিপদের কথা শুনিয়া, আপন রেজিমেণ্টসহ তৎক্ষণাৎ চুনারে যাত্রা করিলেন। এদিকে মৃজাপুর হইতে কর্ণেল পপহাম আসিয়া পৌছিলেন। কর্ণেল হ্যানে হেষ্টিংসের পত্র পাইয়াও বিলম্ব করিতে লাগিল। এবার বোধ হয় কর্ণেল হ্যানেকেও স্বীয় কুকার্য্যের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

চতুর্দ্দিক্ হইতে দুই তিন রেজিমেণ্ট সৈন্য একত্র হইবামাত্র হেষ্টিংস চেৎসিংহের সমুদয় দুর্গ আক্রমণ করিবার আদেশ করিলেন। তখন চেৎসিংহকে একান্ত বাধ্য হইয়া যুদ্ধ করিতে হইল। কিন্তু বিদেশ হইতে যাহারা যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিল, তাহারা সকলেই আপন আপন গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। চেৎসিংহের নিজের যে অল্পসংখ্যক সৈন্য ছিল তাহাদিগকে লইয়া কয়েকদিন মহাবীর সিংহ ইংরাজ সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিলেন। এত অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া মহাবীর একটী দুর্গও ইংরাজদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না। ইংরাজদিগের পক্ষে প্রায় সাত আট হাজার সৈন্য রহিয়াছে। মহাবীরের সঙ্গে এক হাজার সৈন্যও নাই। বিশেষতঃ যে অল্পসংখ্যক সৈন্য আছে তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই জন্মের মধ্যে কখনও সংগ্রামক্ষেত্র দর্শনও করে নাই। কামানের শব্দ শুনিলে ইহারা পলায়ন করিতে উদ্যত হইত। ইহাদিগকে লইয়া সময়ে সময়ে মহাবীরকে ঘোর বিপদে পড়িতে হইয়াছিল।

ইংরাজ সৈন্য ক্রমে রামনগর, লতিপপুর এবং পতিতার দুর্গ দখল করিল। তখন চেৎ সিংহ অনন্যোপায় হইয়া সপরিবারে পলায়ন পূর্ব্বক বিজয়ঘরের দুর্গে চলিয়াগেলেন। বিজয়ঘরের দুর্গেই তাঁহার যৎকিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চিত ছিল। ইংরাজ সৈন্য বিজয়ঘরের দুর্গ আক্রমণ করিবার পূর্ব্ব রাত্রে চেৎসিংহ আপন স্ত্রী এবং জননীকে দুর্গমধ্যে রাখিয়া একাকী কিছু ধন সম্পত্তি সঙ্গে করিয়া পলায়ন পূর্ব্বক রেওয়া চলিয়াগেলেন। চেৎসিংহ সুজন সিংহ উভয়ে পলায়ন করিলে পর, সৈন্যগণও পলায়ন করিল। কেবল মাত্র পাহারাওয়ালাগণ এবং মহাবীর সিংহ বিজয়ঘরে রহিলেন। ইংরাজ সৈন্য দুর্গ আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে পর, চেৎসিংহের মাতা পূর্ণিমা (পন্না) কর্ণেল পপহামের নিকট বলিয়া পাঠাইলেন যে, চেৎসিংহ পলায়ন করিয়াছেন। তাঁহারা কয়েক জন স্ত্রীলোক মাত্র দুর্গ মধ্যে অবস্থান করিতেছেন। এই দুর্গে চেৎ সিংহের আর কোন সম্পত্তি নাই।

পপহাম হেষ্টিংসের নিকট পূর্ণিমার কথিত বিষয় লিখিয়া পাঠাইলেন হেষ্টিংস প্রত্যুত্তরে লিখিলেন যে স্ত্রীলোকদিগকে দুর্গ ছাড়িয়া যাইতে বলিবে। তাহারা দুর্গ হইতে কোন জিনিসপত্র লইয়া যাইতে পারিবে না।

পপহাম সাহেব আবার হেষ্টিংসের নিকট লিখিলেন "স্ত্রীলোকগণ যদি দুর্গ হইতে যাইবার সময় বস্ত্রের নীচে গোপনে কোন মণিমুক্তা লইয়া যায় তবে তাহা নিবারণ করিবার কোন উপায় নাই। প্রত্যুত্তরে হেষ্টিংস লিখিলেন "বিজয়ঘরের দুর্গে যে সকল মণিমুক্তা রহিয়াছে তাহা সৈন্যদিগের প্রাপ্য। সৈন্যগণ যদি ইচ্ছা পূর্ব্বক তাহাদিগকে মণিমুক্তা অপহরণের সুযোগ প্রদান করে, তাহাতে আমার ক্ষতি নাই। তাহাদেরই ক্ষতি। পরীক্ষা না করিয়া স্ত্রীলোকদিগকে দুর্গের বাহির হইতে দিলে তাহারা নিশ্চয়ই মণিমুক্তা চুরী করিবে।" *

সৈন্যগণ হেষ্টিংসের এই হুকুম জ্ঞাত হইল। এদিকে মহাবীর সিংহও এই পত্র পৌঁছিবার এক দিন পূর্ব্বেই কাশীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পপহাম সাহেব চেৎ সিংহের মাতা এবং স্ত্রীকে তাঁহাদের সঙ্গিনী দাসী ও অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগকে সঙ্গে করিয়া দুর্গ হইতে বাহির হইতে হুকুম দিলেন। কিন্তু দাস দাসী সহ চেৎ সিংহের মাতা এবং স্ত্রী দুর্গের দ্বারে আসিবামাত্র কি লোমহর্ষণকাণ্ডই সমুপস্থিত হইল। * * * * *

অর্থ লোভে শত শত ইংরাজ, চেৎ সিংহের মাতা, স্ত্রী এবং সঙ্গিনী দাসীদিগের গাত্রাভরণ হরণ করিবার নিমিত্ত তাহাদিগকে আসিয়া আক্রমণ করিল। চেৎসিংহের মাতা এবং স্ত্রী তৎক্ষণাৎ ভূমিতলে পড়িয়াগেলেন! কেহ তাঁহাদের হস্ত ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল, কেহ তাহাদের পদদ্বয় ধরিয়া টানিতে লাগিল। কেহ পরিধেয় বস্ত্রখানি টানিয়া লইয়াগেল। কেহ কণ্ঠের হার খুলিবার নিমিত্ত কঠিন হস্তে এই পরম সম্ভ্রান্তা রমণীদ্বয়ের গলদেশ চাপিয়া ধরিল। * * * *

রাজ পরিবারস্থ পরম সম্ভ্রান্তা এই রমণীদ্বয়ের তৎকালে যেরূপ কষ্ট, যন্ত্রণা, অত্যাচার এবং অপমান সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিতে লেখনী

* Hastings' letter runs thus—I apprehend that she will contrive to defraud the captors of a considerable part of the booty by being suffered to retire without examination. But this is your consideration and not mine.

অগ্রসর হয় না। দেশের এ কলঙ্ক যেন ইতিহাসে উল্লিখিত হয় না। ভাবী বংশাবলীর কর্ণে যেন এ কলঙ্কের কথা প্রবেশ করে না। এ জাতীয় কলঙ্ক চিরকালের নিমিত্ত বিস্মৃত সাগরে নিমগ্ন হইলেই ভাল। *

* * * * * *

* * ছিন্ন বস্ত্র পরিহিতা, শারীরিক যন্ত্রণা নিপীড়িতা, প্রায় চলৎশক্তিহীনা রাজা চেৎসিংহের মাতা এবং স্ত্রী সঙ্গের দাসী দাসী সহ বিজয়ঘরের দুর্গ হইতে বারাণসীতে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এখানে রাজা চেৎ সিংহের স্থানে স্থানে অনেকানেক প্রস্তর এবং ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ ছিল। তাহারই একখানি গৃহে ইঁহারা অবস্থান করিতে লাগিলেন।

মহারাণী গোলাপকুমারী, পূর্ণিমা এবং চেৎ সিংহের স্ত্রীকে প্রথমতঃ আপন বাড়ীতে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু লজ্জা এবং অপমানে তাঁহারা আত্মীয় স্বজন কাহাকেও মুখ দেখাইতে সম্মতা হইলেন না। আত্মহত্যার পথাবলম্বন পূর্ব্বক এ কলঙ্ক হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

রাণী গোলাপ কুমারী স্বয়ং তাঁহাদিগের নিকটে যাইতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু পূর্ণিমা এ জীবনে আর কাহাকেও মুখ দেখাইবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। তিনি সর্ব্বদাই আপন গৃহদ্বার বন্ধ করিয়া কাল যাপন করিতে লাগিলেন। ক্রমাগত প্রায় তিন চারি দিন অনশনে দিনাতিপাত করিলেন। এই ঘোর বিপদ রাশি,এই লোক লজ্জা,তাঁহার হৃদয় ক্রমে বিগলিত করিল। সংসারের পদ প্রভুত্বের অনিত্যতা এবং অসারতা ক্রমে তাঁহার অনুভূত হইতে লাগিল। ফিরিঙ্গীর স্পর্শস্বরূপ কলঙ্ক হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার নিমিত্ত তুষানলে দেহ ত্যাগ করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। কিন্তু পিতার কথা স্মৃতিপথারূঢ় হইবামাত্র, মনে করিলেন একবার পিতৃ চরণে প্রণাম করিয়া তুষানলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিবেন। বাল্য কালের সকল কথা, সকল অবস্থা ক্রমে স্মৃতিপথারূঢ় হইতে লাগিল। ধীরে ধীরে সেই বাল্যস্মৃতি অন্তরের মধ্যে

* **And when the princesses, with their relatives and attendants withdrew from the castle, they were plundered of their effects; and their persons otherwise rudely and disgracefully treated by the licentious people and followers of the camp.—*James Mill's history of India.***

সমুদ্রিত হইয়া পূর্ণিমাকে আবার সেই পিতৃ ক্রোড়স্থিতা বালিকা করিয়া তুলিল। পূর্ণিমা রাজপদ, অর্থ সম্পত্তি, পদ প্রভুত্ব সকলই বিস্মৃত হইলেন। বিলাস প্রিয়তা, ধনগর্ব্ব এবং পদ প্রভুত্ব সম্ভূত অজ্ঞানতার তমঃরাশি এ পর্য্যন্ত পূর্ণিমার অন্তরস্থিত অপরিমেয় পিতৃ ভক্তি এবং ধর্ম্মভাব সমাচ্ছন্ন করিয়াছিল। কিন্তু আজ বিপদ চন্দ্রালোকে সে তমঃরাশি বিদূরিত হইল। তিনি পিতৃচরণ দর্শনার্থ ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। অহর্নিশ পিতৃচরণ ধ্যান করিতে লাগিলেন। পিতৃমুখ দর্শন আশাই কেবল কিছু কালের নিমিত্ত তাঁহাকে জীবন বিসর্জ্জনের পথ হইতে বিরত রাখিল।

চেৎ সিংহের সহধর্ম্মিনীও শোকাকুল হৃদয়ে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু এ বৃথাশোক দ্বারা শরীর শোষণ করিলে কোন লাভ নাই। এ সমুদয়ই চেৎ সিংহের কাপুরুষতার প্রায়শ্চিত্ত। এ সংসারে প্রত্যেক কাপুরুষকেই চেৎ সিংহের ন্যায় প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। এই পাপ, অত্যাচার এবং স্বার্থপরতা পরিপূর্ণ সংসারে কাপুরুষের স্ত্রী এবং জননীকে চিরকাল এই প্রকার অপমান, যন্ত্রণা ও অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছে। এবং ভবিষ্যতেও চিরকালই কাপুরুষের স্ত্রী ও জননীকে এইরূপ বিপদগ্রস্থ হইতে হইবে।

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

ষড়যন্ত্র।

চেৎসিংহ সুজন সিংহের পলায়নের পর বারাণসীর রাজ্য ইংরাজদিগের হস্তগত হইল। কিন্তু বারাণসীর প্রজাবর্গ বিদেশীয় রাজার অধীনতা স্বীকার করিতে বড় ইচ্ছুক নহে। বিশেষতঃ বলবন্ত সিংহের পরিবারের প্রতি তাহাদের বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা রহিয়াছে। মহাবীরের উত্তেজনায় আবার সংগ্রাম হইবার উপক্রম হইল।

ওয়ারেণ হেষ্টিংস বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন যে, চেৎসিংহের কাপুরুষতা নিবন্ধনই এবার আত্মরক্ষা এবং কোম্পানীর রাজ্যরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সুতরাং তিনি অনতিবিলম্বে রাজ্যের স্থানে স্থানে ঘোষণাপত্র দ্বারা প্রচার করিলেন "বারাণসীর রাজ্য কখনও ইংরাজ রাজ্যভুক্ত করা হইবে

না। ইংরাজদিগের পরমোপকারী বন্ধু মহারাজ বলবন্ত সিংহের বংশোদ্ভব কোন একজন উপযুক্ত রাজপুত্রকে সিংহাসন প্রদত্ত হইবে।”

প্রজাদিগকে যুদ্ধ হইতে বিরত করিবার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় ঘোষণা পত্র দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা হইল যে—“বারাণসী এবং অন্যান্য স্থানের যে সকল লোক চেৎসিংহের পক্ষ হইয়া ইংরাজদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছে, তাহাদিগকে আর কোন প্রকার দণ্ড প্রদান করা যাইবে না। স্বয়ং চেৎসিংহ এবং সুজনসিংহ ভিন্ন অন্যান্য সকলের অপরাধ মার্জ্জনা করা হইল। তাহারা নির্ব্বিঘ্নে পূর্ব্বের ন্যায় এই রাজ্যে অবস্থান করিতে পারিবে।”,

বলবন্ত সিংহের প্রধানা মহিষী রাণী গোলাপকুমারীর নিকট হেষ্টিংস পত্র দ্বারা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি রাজ্য শাসনের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিবেন, কি তাঁহার দৌহিত্রকে সিংহাসন প্রদান করিবেন।

রাণী তাঁহার দৌহিত্রকে সিংহাসন প্রদান করিতে সম্মতা হইলেন। ত্রিহুতের জেলা নিবাসী রাণীর জামাতা দুর্ব্বিজয় সিংহের তিন বৎসর বয়স্ক পুত্র মহিপনারায়ণসিংহ বারাণসীর সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু রাজ্য শাসন ও রক্ষণের প্রায় সমুদয় ক্ষমতাই হেষ্টিংস ইংরাজ রেসিডেণ্টের হাতে রাখিলেন। দুর্ব্বিজয়সিংহ আপন পুত্রের অভিভাবকের পদে নিযুক্ত হইলেন।

কোম্পানীর ধনাগার শূন্য হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়াই হেষ্টিংস চেৎসিংহের সমুদয় ধন সম্পত্তি অপহরণ করিতে কৃত সঙ্কল্প হইয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা অবস্থান কালে মনে করিতেন চেৎসিংহের ধনাগারে অনেক টাকা সঞ্চিত আছে। কোন একটা অবৈধ উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক চেৎসিংহের ধনাগার লুণ্ঠন করিতে পারিলেই কোম্পানীর রাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন। কিন্তু তাঁহার সে আশা বৃথা হইল। চেৎসিংহের ধনাগারে সর্ব্বশুদ্ধ বিশ ত্রিশ লক্ষ টাকার অধিক পাইলেন না। ইহার কতকাংশ সৈন্যদিগের পুরস্কার স্বরূপ দিতে হইল। আর বক্রী টাকা যুদ্ধের ব্যয় বহনে নিঃশেষিত হইল। হেষ্টিংস এবার ঘোর বিপদে পড়িলেন। অর্থ সঞ্চয়ার্থ এখন কি উপায় অবলম্বন করিবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। অবশেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন যে অযোধ্যার বউবেগম এবং মতী বেগমের ধনাগার লুণ্ঠন করিবেন।

পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে, ১৭৭৫ সালের ১৫ই অক্টোবরের একরারনামা দ্বারা ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট বউ বেগমের ধনাগার এবং জায়গীর

রক্ষার্থ নবাবের প্রতিভূ হইয়াছেন। ইহার পর ১৭৭৭ সালে অনেক পত্রাপত্রির পর মতী বেগমকেও ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী এবং নবাব আসফ উদ্দৌলা একত্র হইয়া তদ্রূপ এক একরারনামা * লিখিয়া দিয়াছিলেন। বেগমেরা আপন আপন তহবিল হইতে নবাবের দেয় টাকা ইংরাজদিগকে পরিশোধ করিয়াছিলেন বলিয়াই ইংরাজেরা তখন বেগমদিগের সঙ্গে এই রূপ সন্ধি সংস্থাপন করিয়াছিলেন। এই দুইখানি একরারনামা কিম্বা সন্ধিপত্র অনুসারে বেগমদিগের ধন সম্পত্তি রক্ষার ভার ইংরাজদিগের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। সুতরাং ঘোর বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক এই সন্ধিপত্র ভঙ্গ না করিলে আর বেগমদিগের ধন সম্পত্তি অপহরণ করিবার উপায় নাই।

কিন্তু লর্ডক্লাইব এবং ওয়ারেণ হেষ্টিংস প্রভৃতি ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণ কি কোন প্রকার বিশ্বাসঘাতকতা কার্য্য করিতে কুণ্ঠিত হইতেন? জগতে এমন কি কুকার্য্য আছে, যাহা হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তৎকালের গবর্ণর ও অন্যান্য কর্ম্মচারীগণ বিরত থাকিতেন?

হেষ্টিংস বেগমদিগের সঙ্গে সন্ধি ভঙ্গ করিবার ছলনা অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। বেগমেরা অন্দরবাসিনী সম্ভ্রান্তা রমণী। কোন লোকের সঙ্গে তাঁহাদের কোন কথা বার্ত্তা হয় না, দেখা সাক্ষাৎ হয় না। ইহাঁদের বিরুদ্ধে কোন সম্ভবপর মিথ্যা অভিযোগ প্রস্তুত করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। কিন্তু ওয়ারেণ হেষ্টিংসের অসাধ্য কোন কার্য্যই ছিল না। হেষ্টিংস মনে মনে স্থির করিলেন যে, বেগমেরা চেৎসিংহকে ইংরাজদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন, চেৎসিংহকে সৈন্য প্রদান পূর্ব্বক সাহায্য করিয়াছেন, এই রূপ ছলনা করিয়া তাঁহাদিগের ধন সম্পত্তি অপহরণ করিতে হইবে। এই রূপ ছলনা ভিন্ন সন্ধি ভঙ্গের আর দ্বিতীয় উপায় নাই।

---

* I who am the Nabab Asoph Dowla Bahadur do agree, that the Jagheres, Gunges &c. and those (properties) specefied in the accounts annexed shall be at the disposal and under the management and authority of the Begum, and no one shall oppose or prevent it ; this I will punctually observe. In this agreement Mr. Middleton and the English are engaged.

Secondly—whenever the Begum should choose to go to Mecca I will not oppose it.

Thirdly—whenever the Begum should go to Mecca, she shall leave her lands, Jagheers &c. either in the care of my mother or of me &c.

এই দুরভিসন্ধি সংসাধনার্থ হেষ্টিংস নবাব আসফ উদ্দৌলাকে চুনারে আনয়ন করিবার কৌশল করিতে লাগিলেন। তিনি চুনারে পৌছিলে পর আসফ উদ্দৌলা চুনারে যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়া পত্র লিখিলেন। হেষ্টিংস তাঁহার পত্রের প্রত্যুত্তরে লিখিয়া পাঠাইলেন—"আপনার এখানে আসিবার কোন প্রয়োজন নাই। আপনি কোম্পানীর প্রাপ্য টাকা অবিলম্বে পরিশোধ করিতে চেষ্টা করুন।"

আসফ উদ্দৌলার টাকা পরিশোধ করিবার সাধ্য নাই। সুতরাং এই রূপ পত্র প্রাপ্তিমাত্র হেষ্টিংসের সহিত সাক্ষাৎ করা তিনি নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিলেন। এদিকে রেসিডেণ্ট মিডল্‌টন্‌সাহেব বিশেষ চতুরতা সহকারে গোপনে বন্ধুত্বভাব প্রকাশ পূর্ব্বক আসফ উদ্দৌলাকে হেষ্টিংসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পরামর্শ দিলেন। আসফ উদ্দৌলা মনে করিলেন যে রেসিডেণ্ট নিঃস্বার্থ বন্ধুতার অনুরোধেই কেবল তাঁহাকে এই সৎপরামর্শ প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু ইংরাজদিগের রাজনৈতিক কৌশল যে, কি ভয়ানক প্রবঞ্চনামূলক ব্যবহার, তাহা কি আর আসফ উদ্দৌলার ন্যায় নির্ব্বোধ লোক বুঝিবেন? আসফ উদ্দৌলা হেষ্টিংসকে উৎকোচ প্রদানার্থ দশলক্ষ টাকা সঙ্গে করিয়া চুনারে আসিলেন। পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের সাক্ষাৎ হইলে পর হেষ্টিংস বলিলেন।

"আপনাকে আমি এখানে আসিতে নিষেধ করিয়াছি। আপনার এখানে আসিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। আমাদের সৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ আপনার নিকট যে টাকা বাকী পড়িয়াছে, তাহা অবিলম্বে দিতে হইবে।"

নিস্তেজ আসফ উদ্দৌলা বলিতে লাগিলেন "আপনি আমার স্বর্গীয় পিতার পরম বন্ধু। আমি আপনাকে পিতৃ তুল্য মনে করি। আমার রাজ্য রক্ষার ভার আপনার হস্তে প্রদান করিয়াছি। আপনাদিগের সঙ্গে আমার যে সন্ধি হইয়াছে তদনুসারে আমার ইচ্ছানুসারে আপনাদের কেবল একদল সৈন্য আমার রাজ্যে রাখিতে হইবে; তাহার ব্যয় মাসিক দুই লক্ষ ষাট হাজার টাকা দিতে হইবে। কিন্তু আর একদল অতিরিক্ত সৈন্য যে এই তিন বৎসর কাল আমার রাজ্যে রাখিয়াছেন, তাহার ব্যয় আমি কোন প্রকারেই বহন করিতে পারি না। বিশেষতঃ আপনাদের সৈন্য আমার রাজ্যে এখন রাখিবারও প্রয়োজন নাই। দেশীয় অন্য কোন রাজার সঙ্গে আমার কোন বিবাদ নাই। আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই অতিরিক্ত

সৈন্যের (Temporary Brigade) ব্যয় বহন হইতে আমাকে অব্যাহতি প্রদান করুন।"

আসফ উদ্দৌলা এই কথা বলিয়াই প্রকারান্তরে হেষ্টিংসকে দশলক্ষ টাকা উৎকোচ প্রদান করিবার প্রস্তাব করিলেন। আসফ উদ্দৌলা মনে মনে আশা করিয়াছেন যে, হেষ্টিংস দশলক্ষ টাকা উৎকোচ পাইলে নিশ্চয়ই কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের নিকট এই অতিরিক্ত সৈন্যদল অযোধ্যা হইতে স্থানান্তর করিতে লিখিবেন।

পাঠকদিগের জ্ঞাতার্থে এই অতিরিক্ত সৈন্যদল (Temporary Brigade) অর্থাৎ প্রসিদ্ধ সাময়িক ব্রিগেড্ সম্বন্ধীয় দুই একটী কথা এই স্থানে উল্লেখ করিতেছি। অযোধ্যার নবাব ইংরাজ সৈন্য চিরকাল স্বদেশে রাখিবেন বলিয়া কোন প্রতিজ্ঞা করেন নাই। রোহিলা যুদ্ধের সময় ইংরাজগণ সুজা উদ্দৌলাকে একদল সৈন্য প্রদান করিয়াছিলেন। সেই সৈন্যদল সুজা উদ্দৌলা যত দিন স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আপন রাজ্যে রাখিবেন, তত দিন তাঁহাকে তাহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ মাসিক দুই লক্ষ দশ হাজার টাকা দিতে হইবে; এই প্রকার সন্ধি হইয়াছিল। সুজার মৃত্যুর পর ইংরাজগণ অন্যায়পূর্ব্বক আপন সৈন্য অযোধ্যায় রাখিয়া দিলেন। অযোধ্যার নবাবের এখন আর ইংরাজ সৈন্য স্বদেশে রাখিবার কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু ইংরাজেরা তাঁহার কথায় কর্ণপাত করেন না। সৈন্যের ব্যয় নবাবের নিকট হইতে আদায় করিবার দুরভিসন্ধি করিয়া অযোধ্যায় আপনাদের সৈন্য রাখিয়াছেন এবং এখন সেই সৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ মাসিক দুই লক্ষ ষাট হাজার টাকা ধার্য্য করিয়াছেন। আসফ উদ্দৌলার সিংহাসনারোহণের পর তিনি ইংরাজদিগকে তাহাদের সৈন্য অযোধ্যা হইতে স্থানান্তর করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করেন। কিন্তু ইংরাজেরা বলেন যে এখনও অযোধ্যাতে সৈন্য রাখিবার বিলক্ষণ প্রয়োজন রহিয়াছে। নবাব নিজে তাঁহার হিতাহিত বুঝিতে পারেন না। তজ্জন্যই সৈন্য উঠাইয়া আনিতে অনুরোধ করিতেছেন। নবাবকে বাধ্য করিয়া ইংরাজেরা এই প্রকারে আপন সৈন্য অযোধ্যায় রাখিলেন। অত্যল্প কাল মধ্যেই নবাব এই সৈন্যের ব্যয় বহন করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িলেন। তখন ইংরাজেরা তাঁহাকে তাঁহার নিজের সৈন্যের সংখ্যা হ্রাস করিতে পরামর্শ প্রদান করিলেন। ইংরাজেরা বলিলেন যে তাঁহার নিজের সৈন্য বিশেষ কার্য্যদক্ষ নহে। তাহাদিগকে পদচ্যুত করা উচিত। ইংরাজদিগের

অনুরোধে ব্যয় সঙ্কোচ করিবার নিমিত্ত আসফ উদ্দৌলা আপন সৈন্যের সংখ্যা হ্রাস করিলেন। তাঁহার নিজের অনেক সৈনিক কর্ম্মচারীদিগকে পদচ্যুত হইতে হইল।

ইংরাজগণ চিরকালই এদেশীয় লোকের উপকারার্থ এই গ্রীষ্ম প্রধান দেশে অবস্থান করিতেছেন। এ দেশীয় লোকের উপকার করাই তাঁহাদিগের একমাত্র উদ্দেশ্য। সুতরাং আসফ উদ্দৌলার যে সকল সৈনিক কর্ম্মচারী বরখাস্ত হইল, তাহারা অনাহারে কষ্ট না পায়, তজ্জন্য ইংরাজেরা তাহাদিগকে আপন সৈনিক বিভাগে নিযুক্ত করিলেন। খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী লোক। পরোপকারই ইহাদিগের একমাত্র ব্রত। এই পদচ্যুত সৈন্যদিগের অন্নের সংস্থান করিয়া দিলেন। কিন্তু ইহাতে ইংরাজ সৈন্যের সংখ্যা বৃদ্ধি হইল। তখন তাঁহারা এই সকল পদচ্যুত সৈন্য দ্বারা একটা ব্রাইগেড প্রস্তুত করিয়া, নবাবের সাহায্যার্থ এই নূতন সৈনিকদল সাময়িক সৈন্যদল স্বরূপ নবাবের রাজ্য রক্ষার্থ অযোধ্যাতেই রাখিয়া দিলেন। এই সৈন্যের ব্যয় আবার নবাবকেই বহন করিতে হইল।

পাঠক, এই প্রকার কৌশলকেই বিদেশীয় রাজনৈতিক কৌশল বলা যায়। ইংরাজেরা নবাবকে তাঁহার নিজের সৈন্য পদচ্যুত করিতে বলিলেন। সেই পদচ্যুত সৈনিক পুরুষগণ ইংরাজদিগের অধীনে নিযুক্ত হইলেন। ইংরাজেরা সেই সৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহের ভার আবার নবাবের হস্তেই প্রদান করিলেন। কেবল ব্যয় নির্ব্বাহের ভার নহে। নবাবকে ইংরাজদিগকে কিছু লাভ প্রদান পূর্ব্বক সেই সৈন্যের ভাড়া দিতে হইল। আজ আসফ উদ্দৌলা সেই অতিরিক্ত সৈন্যদলের ব্যয় নির্ব্বাহের ভার হইতে অব্যাহতি পাইবার নিমিত্ত হেষ্টিংসের চরণ ধরিয়া ক্রন্দন করিতেছেন।

প্রথমতঃ হেষ্টিংস আসফউদ্দৌলার কথায় একেবারেই কর্ণপাত করিলেন না। কিন্তু এখন তাঁহাকে একটু হাতের মধ্যে আনিতে না পারিলে বেগমদিগের অর্থাপহরণের সুবিধা হইবে না। সুতরাং হেষ্টিংস এই অতিরিক্ত সৈন্যদল অযোধ্যা হইতে স্থানান্তর করিবেন বলিয়া সম্মত হইলেন। এবং বেগমদিগের ধনাগার লুণ্ঠন করিয়া কোম্পানীর টাকা পরিশোধার্থ আসফউদ্দৌলাকে পরামর্শ প্রদান করিলেন। আসফউদ্দৌলা তাঁহার জননীর এবং পিতামহীর ধনাগার লুণ্ঠন করিতে প্রথমতঃ সম্মত হইলেন না। কিন্তু হেষ্টিংস বলিলেন যে তাঁহার মাতা এবং পিতামহী যখন চেৎ সিংহের সাহায্য করিয়া-

ছেন, তখন ইংরাজেরা তাঁহাদিগের সঙ্গে সন্ধি প্রতিপালন করিতে বাধ্য নহে। বেগমদিগের ধনাগার তিনি লুণ্ঠন না করিলে তাঁহাদিগের সম্পত্তি লুণ্ঠনার্থ ইংরাজ সৈন্য প্রেরিত হইবে।

হেষ্টিংস বারম্বার ভয় প্রদর্শন করিলে পর, নিস্তেজ আসফউদ্দৌলার আর হেষ্টিংসের কথার প্রতিবাদ করিতে সাহস হইল না। তিনি মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। মৌনংসম্মতি লক্ষণম্ স্থির করিয়া হেষ্টিংস তৎক্ষণাৎ এক নূতন সন্ধিপত্রে নবাবকে দস্তখত করাইলেন। আজ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে নবাব আসফউদ্দৌলার এক নূতন সন্ধি সংস্থাপিত হইল। এই সন্ধি পত্রই চুনারের সন্ধিপত্র নামে ইতিহাসে অভিহিত হইয়াছে। ১৭৮১ সনের ১৯ সেপ্টেম্বর চুনারের সন্ধিপত্র দস্তখত হইল *

চুনারের সন্ধিপত্র দ্বারা ওয়ারেণ হেষ্টিংস অতিরিক্ত সৈন্যদল অযোধ্যা হইতে স্থানান্তর করিতে সম্মত লইলেন। এবং নবাবকে দেশের সমুদয় জায়গীরদারের জায়গীর খাষ করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। এইরূপ অনুমতি প্রদান করিবার উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে। ইংরাজেরা বেগমদিগের জায়গীর রক্ষার্থ জামিন হইয়াছিলেন। এখন আর ইংরাজগবর্ণমেণ্ট জামিন রহিলেন না। নবাবকে প্রকারান্তরে তাহার পিতামহী ও মাতার জায়গীর খাষ করিতে অনুমতি দিলেন। আজ বেগমদিগের সর্ব্বনাশ করিবার ষড়যন্ত্র হইল।

চতুস্ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

প্রমাণ সংগ্রহ।

অন্যের অনিষ্ট করিবার নিমিত্ত যাহারা চক্রান্ত করে, ষড়যন্ত্র করে, তাহাদের মন সর্ব্বদাই অশান্তিতে পরিপূর্ণ থাকে। এ সংসারে ধূর্ত্ত, শঠ এবং প্রবঞ্চক কখনও শান্তি ভোগ করিতে সমর্থ হয় না।

---

* চুনারের সন্ধি পত্রে লিখিত হইল। That the temporary brigade and three regiments of cavalry be no longer charged to the Nobab's account for the year Fussuleo 1189 excepting a term for two and a half months, which is required for their passing the Nobab's boundaries—Aitchisin's treaties &c.

অযোধ্যার বেগমদ্বয়ের অর্থাপহরণ করিবার দুরভিসন্ধি হেষ্টিংসের অন্তরে বিবিধ বিপদাশঙ্কা আনয়ন করিল। হেষ্টিংস মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—

"বেগমদ্বয় যে চেৎসিংহকে সাহায্য করিয়াছেন তাহার কোন প্রমাণ নাই। বিশেষতঃ চেৎ সিংহ প্রাণান্তেও আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন নাই। চেৎসিংহের প্রজাগণ তাঁহার অসম্মতিতে তাঁহাকে কারামুক্ত করিয়াছিল। কারামুক্ত হইবার পর পনের দিবসের মধ্যেও চেৎ সিংহ ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন নাই। ইংরাজ সৈন্য তাঁহার এক একটী দুর্গ আক্রমণ করিবামাত্র তিনি পলায়নপূর্ব্বক অন্য দুর্গে চলিয়া গিয়াছেন। এইরূপ অবস্থায় যখন চেৎসিংহ নিজেই কোন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন না, তখন তাঁহার সাহায্যকারী বলিয়া অপরকে কি রূপে দণ্ড প্রদান করা যাইতে পারে?"

এই প্রশ্ন হেষ্টিংসের মনে উদয় হইবামাত্র তিনি স্বীয় দুরভিসন্ধি পরিত্যাগ করিবেন কি না তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর ধনাগারে টাকা নাই। বিলাত হইতে ডিরেক্টরেরা টাকা প্রেরণ করিতে লিখিয়াছেন। তিনি দস্যুবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক সহজে টাকা সংগ্রহ করিতে পারেন বলিয়াই ডিরেক্টরেরা তাঁহার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করেন। এমতাবস্থায় টাকা সংগ্রহ ভিন্ন আপন পদ রক্ষার উপায় নাই। সুতরাং এ দুরভিসন্ধি পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইলেন না।

কিন্তু বেগমদিগের বিরুদ্ধে এই মিথ্যা অভিযোগ সাব্যস্ত করিবার পূর্ব্বে কোন প্রমাণ গ্রহণ করা হইল না। ভবিষ্যতে যদি এই বিষয় লইয়া বিলাতে কোন আন্দোলন হয় তবে তাঁহাকে অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হইতে হইবে।

এই চিন্তা হেষ্টিংসের মনে বিশেষ কষ্ট প্রদান করিতে লাগিল। হেষ্টিংস মনে করিলেন যে আপন প্রিয়বন্ধু এবং তাঁহার সকল কুকার্য্যের সহচর সুপ্রিম কোর্টের প্রধান জজ ইলাইজা ইম্পির সহিত পরামর্শ না করিয়া এই প্রকার গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ ইম্পিকে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে আসিতে অনুরোধ করিলেন। ইলাইজা ইম্পি স্বাস্থ্য রক্ষার ছলনায় উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে আসিলেন। * * * *

ইম্পি ব্যবহার শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী। তিনি আইন ব্যবসায়ী লোক। জন সাধারণের অর্থাপহরণার্থ; কলঙ্কিত না হইয়া দস্যুবৃত্তি অবলম্বনার্থই বোধ হয় আইনের সৃষ্টি হইয়াছে। এই দুইটী উদ্দেশ্য আইনের সাহায্য ভিন্ন

কখন সংসিদ্ধ হয় না। ভারতে মুসলমানদিগের সময় আইন কানুন বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল না। তাঁহারা রাজস্ব আদায় উপলক্ষে প্রজার বাড়ী লুট করিতেন; সুতরাং লোকে তাঁহাদিগকে দস্যু বলিয়া অভিহিত করিত। কিন্তু এখন মাল ক্রোকী পরওয়ানা আইনানুসারে জারি হয়। এই পরওয়ানা জারি উপলক্ষে প্রজার গৃহের সর্ব্বস্ব লুট করিলেও কেহ নিন্দা করিতে পারে না। এ আইন সঙ্গত কার্য্য। আইনের ন্যায় ঈদৃশ মহাস্ত্র যিনি ধারণ করেন, তাঁহার ন্যায় সৌভাগ্যশালী এ সংসারে কেহই নহে। তিনি চুরী করিলেও চোর নহেন। ডাকাতী করিলেও দস্যু নহেন। তাঁহার ব্যবসার পরিচ্ছদ তাঁহার সকল কলঙ্ক ঢাকিয়া রাখে। তিনি সর্ব্বদাই ভদ্রলোক।

আজ হেষ্টিংস অনন্যোপায় হইয়া আইন ব্যবসায়ী ইম্পির শরণাগত হইলেন। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারক বেগমদিগের অপরাধের প্রমাণ গ্রহণার্থ লক্ষ্ণৌ চলিয়া গেলেন। বেগমদ্বয় ফায়েজাবাদে অবস্থান করিতেছেন। সেখানে অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিলে পাছে অভিযোগ মিথ্যা সাব্যস্ত হয়; সুতরাং স্থানান্তরে যাইয়া প্রমাণ সংগ্রহ করাই উচিত বোধ হইল।

কিন্তু এ মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি প্রমাণ গ্রহণের পূর্ব্বেই হইয়াছে। চুনারের সন্ধিপত্র দ্বারা হেষ্টিংস নবাবকে বেগমদিগের জায়গীর খাষ করিতে অনুমতি দিয়াছেন। বেগমদিগের অপরাধ সাব্যস্ত করিয়া পূর্ব্বেই হেষ্টিংস তাঁহাদিগের সঙ্গে সন্ধি ভঙ্গ করিয়াছেন। তবে এখন কোন আইন অনুসারে ইম্পি প্রমাণ গ্রহণ করিতেছেন? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা পাঠকদিগকে এইমাত্র বলিতে পারি, যে আইন অনুসারে মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি হইয়াছিল, এবারও ইম্পি সেই আইনেরই আশ্রয় লইয়াছেন; সেই আইনানুসারেই কার্য্য করিতেছেন।

ইম্পি হেষ্টিংসের অনুরোধে লক্ষ্ণৌ পৌঁছিলে পর, রেসিডেণ্ট মিডল্‌টন্ সাহেব বেগমদিগের অপরাধ সাব্যস্ত করিবার নিমিত্ত অসংখ্য অসংখ্য শ্বেতাঙ্গ সাক্ষী আনিয়া উপস্থিত করিলেন। কিন্তু বেগমেরা ইহার বিন্দু বিসর্গও জানেন না। প্রথম সাক্ষী কাপ্তেন গর্ডন। গোরকপুরের প্রজাগণ ইহার প্রাণ বিনাশ করিতে উদ্যত হইলে পর সহৃদয়া বউ বেগম আপনার লোক প্রেরণ করিয়া ইহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। প্রায় বৎসরেক হইল ইনি বউ বেগমের নিকট আপন হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পূর্ব্বক লিখিয়াছিলেন—'মা আপনার কৃপাতেই আমার জীবন রক্ষা হইয়াছে। আপনি

সাহায্য না করিলে নিশ্চয়ই আমাকে প্রজাগণ হত্যা করিত"। কিন্তু কৃতজ্ঞতার নেসা আর কত দিন থাকিবে। উৎকৃষ্ট ব্রাণ্ডী কিম্বা রাজসাহীর উৎকৃষ্ট গাঁজার নেসাই পাঁচ ঘণ্টার অধিক থাকে না। গর্ডনের সে কৃতজ্ঞতার নেসা চলিয়া গিয়াছে। তিনি বউ বেগমের বিরুদ্ধে আজ অম্লান বদনে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিলেন। ইম্পির নিকট বলিলেন, লোক পরম্পরায় শুনিয়াছেন যে বেগমেরা চেৎ সিংহের সাহায্যার্থ সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন লোকের নিকট শুনিয়াছেন তাহা বলিবার সাধ্য নাই। দ্বিতীয় সাক্ষী কর্ণেল হ্যানে বলিলেন তিনিও কেবল লোক পরম্পরায় শুনিয়াছেন যে বেগম গোরকপুর এবং বেরুচের লোকদিগকে বিদ্রোহী হইতে উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। গোরকপুর এবং বেরুচের প্রজাগণ ইহারই অত্যাচারে বিদ্রোহী হইয়াছিল। কিন্তু ইনি লোক পরম্পরায় শুনিলেন বেগম তাহাদিগকে বিদ্রোহী হইতে উৎসাহ দিয়াছেন। প্রজার সর্ব্বনাশ করিয়া নবাবের প্রাপ্য রাজস্ব নয় লক্ষ টাকা বাদে, দুই বৎসরের মধ্যে ইনি ত্রিশ লক্ষ টাকা সঞ্চয় করিয়াছেন। ইহাতেও প্রজাগণ অস্ত্র ধারণ করিবে না?

এইরূপে অনেক সাক্ষীর জবানবন্দী হইল। কিন্তু কোন সাক্ষীই বেগমকে কিম্বা তাঁহার কোন কর্ম্মচারীকে কোন অপরাধের কার্য্য করিতে দেখেন নাই। ইম্পি ইহাদের জবানবন্দী শুনিয়া বড় হতাশ্বাস হইলেন। তিনি ইহাদের সাক্ষ্য আর নিজহস্তে লিখিলেন না। প্রত্যেক সাক্ষীকে আপন আপন কথা লিপি বদ্ধ করিয়া আফিডেবিট প্রদান করিতে বলিলেন। এই সকল আফিডেবিট সংগ্রহ করিয়া সুপ্রিম কোর্টের প্রধান জজ আপন প্রিয়-বন্ধু ওয়ারেণ হেষ্টিংসের এই বিপদ কালে যারপর নাই উপকার করিলেন।

এই অধ্যায় সমাপ্ত করিবার পূর্ব্বে, কর্ণেল হ্যানের বিষয় এই উপন্যাসে আর যাহা কিছু বলিবার আছে, তাহা এই স্থানেই উল্লেখ করিতেছি। এ পিশাচ মূর্ত্তি বারম্বার পাঠক, বিশেষতঃ কোমল হৃদয়া পাঠিকাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিতে ইচ্ছা হয় না।

কর্ণেল হ্যানে ইলাইজা ইম্পির মাসতাত ভ্রাতা। এই জন্যই হেষ্টিংস এ পর্য্যন্ত ইহাকে পদচ্যুত করিয়াছিলেন না। ইহার বিরুদ্ধে বারম্বার স্বয়ং নবাব আসফউদ্দৌলা এবং তাঁহার মন্ত্রী হায়দরবেগ খাঁ হেষ্টিংসের নিকট অনেকানেক অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন। কিন্তু হেষ্টিংস তাঁহাদের কথায় কখনও কর্ণপাত করেন নাই। এবার কর্ণেল হ্যানের দুরদৃষ্ট বশতঃ হেষ্টিংসের

আজ্ঞা পালনে ক্রটী হইল। চুনার হইতে হেষ্টিংস কর্ণেল হ্যানেকে সসৈন্যে তাঁহার সাহায্যার্থ বারাণসীতে আসিতে লিখিয়াছিলেন। কিন্তু কর্ণেল হ্যানে অনেক বিলম্ব করিয়া চুনারে আসিয়া পৌঁছিল। সহস্র সহস্র নরহত্যা-পেক্ষাও হ্যানের এই ক্রটীই গুরুতর অপরাধ বলিয়া সাব্যস্ত হইল। হেষ্টিংস কর্ণেল হ্যানের সাক্ষ্য প্রদানের পর তাঁহাকে বরখাস্ত করিলেন। হ্যানের বিরুদ্ধে পূর্ব্বে পূর্ব্বে নবাব যে সকল অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন তাহারও বিচার হইবে বলিয়া জনরব উঠিল। কিন্তু এই জনরব সম্পূর্ণ অমূলক ছিল। কর্ণেল হ্যানে এই জনরব সত্য মনে করিয়া কলিকাতা পৌঁছিয়াই উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিল।

কাহারও অপমৃত্যু হইলে শাস্ত্রানুসারে তাহার শ্রাদ্ধের কোন বিধান দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং কোন ইংরাজ ইতিহাসলেখকই কর্ণেল হ্যানের শ্রাদ্ধ করিতে সাহস করিলেন না। তাঁহারা সকলেই কর্ণেল হ্যানেকে নর পিশাচ বলিয়া অভিহিত করিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষে বিবিধ প্রকারের লোক এবং বিবিধ প্রকারের শাস্ত্র রহিয়াছে। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে বঙ্গদেশের রাজা দেবীসিংহ সদৃশ অযোধ্যা নিবাসী আবুতালিব কর্ণেল হ্যানের আসিষ্টাণ্ট ছিলেন। কাপ্তেন রিচার্ডসনের মত গ্রহণানন্তর এবং অযোধ্যার মন্ত্রীর পদ লাভের প্রত্যাশায়, আবুতালিব কর্ণেল হ্যানের শ্রাদ্ধের মন্ত্র পাঠ করিলেন। তাঁহার গাফিলিকা কৈফিয়াত নামা পুস্তকে * কর্ণেল হ্যানকে যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া তিনি শাস্ত্রানুসারে তাঁহার যথোচিত শ্রাদ্ধ করিলেন। আবুতালিব পিণ্ড প্রদান না করিলে আর কর্ণেল হ্যানের কখনও শ্রাদ্ধ হইত না। ভারতের হিন্দু এবং মুসলমানগণ বোধ হয় কেবল শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পাদনার্থ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। এক এক জন শ্বেতাঙ্গ পুরুষের স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন কালে, দেশের প্রধান প্রধান হিন্দু এবং মুসলমানগণকে প্রায়ই টাউনহলে সমবেত হইয়া তাঁহাদের শ্রাদ্ধের মন্ত্র পাঠ করিতে দেখা যায়।

* আবু তালিবের এই পারস্য পুস্তক এটাওয়ার মাজিষ্ট্রেট হুই সাহেব ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়াছেন।

পঞ্চত্রিংশত্তম অধ্যায়।

নারী-ধর্ম্ম।

অন্নকষ্ট কি ভয়ানক দুরবস্থা! অন্নকষ্টে পড়িয়া মানুষ সর্ব্বদাই মনুষ্যত্ব বিবর্জ্জিত হয়। দারিদ্র্য এবং অন্নকষ্ট মানুষের সমুদয় সদ্‌গুণকে বিনাশ করে, হৃদয়কে দয়া, মায়া, স্নেহ পরিশূন্য করে; এবং অন্তরাত্মা পরিশুষ্ক করে।

এ সংসারের এই অন্নকষ্ট এবং দারিদ্র্য কি মানুষের অপরিহার্য্য এবং অখণ্ডণীয় দৌর্ভাগ্য? যদি তাহা হয়, তবে কে অস্বীকার করিতে পারে যে ঈদৃশ নরক তুল্য, এই প্রকার দুঃখ যন্ত্রণা পরিপূর্ণ সংসারের স্রষ্টা নিতান্তই নিষ্ঠুর। মানুষ কেবল আপন আপন অন্তরস্থিত কাপুরুষতা নিবন্ধনই এইরূপ স্রষ্টাকেও দয়াময় বলিয়া অভিহিত করে। কিন্তু এ অন্নকষ্ট কিরূপে সমুদ্ভূত হইয়াছে? এ ঘোর অন্নকষ্ট কি ঈশ্বরের বিধান? না মানুষের স্বীয় স্বীয় কর্ম্মফল?

ইংরাজদিগের অত্যাচার এবং অর্থ গৃধ্নুতা নিবন্ধন রোহিলখণ্ড এবং অযোধ্যার অধিবাসীগণ এখন মানব প্রকৃতি বিবর্জ্জিত হইয়া পড়িয়াছে। অন্নকষ্ট এবং দারিদ্র্য তাহাদিগের হৃদয় দয়া মায়া শূন্য করিয়াছে। জননী ক্রোড়স্থিত শিশুকে বিক্রয় করিয়া উদর পূর্ত্তির উপায় করিতেছে, সন্তান চলৎশক্তিহীন বৃদ্ধ পিতা মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া আহারান্বেষণে স্থানান্তরে চলিয়া যাইতেছে। স্বামী, স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতেছে; স্ত্রী, স্বামীকে পরিত্যাগ করিতেছে। এ দিকে দেশের মধ্যে যে সকল লোকের শরীরে অপেক্ষাকৃত অধিকতর বল আছে, তাহারা দস্যুবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক কি স্বদেশীয় কি বিদেশীয় কি পথিক কি তীর্থযাত্রী সমুদয় লোকের অর্থ অপহরণ করিতেছে। অযোধ্যা এবং রোহিলখণ্ড ভূত প্রেতের আবাস স্বরূপ শ্মশানভূমি হইয়া পড়িয়াছে। দুইজন পথিক অত্যন্ত আক্ষেপ করিতে করিতে মনোদুঃখে এই শ্মশান স্বরূপ সুবিস্তীর্ণ দিগ্ দিগন্তর ব্যাপ্ত প্রদেশের মধ্যস্থিত রাজপথ দ্বারা সন্ন্যাসীর বেশে পশ্চিম হইতে ক্রমেই পূর্ব্বদিকে চলিয়াছেন। ইহারা বেরিলী হইতে যাত্রা করিয়া কয়েকদিনের

মধ্যে লক্ষ্ণৌ পৌঁছিলেন। পরে লক্ষ্ণৌ হইতে আজ প্রত্যুষে ফায়েজাবাদে আসিয়াছেন।

ফায়েজাবাদে নবাব বাড়ীর দক্ষিণ সিংহদ্বারের বাহিরেই চক্‌ বাজার। এই চক্‌ বাজারের একখানি দোকানের নিকট দাঁড়াইয়া এই সন্ন্যাসীদ্বয়ের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ক্ষীণকায় ব্যক্তি, স্থূলকায় সন্ন্যাসীকে বলিতেছেন—"চল ঠাকুর, আগে তোমাকে আমি সেই ভগ্নগৃহে লইয়া যাইয়া আমার বাছার হস্তলিপি দেখাইব। বাছার হাতের অক্ষর কি সুন্দর।

দ্বিতীয় সন্ন্যাসী বলিলেন "সে কি বাঙ্গালা অক্ষর?

প্রথম। হাঁ স্পষ্ট বাঙ্গালা অক্ষর। আট বৎসরের বালকও তাহা পাঠ করিতে পারে।

দ্বিতীয়। আমি যে একেবারেই বাঙ্গালা অক্ষর চিনি না। দেবনাগর হইলে পাঠ করিতে পারিতাম।

প্রথম। আমি তোমাকে পাঠ করিয়া শুনাইব। তুমি চল; আর এখানে বিলম্ব করিলে কি হইবে? সে বৎসর এখানে অসংখ্য অসংখ্য দোকান দেখিয়া গিয়াছি। কিন্তু এ বাজার যে, একেবারে জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছে।

দ্বিতীয়। সে ভগ্নগৃহ এখান হইতে কতদূর?

প্রথম। প্রায় এক ক্রোশ পশ্চিমে। এক ক্রোশ অপেক্ষাও দূর হইবে। যে স্থানের নিকট দিয়া সরযু নদী দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইয়াছে, তাহারই নিকট।

দ্বিতীয়। পথ পর্য্যটনে বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। সেখানে তো আর কোন বাজার নাই। এখানে স্নান আহারাদি করিয়া অপরাহ্নে সেখানে যাইব। সে হস্তাক্ষর দেখিয়া তো কিছু নির্ণয় করিতে পারিব না। বরং এখানে কিছুকাল থাকিয়া, ফরক্কাবাদের নবাব কন্যা এখানে কোথাও আছেন কি, না, কিম্বা কখনও এখানে ছিলেন কি, না; তাহা লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে পারিব।

ইহারা যে দোকানের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছেন, তাহার নিকটস্থ রাজপথ দ্বারা ভদ্রোচিত পরিচ্ছদ পরিহিত একটী মুসলমান যুবক নবাবের প্রাসাদের দিকে যাইতেছিলেন। তাঁহার পরিচ্ছদ দেখিলে ঠিক নবাব পুত্র বলিয়া বোধ হয়। তিনি "ফরক্কাবাদের নবাব কন্যা" এই কথা ইহাদিগকে বলিতে শুনিয়া ইহাঁদিগের মুখের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। ইহাদিগের

বিদেশীয় পরিচ্ছদ, এবং বিদেশীয় ভাষা তাঁহার মনাকর্ষণ করিল। ইহাদিগের সঙ্গে কথা বলিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—

"ঠাকুর তোমরা কোথা হইতে আসিয়াছ?

সন্ন্যাসীদ্বয় মধ্যের দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিলেন, "আমরা হরিদ্বার হইতে আসিয়াছি।"

যুবক। এখানে তোমরা কাহার অন্বেষণ করিতেছ?

দ্বিতীয় সন্ন্যাসী। আজ্ঞে আমরা পথিক।

যুবক। ফরক্কাবাদের নবাব-কন্যার কথা বলিলে কেন? তোমরা কি রোহিলখণ্ডের লোক?

প্রথম সন্ন্যাসী। আজ্ঞে শুনিয়াছি ফরক্কাবাদের নবাব কন্যা এখানে থাকেন। আমাদের বঙ্গদেশের একটী লোক তাঁহার বাড়ীর দেওয়ান হইয়াছেন।

যুবক এই কথা শুনিয়া ঈষৎহাস্য করিয়া বলিলেন "হাঁ তোমার দেশীয় লোক ফরক্কাবাদের নবাব কন্যার দেওয়ান হইয়াছেন।"

যুবককে হাসিতে দেখিয়া এই ক্ষীণকায় সন্ন্যাসী মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন "ইহার হাস্য করিবার আর কোন কারণ নাই। বোধ হয় আমার পুত্র ফরক্কাবাদের নবাব কন্যার উপপতি হইয়া থাকিবেন; কিন্তু আমি দেওয়ান বলিয়াছি সেই জন্যই হাসিয়াছেন। ইনি অবশ্য ফরক্কাবাদের নবাব কন্যা এবং আমার পুত্র কোথায় আছেন তাহা নিশ্চয়ই জানেন।"

কিন্তু যুবকের হাস্য করিবার কারণ তাহা নহে। এই যুবক খোজা দারাবালি খাঁ। ইনি বেগমের খোজা। নবাব বাড়ীর খোজাগণের বড় সম্মান। ইনি প্রাতঃকালে গোলাপ বাগানে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। এখন গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় এই সন্ন্যাসীদ্বয়কে ফরক্কাবাদের নবাব কন্যার নাম করিতে শুনিয়া, ইহাদিগের সঙ্গে কথা বার্ত্তা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইনি বিলক্ষণ জানেন যে হাফেজ রহমত খাঁর কন্যাই ফরক্কাবাদের নবাব কন্যা বলিয়া পরিচিত। হাফেজ রহমত খাঁর কন্যার স্মৃতি ইহার মনে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। কারণ তাহার হাতে নবাব সুজা উদ্দৌলার মৃত্যু হইয়াছে। বউ বেগম সর্ব্বদাই এখন কথায় কথায় হাফেজ কন্যার নাম করেন। সর্ব্বদাই হাফেজ নন্দিনীর মৃত্যু ঘটনা উল্লেখ করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করেন। ইহার হাস্য করিবার কারণ আর কিছুই নহে। সন্ন্যাসী বলিয়াছেন তাঁহার দেশীয়

লোক ফরক্কাবাদের নবাব কন্যার দেওয়ান। কিন্তু ফরক্কাবাদের নবাব কন্যার প্রায় ছয় বৎসর হইল মৃত্যু হইয়াছে। সুতরাং সেই জন্য ইনি হাস্য করিয়াছেন।

এই সন্ন্যাসীদ্বয়কে, পাঠকগণ বোধ হয় এখন সহজেই চিনিতে পারিবেন। ইহাদের মধ্যে ক্ষীণকায় সন্ন্যাসী বাণেশ্বর ভট্টাচার্য্য। আর স্থুল-কায় সন্ন্যাসীই শ্রীনিবাস পণ্ডিত। ইহারা অযোধ্যার ভিন্ন ভিন্ন দেশ ভ্রমণ করিয়া আজ ফায়েজাবাদে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। অযোধ্যার লোকের অন্নকষ্ট দেখিয়া শ্রীনিবাসের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।

বাণেশ্বর দারাবালীকে হাস্য করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয় হাসিলেন কেন? ফরক্কাবাদের নবাব কন্যা কি ভাল লোক নহেন। আমি শুনিয়াছি তিনি আমাদের হিন্দুর সীতার ন্যায় সচ্চরিত্রা। তাঁর জন্যই তো জালালউদ্দিন মারা গেলেন।"

"জালালউদ্দিন মারা গেলেন" সন্ন্যাসীর মুখে আবার এই কথা শুনিয়া দারাবালী খাঁ একেবারে চমকিয়া উঠিলেন। তিনি আশ্চর্য্য হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, এ সন্ন্যাসী কিরূপে জানিলেন যে ফরক্কাবাদে নবাব কন্যার হাতে আমাদের নবাবের মৃত্যু হইয়াছে? কিন্তু মনের ভাব গোপন করিয়া সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ঠাকুর কোন জালালউদ্দিনের কথা বলিতেছ?"

বাণেশ্বর বলিলেন জালালউদ্দিনকে আমি কখন দেখি নাই। কিন্তু শুনিয়াছি তিনিও ফরক্কাবাদের নবাব কন্যার দেওয়ানী পাইবার প্রার্থনায় দরখাস্ত করিয়াছিলেন।

দারাবালিখাঁ সন্ন্যাসীর কথার কোন অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। তিনি তখন নবাব বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং কথায় কথায় বেগমের নিকট এই সন্ন্যাসীদিগের সমুদয় কথা বলিলেন।

বেগম এই সন্ন্যাসীদ্বয়ের কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন এবং অপ-রাহ্নে ইহাদিগকে নবাব বাড়ীর মধ্যে আনয়নার্থ দারাবালীকে হুকুম করিলেন। আজ প্রায় দুই তিন বৎসর যাবত বেগমের খোজাগণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং সন্ন্যাসী দেখিলেই বাড়ীর মধ্যে বেগমের নিকট আনিয়া হাজির করেন।

অপরাহ্নে বৃদ্ধ খোজা জহরালী এবং দারাবালীখাঁ স্বয়ং চক বাজারে

যাইয়া বাণেশ্বর এবং শ্রীনিবাসকে নবাবের বাড়ীর মধ্যে একেবারে তোষাখানায় লইয়া গেলেন।

নবাবের মৃত্যুর পর বউ বেগম ঠিক্ মুসলমানদিগের আচার ব্যবহারানুসারে একেবারে অন্দরের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতেন না। তিনি আপন নায়েব, গোমস্তা এবং জায়গীরের তহসীলদার প্রভৃতি সকলের সঙ্গেই পর্দ্দার অন্তরালে থাকিয়া কথা বলিতেন। বাড়ীর সদর নায়েব এবং অন্যান্য কর্ম্মচারীর সম্মুখেও উপস্থিত হইতেন। তিনি এখন বুড়া হইয়াছেন। সকলেই তাঁহাকে আপন জননীর ন্যায় মনে করেন। তিনিও সকলকে সন্তানের ন্যায় দেখেন।

বাণেশ্বর এবং শ্রীনিবাস নবাবের তোষাখানায় যাইয়া আপন আপন সঙ্গের মৃগচর্ম্ম বিছাইয়া বসিলেন। বউ বেগম এক পর্দ্দার অন্তরাল হইতে ইহাদিগকে দেখিতে লাগিলেন। দারাবালীখাঁ ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"ঠাকুর তোমরা গণনা করিতে পার? আমার হাত দেখিয়া বলতো দেখি, আমি কত বৎসর আর বাঁচিব?

শ্রীনিবাস বলিলেন "আমরা গণনা করিতে কিম্বা হাত দেখিতে জানি না।"

দারাবালী। তোমরাই আজ প্রাতে বলিতেছিলে না, যে ফরক্কাবাদে নবাব কন্যার জন্যই জালালউদ্দিন মারা গেল, কোন জালালউদ্দিন মারা গিয়াছে?

এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে বাণেশ্বর কিছু বলিলেন না। শ্রীনিবাস পণ্ডিত বলিলেন "বাছা, জালালউদ্দিন কে তাহা আমরা কিছু জানি না। আমাদের একটী লোক অনেক বৎসর হইতে নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। কোথাও তাঁহার অনুসন্ধান পাইতেছি না। তাঁহার হস্তের লেখার ন্যায় বাঙ্গালা অক্ষরে এই ফায়েজাবাদের একখানি গৃহের প্রাচীরে লিখিত রহিয়াছে—

"হাফেজ নন্দিনী সীতা। তাঁহার যে ধর্ম্ম নষ্ট করিবে তাহাকে নিশ্চয়ই মরিতে হইবে। জালাল উদ্দিন এবার আর তোমার নিস্তার নাই।"

"এই হস্তলিপি দেখিয়া আমরা সেই লোকটীর অনুসন্ধান করিতেছি। আমাদের বোধ হয় নবাব হাফেজ রহমত খাঁর কন্যাকেই তিনি হাফেজনন্দিনী বলিয়া লিখিয়াছেন। হাফেজ রহমতখাঁ ফরক্কাবাদের নবাব

ছিলেন। সেই জন্যই ফরক্কাবাদের নবাব কন্যা কোথায় আছেন তাহার অনুসন্ধান করিতেছি। ফরক্কাবাদের নবাব কন্যা কিম্বা জালালউদ্দিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে, হয়ত আমাদের লোকটীর ঠিকানা জানিতে পারিব।

দারাবালীখাঁ। ঠাকুর তোমরা রোহিলখণ্ডের লোক বড় মিথ্যাবাদী। প্রাতে তোমরা বলিয়াছ, যে, তোমাদের একটী লোক ফরক্কাবাদের নবাব কন্যার দেওয়ান। জালালউদ্দিনও তাঁহার দেওয়ান হইবার নিমিত্ত দরখাস্ত করিয়াছিলেন।

শ্রীনিবাস। আমার সঙ্গের এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আপনার নিকট তাহাই বলিয়াছিলেন। ইনি বিদেশীয় লোকের সঙ্গে কথা বলিবার সময় প্রায়ই ঠাট্টা তামাসা করিয়া দুই একটী মিথ্যা কথা বলিয়া থাকেন। আমি এখন আপনার নিকট যাহা বলিতেছি তাহাই সত্য কথা। আমরা ফরক্কাবাদের নবাব কন্যাকেও কখন দেখি নাই এবং জালালউদ্দিন কে তাহাও জানি না।

দারাবালী। ফরক্কাবাদের নবাব কন্যাকে কখনও দেখ নাই, তবে তিনি সীতা একথা কিরূপে বলিলে? ঠাকুর তোমাদের সকল কথা আমার মনে আছে। আমাকে ঠকাইতে পারিবে না।

শ্রীনিবাস। বাছা আমরা অর্থাকাঙ্ক্ষী নহি যে, তোমাকে ঠকাইতে আসিয়াছি। আমি প্রকৃত অবস্থা তোমাকে বলিলাম। তোমার ইচ্ছা হয় বিশ্বাস কর, না হয় আমার কথা মিথ্যা বলিয়া মনে কর। আমাদের ইহাতে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।

দারাবালী। ঠাকুর তুমি রাগ কর কেন? ফরক্কাবাদের নবাব কন্যাকে তোমরা দেখিয়াছ কি, না, তাহাই জিজ্ঞাসা করিলাম।

শ্রীনিবাস। বাছা আমরা তাঁহাকে দেখি নাই। তিনি কোথায় আছেন তাহাও জানি না।

দারাবালী। তবে তোমাদের সেই আত্মীয় লোক প্রাচীরে লিখিয়া রাখিয়াছেন ফরক্কাবাদের নবাব কন্যা সীতা, সেই জন্যই তাঁহাকে সীতা বলিয়াছ।

শ্রীনিবাস। হাঁ

দারাবালী। তিনি মুসলমানের কন্যা। তিনি কিরূপে সীতা হইলেন। সীতা তো তোমাদের দেবী। তোমারা "সীতা রাম" "সীতা রাম" বলিয়া পূজা কর না?

শ্রীনিবাস। বাছা, আমাদের হিন্দুদিগের স্ত্রীলোক সীতার ন্যায় সচ্চরিত্রা হইলেই, তাঁহাকে আমরা সম্মান করিয়া সীতা সদৃশী বলিয়া থাকি। স্ত্রীলোক দিগের অন্তরে সীতার তেজঃ দেখিলেই তাহাকে সীতা বলা যায়—

বেগম পর্দ্দার অন্তরাল হইতে সীতার তেজঃ এই কথা শুনিয়াই দারাবলীকে বলিলেন "সীতার তেজঃ কাহাকে বলে ওকে জিজ্ঞাসা কর"

দারাবালী খাঁ বেগমের আদেশানুসারে জিজ্ঞাসা করিলেন "ঠাকুর, সীতার তেজঃ কি? তোমরা সীতার তেজঃ কাহাকে বল?—"

শ্রীনিবাস। সীতার প্রকৃতিকেই সাধারণতঃ সীতার তেজঃ বলা যায়। সীতা নারীধর্ম্মের একটী অদ্বিতীয় আদর্শ। সুতরাং তাঁহার স্বভাব প্রকৃতি যে নারীর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়, তাঁহার অন্তরে সীতার তেজঃ আছে বলিয়া আমরা মনে করি। সীতা লক্ষ্মীস্বরূপা। যে নারীর মধ্যে তাঁহার লক্ষণ দেখিতে পাই, তাঁহাকেই আমরা লক্ষ্মীর তেজোংশ সম্ভূত বলিয়া থাকি।

বেগম পর্দ্দার অন্তরাল হইতে দারাবালীকে আবার বলিলেন "বামণকে এই কথাটা ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিতে বল। ওর সব কথা বোঝা যায় না।

দারাবালী শ্রীনিবাসকে বলিলেন "ঠাকুর আপনার এই কথা স্বয়ং বেগম শুনিতেছেন। তিনি আপনার সব কথা বুদ্ধিতে পারেন না। সীতার তেজঃ কি একটু ভাল করিয়া বুঝাইয়া বল ঠাকুর—"

শ্রীনিবাস। সীতার মধ্যে যে সকল সদ্‌গুণ ছিল তাহাই সীতার তেজঃ বলিয়া মনে করুন। যে স্ত্রীলোকের মধ্যে সেই সকল সদ্‌গুণ আছে তাহার মধ্যেই সীতার তেজঃ রহিয়াছে এইরূপ বলা যাইতে পারে।

পর্দ্দার অন্তরাল হইতে বেগম এবার স্বয়ং জিজ্ঞাসা করিলেন সীতার মধ্যে কি সদ্‌গুণ ছিল?

শ্রীনিবাস। সীতার মধ্যে অসীম পতিভক্তি, বিশুদ্ধ প্রেম, অত্যন্ত ত্যাগ-স্বীকার এবং জীবন্ত ধর্ম্ম বিশ্বাস ইত্যাদি সমুদায় সদ্‌গুণই ছিল। অর্থা-কাঙ্ক্ষা, ধন সম্পত্তির লিপ্সা তাঁহার অন্তরে একেবারেই ছিল না। ধন রত্নে কখনও তাঁহাকে বিমোহিত করিত না।

বেগম। এই সকল সদ্‌গুণ তো হিন্দু মুসলমান সকল জাতীয় স্ত্রীলোকের মধ্যেই আছে।

শ্রীনিবাস। হিন্দু মুসলমান যত স্ত্রীলোকের মধ্যে এই সকল সদ্‌গুণ আছে তাঁহারা সকলেই সীতা সদৃশী। তাঁহাদের সকলের মধ্যেই সীতার তেজঃ আছে বলিয়া আমরা মনে করি। তাঁহারা সকলে লক্ষ্মীস্বরূপা।

বেগম শ্রীনিবাসের এই শেষের কথা শুনিয়া, ভাবিতে লাগিলেন —"তবে আর সীতার তেজঃ তো কিছুই নহে। বামণ যে সকল সদ্‌গুণের কথা বলিল, তাহাই যদি কেবল সীতার তেজঃ হয়, তবে এই সকল সদ্‌গুণ তো কিছু না কিছু সকলের মধ্যেই আছে। সকলেই আপন স্বামীকে ভালবাসে, সকলেই ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে। তবে হিন্দুরা এত "সীতা রাম" "সীতা রাম" বলিয়া চীৎকার করে কেন? হয়তো এ বামণও সীতার তেজঃ কি, তাহা জানে না। একটা বামণ বলিল সীতার তেজঃ রামজী। আর একটা বামণ বলিল হনুমানজী সীতাকি তেজঃ হৈ। কিন্তু সে সকল বামণ অপেক্ষা ইহাকে কিছু ভাল বামণ বলিয়া বোধ হয়। এ লোকটা পয়সা কড়ির আকাঙ্ক্ষি নহে। স্বপ্নে কি ছাই মাটী দেখিলাম। স্বপ্নের কথা সকলই অমূলক। অনর্থক কেবল আজ দুই তিন বৎসর কাল এক একটা বামণ ধরিয়া আনিয়া, কেবল গোলমাল করিতেছি। কিন্তু যত যত বামণ ধরিয়া আনিয়াছে তাহাঁদের চেয়ে এই বামণটাকেই কিছু বুদ্ধিমান বলিয়া বোধ হয়। নারীধর্ম্ম কি? এবং নারীধর্ম্ম পালন করিতে কাফেরদিগের মতানুসারে কি কি কাজ করিতে হয়, তাহাও ইহার নিকটই জিজ্ঞাসা করিব। দেখি সে প্রশ্নের উত্তরে বামণ কি বলে।

এইরূপ চিন্তা করিয়া বেগম পর্দ্দার অন্তরাল হইতে নিজেই জিজ্ঞাসা করিলেন—"ঠাকুর নারীধর্ম্ম কি? এবং নারীধর্ম্ম পালন করিতে হইলে কি কাজ করিতে হয়?"

শ্রীনিবাস। রমণীগণ ঈশ্বর হইতে যে প্রকৃতি লাভ করিয়াছেন, সেই প্রকৃতি সংরক্ষণ করিতে পারিলেই তাঁহাদের নারীধর্ম্ম প্রতিপালন করা হয়।

বেগম। স্ত্রীলোকেরা ঈশ্বর হইতে কি প্রকৃতি লাভ করিয়াছেন? তোমার কথা কিছুই বুঝিতে পারা যায় না।

শ্রীনিবাস। মা! রমণীদিগের মধ্যে তিনটী গুণ না থাকিলেই তাঁহারা নারী-ধর্ম্ম বিবর্জ্জিত হইয়া পড়েন। বিশ্বাস, প্রেম, এবং পবিত্রতা এই তিনটী নারী প্রকৃতির প্রধান ধর্ম্ম। সূর্য্য হইতে চন্দ্র যদ্রূপ আলোক প্রাপ্ত হইয়া জগৎ আলোকিত করেন; নারী হইতেই পুরুষকে সেই প্রকার এই তিনটী

গুণ লাভ করিতে হয়। নারী অবলা, সুতরাং ঈশ্বরেতে জীবন্ত বিশ্বাসই তাঁহার একমাত্র বল, প্রেম তাঁহার অস্ত্র, এবং পবিত্রতা তাঁহার বর্ম্ম। এই তিনটী গুণই নারী প্রকৃতির বিশেষ ধর্ম্ম।

বেগম। বিশ্বাস, প্রেম এবং পবিত্রতা তো পৃথিবীর কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলের মধ্যেই আছে। পরমেশ্বরকে সকলেই বিশ্বাস করে, সকলেই আপন আত্মীয় স্বজনকে ভাল বাসে। সকলেই পবিত্র হইতে চেষ্টা করে। এই তিনটী গুণ নারী প্রকৃতির বিশেষ গুণ কিরূপে হইল।

শ্রীনিবাস। মা! এটী আপনার ভ্রম। বিশ্বাস প্রেম এবং পবিত্রতা যদি সকলের মধ্যেই থাকিত, তবে আর এই রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আজ হাহাকার শব্দ শুনা যাইত না। এ সংসারে দশটী স্ত্রী-লোকও নাই,যাহাদের প্রকৃত বিশ্বাস, প্রেম এবং পবিত্রতা আছে। আমাদের সীতারই কেবল বিশ্বাস, প্রেম এবং পবিত্রতা ছিল। সেই জন্যই আমরা মনে করি যে, সীতার তেজঃ যাহার মধ্যে আছে তিনিই কেবল নারী-ধর্ম্ম প্রতি-পালনে সমর্থা।

বেগম। তোমাদের সীতারই কেবল বিশ্বাস প্রেম এবং পবিত্রতা ছিল? আর কাহারও নাই কিরূপে বুঝিলে? তোমাদের সীতা কি করিয়াছেন?

বেগমের এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে শ্রীনিবাস সহাস্য মুখে বলিতে বলিলেন--"সীতা কি করিয়াছেন শুনিতে ইচ্ছা করেন? তবে শুনুন। সীতার জীবন্ত বিশ্বাস, নিঃস্বার্থ প্রেম এবং স্বর্গীয় পবিত্রতা ছিল বলিয়াই তিনি দুঃসাধ্য সাধন করিতে সমর্থা হইয়া ছিলেন। এ সংসারে নারীগণ অবলা। শারীরিক বল ও বীর্য্যে পুরুষাপেক্ষা তাঁহারা দুর্ব্বল। দুর্ব্বল প্রাণীকে স্বভা-বতঃই ভীরুতা এবং নীচাশয়তা প্রভৃতি ঘৃণিত পাপ সকল আশ্রয় করে। দুর্ব্বলতাই এক প্রকার মহাপাপ। কিন্তু পরমেশ্বর নারী জীবন দুর্ব্বলতা সম্ভূত বিবিধ পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত রাখিবার নিমিত্ত,শারীরিক বলের পরিবর্ত্তে নারীকে জীবন্ত বিশ্বাস প্রদান করিয়াছেন। নারীর হৃদয়স্থিত সেই জীবন্ত বিশ্বাস তাঁহার অন্তরে যেরূপ বল, যেরূপ সাহস প্রদান করিতে পারে, কেবল শারীরিক বল পুরুষকে কখন তত সাহস, তত বীর্য্য প্রদান করিতে পারে না। সুতরাং বিশ্বাসের আধিক্যতা প্রযুক্ত নারী অবলা হইয়াও পুরুষা-পেক্ষা শতগুণে অধিকতর সাহস প্রকাশ করিতে সমর্থা। কারণ শারীরিক বলের সীমা আছে। কিন্তু বিশ্বাস সম্ভূত বল অসীম এবং অপরিমেয়।

আসন্ন বিপদ, বিঘ্ন এবং ভবিষ্যতের চিন্তা পুরুষের মন অবসন্ন করিতে পারে। কিন্তু বিশ্বাস সম্ভূত অপরিসীম বল যাহার অন্তরকে বলীয়ান করে, বিপদ, বিঘ্ন, ভবিষ্যত চিন্তা কখন তাঁহাকে ভীত করিতে পারে না। যে নারীর জীবনে পুরুষাপেক্ষা অধিকতর সাহস বিকশিত হয় না, তিনি নিশ্চয়ই নারী-ধর্ম্ম বিবর্জ্জিত হইয়াছেন। রাম অপেক্ষাও সীতা সময়ে সময়ে অধিক সাহস প্রকাশ করিয়াছেন। রাম, রাক্ষস এবং দৈত্যদিগের ভয়ে সীতাকে সঙ্গে করিয়া বনে যাইতে ভয় প্রকাশ করিলে, সীতা উপহাস করিয়া বলিয়াছিলেন "রাম, তুমি এত কাপুরুষ; ইহা জানিলে পিতা আমাকে তোমার হাতে সমর্পণ করিতেন না।"

"এই জীবন্ত বিশ্বাস যদ্রূপ নারীগণের শারীরিক বলবীর্য্যের অভাব মোচন করে, সেই প্রকার প্রেম তাহার অস্ত্রের অভাব দূর করে। লৌহ বিনির্ম্মিত অস্ত্রের ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক মানুষকে সহজে বশীভূত করা যায় না। কিন্তু প্রেমাস্ত্র দ্বারা অত্যন্ত অদম্য প্রকৃতিকেও সহজে বাধ্য করা যাইতে পারে। নারীর সেই প্রেমাস্ত্রের নিকট জগৎ পরাজিত হইয়া রহিয়াছে। এই অলঙ্ঘ্য অস্ত্র দুশ্ছেদ্য এবং অনিবার্য্য। আর আত্মরক্ষার্থ পরমেশ্বর নারীকে পবিত্রতা স্বরূপ বর্ম্ম প্রদান করিয়াছেন। সে বর্ম্ম লৌহ গঠিত বর্ম্মাপেক্ষা শতগুণে অধিকতর কঠিন। যে নারীর সীতার ন্যায় জীবন্ত বিশ্বাসের বল, প্রেমের অস্ত্র এবং পবিত্রতার বর্ম্ম নাই, তিনিই ঈশ্বর প্রদত্ত প্রকৃতি ভ্রষ্ট হইয়া নারী-ধর্ম্ম বিবর্জ্জিত হইয়াছেন। শারীরিক বলের অভাব নিবন্ধন ভীরুতা নীচাশয়তা এবং ভবিষ্য চিন্তা তাঁহাকে সর্ব্বদাই মানসিক কষ্ট প্রদান করে। প্রেমাস্ত্র অভাবে তিনি সর্ব্বদা আপনাকে অসহায় বলিয়া মনে করেন। আর পবিত্রতার বর্ম্মহীন হইয়া প্রলোভনের নিকট তিনি সর্ব্বদাই পরাস্ত হইয়া রহিয়াছেন।

বেগম, শ্রীনিবাসের এই সকল কথা শুনিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। শ্রীনিবাসের সকল কথা তিনি বুঝিতেও পারিলেন না। কিন্তু তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, ইনি কাফের হইলেও সামান্য লোক নহেন। ইনি একজন অসাধারণ লোক হইবেন। কাফেরের উপর বেগমের যে একটু ঘৃণার ভাব ছিল, তাহা আজ অনেক পরিমাণে দূর হইল। সায়ংকালে তিনি শ্রীনিবাসকে আজ বিদায় দিবার সময় বলিলেন "আপনি অনুগ্রহ করিয়া আবার কল্য প্রাতে একবার এখানে আসিবেন।"

শ্রীনিবাস বেগমের কথায় সম্মত হইয়া বাজারে চলিয়া আসিলেন। বেগমের লোকেরাই বাজার মধ্যে তাঁহার রাত্র অবস্থানের স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন।

ষষ্ঠত্রিংশত্তম অধ্যায়।

বিশ্বাসই বল, প্রেমই অস্ত্র, পবিত্রতাই বর্ম্ম।

শ্রীনিবাসকে বিদায় দিয়া বেগম আহারান্তে শয়নাগারে প্রবেশ করিলেন। আজ রাত্রে আর শীঘ্র শীঘ্র তাঁহার নিদ্রা হইল না। তিনি শ্রীনিবাস পণ্ডিতের সমুদয় কথা মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

চিন্তাশীল লোক শাস্ত্রাধ্যয়ন না করিলেও শুদ্ধ কেবল আত্মচিন্তা এবং আত্মানুসন্ধান দ্বারা বিজ্ঞান, দর্শন এবং রাজনীতি সম্বন্ধীয় অনেকানেক নিগূঢ় তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়েন। আত্মচিন্তা এবং আত্মানুসন্ধান না থাকিলে সহস্র সহস্র পুস্তক পাঠ করিলেও লোকের জ্ঞান হয় না। চিন্তাহীন লোকের পুস্তক অধ্যয়ন কেবল একটী রোগের কারণ হইয়া পড়ে। অনেকানেক পুস্তক পাঠ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের মনে বৃথা অহঙ্কারের ভাব উপস্থিত হয়। পঞ্জাবের অধীশ্বর মহারাজ রণজিৎ সিংহ আপন নাম দস্তখত করিতে অসমর্থ ছিলেন। কিন্তু শুদ্ধ কেবল চিন্তাদ্বারা রাজনৈতিক কৌশল সম্বন্ধে এতাদৃশ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন যে, বর্ত্তমান সময়ের অতি সুশিক্ষিত নীতি বিশারদ পণ্ডিতগণকে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে হয়।

বউ বেগম অশিক্ষিতা রমণী হইলেও তাঁহার জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে তিনি বিশেষ আত্মচিন্তা ও আত্মানুসন্ধানের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার মন স্বভাবতঃ অত্যন্ত চিন্তাশীল ছিল, কোন বিষয় দেখিলে কিম্বা কিছু শুনিলে তাঁহার তত্ত্ব জিজ্ঞাসু মন তাহার তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইত। এই জন্যই স্বপ্নের মধ্যে কোন সত্যের আভাস আছে কিনা, তাহার অনুসন্ধানে তাঁহাকে আপন প্রকৃত্যানুসারে প্রবৃত্ত হইতে হইল। আজি শয়ন করিয়াই চিন্তা করিতে লাগিলেন—

"এপণ্ডিতের কথা তো স্পষ্ট কিছুই বুঝিতে পারিনা। সীতার হৃদয়ের সদ্‌গুণই সীতার তেজঃ। সীতার সেই সকল সদ্‌গুণ যে নারীর মধ্যে আছে

তিনিই নারীধর্ম্ম প্রতিপালনে সমর্থা। কিন্তু সীতার সে সকল সদ্‌গুণ তো সকল নারীর মধ্যেই আছে। সীতার না হয় সে সদ্‌গুণ অধিক পরিমাণে ছিল। অন্যান্য স্ত্রীলোকের কিছু কম আছে। আমার হৃদয়ে কি বিশ্বাস, প্রেম এবং পবিত্রতা নাই? আমি কি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি না? আমি কি লোককে ভাল বাসিনা? আমি কি কখন কোন অপবিত্র কার্য্য করিয়াছি?

"কিন্তু পণ্ডিতের একটী কথা সত্য বলিয়া বোধ হয়। পণ্ডিত বলিয়াছেন বিশ্বাসই নারীর বল, প্রেম নারীর অস্ত্র, পবিত্রতা নারীর বর্ম্ম। সে বিশ্বাস নারী হৃদয়ে এতদূর বল প্রদান করিবে যে তাঁহার অন্তরে ভীতি, ভাবনা, দুশ্চিন্তা কিছুই থাকিবে না। সে বিশ্বাস নারীহৃদয়ে সহস্র হস্তীর বল প্রদান করিবে। নারী তখন কাহাকেও ভয় করিবে না, কোন বিষয়ে ভাবনা চিন্তা করিবে না। এই রূপ বিশ্বাস অতি বিরল। কিন্তু মানুষের ঈশ্বরের উপর এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলে, বড়ই সুখের বিষয় হয়। আজ পাঁচ বৎসর কাল নবাবের মৃত্যু হইয়াছে। রাজ্য নষ্ট হইবে, এই দুশ্চিন্তায় আজ পাঁচ বৎসর কাল আমার একপ্রকার নিদ্রা নাই; আমার আহার নাই। ভীতি, ভাবনা, দুশ্চিন্তা নিবন্ধন সর্ব্বদাই যার পর নাই মনোকষ্ট সহ্য করিতেছি। কেনই বা আমি এত চিন্তা করিয়া কষ্ট পাইতেছি। কোরাণে তো স্পষ্ট লেখা রহিয়াছে—"ঈশ্বর সর্ব্বদাই বিশ্বাসীকে রক্ষা করেন"। বৃদ্ধ পণ্ডিতটা কাফের হইলেও ইহার কথা মিথ্যা নহে। একেবারে কোরাণের আসল কথাই বলিয়াছে। কাফের এ কোরাণের কথা কিরূপে জানিল? এতো ঠিক্ কোরাণের কথা। বিশ্বাসীর ভীতি ভাবনা, দুশ্চিন্তা কিছুই থাকে না।

"যে দিন নবাবকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত বক্সারে যাত্রা করিলাম, সেইদিন তো কোরাণের এই কথাই পাঠ করিয়াছিলাম। ঠিক্ মনে হইয়াছে, ঠিক্ মনে হইয়াছে। সেদিন সুরা ফাতের পাঠ করিয়াছিলাম। সুরা ফাতেরের মধ্যেই তো বোধ হয় লেখা রহিয়াছে "ঈশ্বর সর্ব্ববিষয়ে ক্ষমতাশালী। তিনি রক্ষা করিলে কে মানুষকে বিনাশ করিতে পারে।"

এই প্রকার চিন্তা করিবার সময় কোরাণ খুলিয়া বেগমের সুরা ফাতের পাঠ করিবার ইচ্ছা হইল। শিয়র হইতে কোরাণখানি বাহির করিয়া তাহার পাতা উল্টাইতে লাগিলেন। কোরাণ খুলিলে পরই সুরা আহজাবের একাংশ দৃষ্টিপথে পড়িল। সেস্থানে লিখিত রহিয়াছে "ধর্ম্মদ্বেষী-

দিগকে পরমেশ্বর ক্রোধ সহকারে ফিরাইয়া দিলেন। তাহারা কোন কল্যাণ লাভ করিতে পারিল না। বিশ্বাসীদিগের পক্ষ হইয়া পরমেশ্বর স্বয়ং যুদ্ধ করিলেন। তাহাতেই তাহারা জয় লাভ করিল।”

এই কয়েকটী কথা পাঠ করিয়া বেগম মনে মনে আবার বলিতে লাগিলেন—

“কাফের তো ঠিক্ কথা বলিয়াছে। কাফের পণ্ডিতটা আমাদের কোন মৌলবীর কাছে কোরাণের কথা শুনিয়া থাকিবে। কোরাণের প্রায় সকল সুরার মধ্যেই তো লেখা রহিয়াছে। বিশ্বাসীর অন্তরে ভয় ভাবনা চিন্তা প্রবেশ করে না। ঈশ্বরই বিশ্বাসীর সহায়।”

বেগম মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন। এদিকে হস্ত দ্বারা ধীরে ধীরে কোরাণের পাতা উল্টাইতেছেন। পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে সুরা ফাতের বাহির করিলেন। প্রায় অন্যূন এক ঘণ্টা বসিয়া সুরা ফাতের পাঠ করিতে লাগিলেন। কয়েক পৃষ্ঠা দুই তিনবার পাঠ করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন।

“সুরা ফাতেরের মধ্যে তো পণ্ডিতের সকল কথাই আছে—

“ঈশ্বর সর্ব্ব বিষয়ে ক্ষমতাশালী”—ঈশ্বর মানুষকে দয়া করিলে কেহ তাহা নিবারণ করিতে পারে না”—“ঈশ্বর মানুষকে রক্ষা করিলে অন্য কেহ তাহার কিছু করিতে পারে না”—“হে মানব ঈশ্বরের অঙ্গীকার কখনও মিথ্যা হয় না”—“সাবধান পৃথিবী যেন তোমাকে প্রতারণা করে না”—“পৃথিবী শয়তান”—“শয়তান তোমার শত্রু।” “ধর্ম্মদ্রোহীর জন্য কঠিন শাস্তি অপেক্ষা করিতেছে”—“ঈশ্বর দিনকে রাত্রি করিতে পারেন। রাত্রিকে দিন করিতে পারেন”—“তিনিই তোমার বল ভরসা”—“তাঁহার উপর বিশ্বাস করিলে কেহ তোমার কিছু করিতে পারিবে না”—

সুরা ফাতেরের স্থানে স্থানের এই উপরোক্ত কথা কয়েকটী আবৃত্তি করিয়া বেগম ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ তাঁহার স্বামী বিয়োগ শোক তাঁহার হৃদয়মধ্যে উপস্থিত হইল। তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন।

“হা সে দিন সেই ঘোর বিপদকালেও, আমার মনে কত সাহস, কত উৎসাহ, কতই আনন্দের ভাব উপস্থিত হইয়াছিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে

বাঁদীর পোষাক পরিলাম। জহরালী বলিল, আমেতু ঠিক্ তোমাকে এখন একটা বাঁদীর ন্যায় দেখা যায়। গৃহ হইতে বাহির হইবার সময় সুরা ফাতের পাঠ করিলাম। সুরা ফাতেরের এই সকল কথা পাঠ করিবামাত্র কত সাহস, কত উৎসাহের ভাবই আমার মনের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল। জহরালী বলিল আমেতু, বড় বিপদের পথ অবলম্বন করিলে। আমি বলিলাম, ফিরিঙ্গী কাফের। কাফেরকে আবার ভয়। খোদা আমার সঙ্গে সঙ্গেই আছেন।

"যৌবনকালেই বুঝি মানুষের সাহস থাকে। বুড়া হইলেই বোধ হয় মানুষ নিস্তেজ হইয়া পড়ে। সেই প্রকার সাহস আমার এখন থাকিলে কি, আর দিন রাত্রি এই ফিরিঙ্গীর ভয়ে এত দুশ্চিন্তা হইত। ভাবনা চিন্তায় আমার শরীর একেবারে ক্ষয় হইল। সে সাহস, সে উৎসাহ তো একেবারেই চলিয়া গিয়াছে। বুড়া হইলে মানুষের শরীরের বল বীর্য্য থাকে না। তাহাতেই বোধ হয় মানুষ এত নিস্তেজ হইয়া পড়ে। কিন্তু সে সময়েই আমার শরীরে এমন একটা অধিক কি বল ছিল। সে সময় তো আমি অস্থি চর্ম্ম সার হইয়া পড়িয়াছিলাম। আসফউদ্দৌলার জন্মিবার পর অন্ততঃ বার তের বৎসর আমার শরীর দুর্ব্বল ছিল। বরং সে সময়ের অপেক্ষা এখনই শরীরে অধিক বল রহিয়াছে। দূর হউক শরীরের বল—ও শরীরের বল কিছুই নহে। বুড়া হইলে মানুষের বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পায়। তাহাতেই বোধ হয় এ দশা ঘটে। কিন্তু তাহাই কিরূপে বলা যায়। বুড়া হইলে মানুষের বুদ্ধি বিবেচনা পরিপক্ক হয়। কেন যে আমার সেই যৌবনকালের সাহস, উৎসাহ চলিয়া গেল? কেন যে আমি এখন দিবারাত্র কেবল দুশ্চিন্তা এবং দুর্ভাবনায় শরীর ক্ষয় করিতেছি, কিছুই বুঝিতে পারি না।"

বেগম মনে মনে এই রূপ ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রা যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু চিন্তার স্রোত একবার মনের মধ্যে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইলে, লোক শত চেষ্টা করিয়াও নিদ্রা যাইতে পারে না। চিন্তা সর্ব্বদাই শয্যা হইতে নিদ্রাকে দূর করে। নিদ্রা চিন্তার শয্যা হইতে সর্ব্বদাই পলায়ন করে। বেগমের নিদ্রা হইল না। তিনি শয্যার উপর শয়নাবস্থায় ছট্ ফট্ করিতে লাগিলেন। চিন্তা এ দুগ্ধফেননিভ শয্যাকে কণ্টক শয্যা করিয়া তুলিল। বেগম আবার কোরাণ খুলিয়া সুরা ফাতের পাঠ করিতে লাগিলেন। আবার পাঠ করিলেন।

"ঈশ্বর মানুষকে রক্ষা করিলে অন্য কেহ তাহার কিছুই করিতে পারে না"।

এই কথা পাঠ করিয়াই এবার ঠিক যেন বেগম মোহ নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইলেন। হঠাৎ তিনি বলিলেন—

"পণ্ডিত ঠিক কথাই বলিয়াছে। বিশ্বাসই একমাত্র অবলার বল।"

আমি যে বল বুদ্ধির বিষয় এতক্ষণ চিন্তা করিলাম, সে বল বুদ্ধি সকলই বৃথা। আমরা স্ত্রীলোক। আমাদের শরীরে বল নাই। আমরা অস্ত্র-ধারণ করিতে জানি না। পরমেশ্বর পরম দয়ালু। তাই তিনি স্ত্রীলোকদিগকে বিশ্বাস প্রদান করিয়া বলের অভাব মোচন করিয়াছেন। পুরুষের বল আছে। সেই জন্য তাহাদের বিশ্বাস বড় কম। বক্‌সার হইতে পলাইয়া আসিবার সময় নবাব সর্ব্বদাই শঙ্কিত ছিলেন। তাঁহার মুখে হাসি ছিল না। তিনি রাত্রে স্বপ্নেও "ইংরাজ সৈন্য আসিয়া পৌঁছিয়াছে, ইংরাজ সৈন্য আসিয়া পৌঁছিয়াছে" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেন। তাঁবুর নিকট কোন একটা শব্দ শুনিলে চমকিয়া উঠিতেন। আমি তখন তাঁহার সে অবস্থা দেখিয়া, সে দুঃখের সময়ও, হাসি সম্বরণ করিতে পারিতাম না। তিনি আমাকে হাস্য করিতে দেখিয়া বলিতেন—

"আমেতু, তোমার বড় সাহস, কিছুতেই তোমাকে ভীত করিতে পারে না।" আমি বলিতাম "কাফেরকে আবার ভয় করিব? খোদা আমার সঙ্গে সঙ্গেই আছেন।"

ঠিক হইয়াছে; ঠিক হইয়াছে। এ কাফের পণ্ডিত সাধারণ লোক নহে। ঠিক কথা বলিয়াছে। কোরাণের আসল কথা বলিয়াছে। বিশ্বাসই নারীর বল। শরীরের বল কিছুই নহে। বিশ্বাসই একমাত্র বল। কাফের বলিয়াছে ভালবাসা নারীর অস্ত্র। সেও তো ঠিক কথা। এ কথা তো জগদম্বা বেগমও বলিয়াছেন।

যে দিন বক্‌সার হইতে পলায়ন করিয়া আমরা ফায়েজাবাদে আসিয়া পৌঁছিলাম, সে দিন মস্‌জিদ হইতে নেমাজ করিয়া আসিয়াই নবাব বলিলেন,—"আমেতু আজ খোদার সাক্ষাতে তোবা করিয়াছি, তোমার কোন কথা আর লঙ্ঘন করিব না। আমার রাজপদ ধনসম্পত্তি সকলই তোমার। আমার নিমিত্ত যে তুমি প্রাণ দিতে পার, তাহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছি। তুমিই এ রাজ্য রক্ষা করিতে পারিবে। আমি প্রাণ থাকিতে আর তোমার অমতে কোন কার্য্য

করিব না। বল আমি কি করিলে তুমি সুখী হইবে। তুমি যাহা করিতে বলিবে, তাহাই করিব। আমার তখন একবার মনে হইয়াছিল যে, নবাবকে বলি তুমি আর খোর্দ্দ মহলে যাইতে পারিবে না। রাজকার্য্যাবসানে সর্ব্বদা আমার কাছে আসিয়া বসিবে। কিন্তু সে কথাটা বলিতে আমার লজ্জাবোধ হইতে লাগিল। তখন ভাবিলাম, নবাব আমাকে কামাসক্ত স্ত্রীলোক বলিয়া মনে করিবেন। পূর্ব্ব হইতে নবাবের ব্যভিচার দেখিতে দেখিতে আর খোর্দ্দ মহালের প্রতি আমার পূর্ব্বের ন্যায় ঘৃণা ও বিদ্বেষের ভাব ছিল না। সে বিষয়ে আর আমার তখন ভ্রূক্ষেপও ছিল না। আমার বিবাহের পরদিন যদি নবাব আমাকে এই কথা বলিতেন, তবে তাঁহার পদতলে পড়িয়া বলিতাম "জাঁহাপনা এ বাঁদীর বুকে ছুরী না দিয়া তুমি কখন আর উপপত্নী আনিতে পারিবে না। জগদম্বা বেগম সত্য কথাই বলিয়াছেন। পাপ ও কুকার্য্য দেখিতে দেখিতে, পাপকে পাপ বলিয়া ঘৃণা হয় না, কুকার্য্যকে কুকার্য্য বলিয়া মনে হয় না। কয়েক বৎসর পরে নবাবের ব্যভিচারের প্রতি আমার একটুও ঘৃণা ছিল না।

"আমি ভালবাসার অস্ত্র দ্বারা নবাবকে একেবারে বান্ধিয়া ছিলাম। কিন্তু বৃথা লজ্জা নিবন্ধন সে দিন তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলাম। সে দিন আমি নিশ্চয়ই তাঁহাকে পরস্ত্রীগমন হইতে বিরত করিতে পারিতাম। ধিক্ সে বৃথা লজ্জা। স্বামীর নিকট স্ত্রীর লজ্জা করা মহাপাপ। স্বামীকে মনের কথা বলিতে যে স্ত্রীলোক লজ্জা করিবে তাহাকে আমার ন্যায় দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হইবে। আমি নবাবকে হাতের মধ্যে পাইয়া তখন ছাড়িয়া দিলাম। হায় হায়! সে দিন যদি এই বিষয়ে আঁটা আঁটী করিতাম, তবে কি আর এ বিপদ ঘটিত? তবে কি আর নবাব হাফেজ নন্দিনীর জন্য পাগল হইতেন? তবে কি আর নবাবের অকালে মৃত্যু হইত? নবাবের অকাল মৃত্যু এবং রাজ্য নষ্ট সমুদয়ই আমার দোষে হইয়াছে।

"আজ কাফেরের কথা শুনিয়া আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। বিশ্বাসই স্ত্রীলোকের বল। এই বল ছিল বলিয়াই তখন আমি বক্সারে যাইতে সমর্থা হইয়াছিলাম। আমার বিশ্বাস ছিল যে ঈশ্বর আমাদের। কাফেরের হস্ত হইতে তিনি নিশ্চয়ই আমাকে রক্ষা করিবেন। কাফের ঈশ্বরের শত্রু।

পণ্ডিতের দ্বিতীয় কথাও সত্য। প্রেমই নারীর অস্ত্র। এই প্রেম অস্ত্র দ্বারাই তো নবাবকে বান্ধিয়া ছিলাম। নবাব চিরকালই অদম্য কুপ্রবৃত্তির

বশীভূত ছিলেন। তিন শত স্ত্রীলোককে আনিয়া খোর্দ্দ মহল পরিপূর্ণ করিলেন, তত্রাচ নূতন নূতন স্ত্রীলোক দেখিলেই তাহাদিগকে খোর্দ্দ মহলে আনিয়া রাখিতেন। তাঁহার এইরূপ অদম্য কাম প্রবৃত্তিকে আমি অনায়াসে বশীভূত করিয়াছিলাম। একবার যদি মুখ খুলিয়া, লজ্জা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সে দিন বলিতাম "জাঁহাপনা এ বাঁদী তোমার ধন রত্ন রাজ্যপদ চাহে না। এ বাঁদীর ধন রত্ন রাজ্যপদে কোন প্রয়োজন নাই। এ বাঁদীর এই মাত্র আরজ। এ বাঁদীকে ছাড়িয়া রাজকার্য্যাবসানে দিন দিন খোর্দ্দ মহলে যাইতে পারিবে না।" সে দিন নবাব নিশ্চয়ই আমার অনুরোধ রক্ষা করিতেন। নবাব মস্‌জিদে নেমাজের সময় তোবা করিয়াছিলেন যে, আমার কোন কথা লঙ্ঘন করিবেন না। সে দিন এ খোর্দ্দ মহল আমি উঠাইয়া দিতে পারিতাম।

"সেই দিন ধন রত্ন রাজ্যপদের কথা শুনিয়াই আমার মন উল্লাসিত হইয়া উঠিল। আমি ধনরত্ন রাজ্যপদের নাম শুনিয়া আহ্লাদে আটখানা হইয়া পড়িলাম; ধন রত্নই আমাকে তখন ভুলাইল। সে দিন যে উপায় অবলম্বন করিলে, নবাবকে অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে পারিতাম, সে উপায় অবলম্বন করিলাম না। দূর হউক এ ধন রত্ন। পণ্ডিত ঠিক বলিয়াছে। সীতা অর্থাকাঙ্ক্ষিণী ছিলেন না। সুতরাং তিনি নারী-ধর্ম্ম প্রতিপালনে সমর্থা ছিলেন। ধিক্ এ জীবন। স্ত্রীলোক অর্থাকাঙ্ক্ষিণী হইলেই সে বেশ্যা।

"আজ জগদম্বা বেগমের কথার অর্থ বুঝিলাম। জগদম্বা বেগম আমাকে প্রায়ই বলিতেন "তুমি নারী-ধর্ম্ম বিসর্জ্জন করিয়াছ।"

"আমি তখন হাসিতাম। আমি মনে করিতাম যাহারা বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করে তাহারাই কেবল নারী ধর্ম্ম বিবর্জ্জিত হয়। কিন্তু জগদম্বা বেগমের কথার নিগূঢ় তত্ত্ব এখন আমার হৃদ্বোধ হইল। জগদম্বা বেগমের মুখে দিন দিন এই কথা শুনিতাম। তাহাতেই বোধ হয় স্বপ্নেও দেখিয়াছিলাম যে হাফেজনন্দিনী বলিতেছে—"নারী-ধর্ম্ম বিসর্জ্জন করিয়া তুমি বিনাশের দিকে চলিয়াছ।"

"জগদম্বা ঠিক কথাই বলিয়াছিলেন। পণ্ডিতের এক কথাও মিথ্যা নহে। বিশ্বাসই নারীর বল, প্রেমই নারীর অস্ত্র এবং পবিত্রতা তাহার বর্ম্ম। সেই বিশ্বাস এবং প্রেম বিবর্জ্জিত হইয়া আমি নারী-ধর্ম্মচ্যুত হইয়াছি। একমাত্র পবিত্রতার বর্ম্মই বুঝি এখন আমার আছে। কিন্তু বল এবং অস্ত্রশূন্য সিপাহী

কি কেবল বর্ম্ম পরিধান করিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারে? কখন না, কখন না!

"আজ বুঝিলাম স্ত্রীলোক অর্থাকাঙ্ক্ষিণী হইলেই, সে নারী-ধর্ম্ম বিবর্জ্জিতা হয়। অর্থাকাঙ্ক্ষিণী স্ত্রীলোক বেশ্যা। সে ধর্ম্মপত্নী নহে। হায় হায় নবাব যখন সে দিন সমুদয় ধন রত্ন প্রদান করিলেন, তখন যদি একবার তাঁহার পায়ে পড়িয়া বলিতাম "জাঁহাপনা এ বাঁদীর ধন রত্নে প্রয়োজন নাই। বাঁদী কেবল তোমাকেই চাহে।" তবে তো সকল দিকই বজায় থাকিত। এই ধন রত্ন আমাকে তখন এত উল্লাসিত করিল, আমার আর সে কথা বলিতে মনে হইল না। লোকে তখন আমাকে নবাবের ঋণদাতা বলিয়া মনে করিত। আমি ত সত্য সত্যই সেই সময় হইতে নবাবের কেবল ঋণদাতা হইয়া পড়িয়াছিলাম। তখন আমাদের পরস্পরের মধ্যে তো স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ একেবারেই ছিল না।

"এ সংসারের ধন রত্ন মানুষের মন বড় মোহিত করে। মানুষের হৃদয়কে প্রেমোচ্ছ্বাস শূন্য করে। ধন রত্ন প্রাপ্তির পর কেমন করিয়া তাহা রক্ষা করিব; কাহার জিম্মায় কোন সম্পত্তি রাখিব; সেই চিন্তাতেই তো আমার দিবা রাত্র অতিবাহিত হইত। নবাব দিবা রাত্র খোর্দ্দ মহলে পড়িয়া থাকিলেও তাঁহার অনুসন্ধান করিতাম। মনে করিতাম আমিই সর্ব্ব প্রধানা বেগম। প্রধান বেগমের পদ পাইয়াছি। কিন্তু এ সংসারের পদ প্রভুত্ব বিষবৎ। এই পদ প্রভুত্বের গর্ব্বই আমাকে নারী-ধর্ম্ম বিবর্জ্জিত করিল। ধন রত্ন রক্ষার চিন্তা দিন দিন আমার জীবন্ত বিশ্বাসকে ক্ষয় করিতে লাগিল। ধন রত্নের চাপা পড়িয়া আমার হৃদয় উচ্ছ্বাসহীন হইল।

"আজ জগদম্বা বেগমের কথা ঠিক হইল। মহম্মদ আমাদের আম নবী। আর মানুষই মানুষের খাষ নবী। এই কাফের পণ্ডিত আমার খাষ নবী হইল। ইহার কথাতেই আমি আপন ভ্রম বুঝিতে পারিলাম। আমি সত্য সত্যই বিশ্বাস এবং প্রেম বিবর্জ্জিত হইয়া পড়িয়াছি।"

বেগম রাত্রি প্রায় তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত জাগ্রত থাকিয়া এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। অত্যল্প রাত্রি থাকিতে তাঁহার নিদ্রাবেশ হইল। তিনি নিদ্রিতা হইয়া পড়িলেন।

বঙ্গীয় পাঠকগণ বউ বেগমের এই চিন্তার কথা পাঠ করিয়া হয়ত মনে করিবেন যে, অশিক্ষিতা মুসলমান স্ত্রীলোকের মনে কি কখনও এইরূপ

চিন্তার উদয় হইতে পারে? কিন্তু চিন্তাশীল মন চিন্তা দ্বারা সকল শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব অনুভব করিতে সমর্থ হয়।

বর্ত্তমান সময়ের সুশিক্ষিত বলিয়া পরিচিত চিন্তাহীন বাঙ্গালীদিগের মধ্যে যাহারা কেবল গবর্ণমেণ্টের চাকুরী করিবার প্রত্যাশায় কিম্বা অন্য কোন ব্যবসায় অবলম্বন পূর্ব্বক অর্থোপার্জ্জনের আশায় স্কুল কলেজে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছেন; তাঁহাদিগের অপেক্ষা অশিক্ষিত রণজিৎ সিংহ এবং অশিক্ষিতা বউ বেগম শুদ্ধ কেবল আত্মচিন্তা এবং আত্মানুসন্ধান দ্বারা সমধিক জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। যাঁহারা কেবল বি এ, এম এ পাশ করিবার নিমিত্ত ত্রিকোণমিতি (Trigonometry) সূত্র অধ্যয়ন করেন। কিন্তু সংসারে প্রবেশ করিবামাত্রই আবার সেই ত্রিকোণমিতির সাইন কোসাইন (Sine, co-sine) পর্য্যন্ত বিস্মৃত হয়েন, তাঁহাদিগের নিকট বউ বেগমের ঈদৃশ চিন্তা অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতে পারে। কারণ আত্মচিন্তা নামে সংসারে যে কোন বিষয় আছে, তৎপ্রতি কখনও তাহাদের দৃষ্টি পড়ে না। স্কুল কলেজে অধ্যয়ন ভিন্ন শুদ্ধ কেবল আত্মচিন্তা এবং আত্মানুসন্ধান দ্বারা যদি মানুষের জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব হইত, তবে আমরা কখনও গৌতম, পাতঞ্জল, সক্রেটিস প্রভৃতির নাম শুনিতেও পাইতাম না।

কোন কোন পাঠক কিম্বা পাঠিকা হয়ত বলিবেন যে মুসলমানের বেগম যে স্বপ্নে সীতাকে দেখিয়াছিলেন এ বড় অসম্ভব কথা। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, শ্রীরামচন্দ্রের অযোধ্যানগর ফায়েজাবাদের রাজধানী হইতে তিন ক্রোশ মাত্র ব্যবধান। সীতার গল্প অযোধ্যার বেগমেরা অহর্নিশ শ্রবণ করিতেন। সীতার শয়ন মন্দিরের চূড়া ইঁহাদিগের রাজপ্রাসাদ হইতে দেখা যায়। এমত অবস্থায় বেগমের স্বপ্নে সীতাকে দর্শন করা অসম্ভব নহে। তবে যদি পাঠক ও পাঠিকাগণ বলেন যে সীতা হিন্দুর কন্যা ছিলেন। তাঁহার আত্মা যে মুসলমানের অপবিত্র শয়ন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়াছিল, এ কথা কেহই বিশ্বাস করিবে না। ইহার প্রত্যুত্তরে আমরা পাঠকগণকে বলিতেছি যে তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া স্বর্গীয় মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের, (Am I an Inspired Prophet) "আমি কি পয়গাম্বর" এই বক্তৃতাটী পাঠ করুন। এই বক্তৃতায় কেশব বাবু বলিয়াছেন যে, তাঁহার চৌদ্দ বৎসর বয়সের সময়, জনের আত্মা এবং পলের আত্মা তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। সাত সমুদ্র পার হইয়া যদি এই দুইটী বিলাতি আত্মা ভারত-

বর্ষে কেশব বাবুর নিকট আসিতে পারিল? তবে সরযুনদীর অপর পার্শ্ব-স্থিত বটবৃক্ষ হইতে সীতার আত্মা বেগমের নিকট আসিবে এ একটা অসম্ভব কি?

সপ্তত্রিংশত্তম অধ্যায়।

রাজা প্রজাসমষ্টির ভৃত্য।

নিশা অবসান প্রায়। রজনীতে দুশ্চিন্তা, ভীতি, ভাবনা যে সকল শয়ন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে নাই; জঘন্য নৈশিক আমোদ প্রমোদ যে সকল শয়নাগার অপবিত্র করে নাই; সুনির্ম্মল পৌর্ণমাসী চন্দ্রালোকের ন্যায় অনাসক্ত বিশ্বাসীদিগের হৃদয়ালোকে যে শয্যা পরিবেষ্টিত ছিল; সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই সূর্য্যের সূর্য্য সে শয়নাগারে প্রবেশ করিয়া নিদ্রিত নরনারীকে জাগ্রত করিতেছেন।

রাত্রাবসানের এক ঘণ্টা পূর্ব্বেই ফায়েজাবাদের কোন কোন স্থান হইতে কেবল "সীতা রাম" "সীতা রাম" শব্দ শুনা যাইতেছে। কোন কোন স্থান হইতে অত্যুচ্চৈঃস্বরে "আল্লা আক্‌বর" "আল্লা আক্‌বর" শব্দ সমুত্থিত হইয়া গগণ মেদিনী পরিপূর্ণ করিতেছে। ঈদৃশ কলরবে অন্যান্য সমুদায় লোকেরও নিদ্রা ভঙ্গ হইতেছে। বাহিরের এই কোলাহল সকলকেই জাগ্রত করিতেছে।

শ্রীনিবাস এবং বাণেশ্বর নিশাবসানের প্রায় দুই ঘণ্টা পূর্ব্বেই জাগ্রত হইলেন। হরিদ্বারে অবস্থানকালে শ্রীনিবাস সূর্য্যোদয়ের এক ঘণ্টা কি দেড় ঘণ্টা পূর্ব্বে জাগ্রত হইয়া সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত শুদ্ধ কেবল ঈশ্বর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। অনন্ত ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞান এবং অসীম কৌশল চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া পড়িতেন। কিন্তু হরিদ্বার পরিত্যাগ পূর্ব্বক রোহিলখণ্ডে এবং অযোধ্যায় প্রবেশ করিবার পর তাঁহার সেই শান্ত সমাহিত চিত্ত অহর্নিশ উদ্বেলিত হইতেছে। অযোধ্যাবাসী নর নারীর অন্নকষ্ট এবং দারিদ্র্য দর্শনে তাঁহার মন স্থৈর্য্য শূন্য হইয়া পড়িয়াছে। এই স্থিরতা শূন্য চঞ্চল চিত্তকে সমাহিত করিবার নিমিত্ত তিনি প্রত্যহই নিশাবসানের পূর্ব্বে জাগ্রত হইয়াই মনে মনে ঈশ্বরের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করেন।

"হে অনন্ত মহান্ ঈশ্বর, দীন দুঃখীর স্নেহময়ী জননি! দেশব্যাপ্ত এই

বর্ত্তমান, দুরবস্থা, দুঃখ, যন্ত্রণা দূর কর। প্রত্যেক নর নারীকে স্বীয় স্বীয় দুঃখ যন্ত্রণার কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত কর—তোমার মঙ্গলময় পবিত্র স্বর্গ রাজ্য জগতে সমাগত হউক”—

আজ প্রার্থনা সমাপনান্তে পূর্ব্ব দিবসের অঙ্গীকারানুসারে বেগমের সহিত আবার সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

এদিকে বেগম রজনী প্রভাত হইবামাত্রই গাত্রোত্থান করিয়া নেমাজ করিলেন। বেগম অন্যূন এক ঘণ্টা বসিয়া নেমাজ করিতেন। নেমাজের পর তিনি তোষাখানার পশ্চাৎস্থিত প্রকোষ্ঠে পর্দ্দার অন্তরালে বসিয়া আপন জায়গীরের আমিল তহসিলদারদিগের কাগজ পত্র শ্রবণ করিতেন। কিন্তু আজ তোষাখানায় আসিয়াই সমুদায় কর্ম্মচারীদিগকে বিদায় দিলেন, কেবল খোজা বহরালী, জহরালী এবং দারাবালী খাঁ সেখানে রহিল। দারাবালী খাঁ বেগমের আদেশানুসারে শ্রীনিবাস এবং বাগেশ্বরকে আজ আবার বেগমের নিকট আনিয়া উপস্থিত করিল।

নেমাজের পরই বেগমের জগদম্বার কথা স্মরণ হইল। তিনি মনে মনে চিন্তা করিতেছিলেন, “জগদম্বা বেগম বলিতেন হাফেজনন্দিনীর শোনিতানলে সমুদয় অযোধ্যা ভস্মীভূত হইবে, অযোধ্যার সমুদায় প্রজাবর্গ বিনষ্ট হইবে। কিন্তু প্রজাগণ হাফেজনন্দিনীর নিকট কোন অপরাধ করে নাই। তাঁহারা তো হাফেজনন্দিনীর বিষয়ে বিন্দুবিসর্গও জানে না। আমিই বরং হাফেজনন্দিনীর প্রাণ রক্ষা করিবার চেষ্টা না করিয়া ঘোর পাপানুষ্ঠান করিয়াছি। নবাব নিজে হাফেজনন্দিনীর আত্মহত্যার নিমিত্ত অপরাধী হইয়া পড়িয়াছেন। প্রজাগণের তো ইহাতে কোন অপরাধই নাই। প্রজাগণ ইহাতে কেন বিনষ্ট হইবে?

এইরূপ চিন্তা করিয়া বেগম পূর্ব্বেই স্থির করিয়া রাখিয়াছেন যে, আজ শ্রীনিবাসের নিকট প্রজাবর্গের বর্ত্তমান দুরবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিবেন। বেগম প্রজাদিগের কষ্ট দেখিয়া অনেক সময়ে মনে করিতেন যে, হিন্দু প্রজাগণ কাফের। সুতরাং তাহারা ঈশ্বরের কোপানলে পড়িয়া এই কষ্ট ভোগ করিতেছে। কিন্তু আবার যখন ভাবিয়া দেখিতেন যে, হিন্দু মুসলমান সমুদায় প্রজাই সমভাবে কষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, তখনই এই সিদ্ধান্ত অমূলক বলিয়া তাঁহার বোধ হইত। তখন আর প্রজা সাধারণের এই বর্ত্তমান দুরবস্থার কারণ কিছুই নির্ণয় করিতে পারিতেন না।

আজ শ্রীনিবাস বেগমের নিকট আনীত হইলে পর, বেগম আর পর্দ্দার অন্তরালে বসিলেন না। একখানি রৌপ্য বিনির্ম্মিত আসনের উপর শ্রীনিবাসের সম্মুখে বসিয়াই প্রশ্ন করিলেন।—

ঠাকুর তুমি এ রাজ্যের সমুদায় প্রদেশ ভ্রমণ করিয়াছ?"

শ্রীনিবাস। মা, রোহিলখণ্ড এবং অযোধ্যার প্রায় সমুদায় প্রদেশই ভ্রমণ করিয়াছি।

বেগম। আমাদের এ রাজ্যের প্রজাগণ কি সুখে আছে?

শ্রীনিবাস। মা, আপনাদের এ রাজ্যের প্রজাদিগের দুরবস্থা দেখিলে পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হয়। কিন্তু আপনি রাণী হইয়া পরমসুখে দিনাতিপাত করিতেছেন। আর আপনার প্রজাগণ এত কষ্ট পাইতেছে। আপনাকেই বা কেন দোষ দিতেছি। এ সংসারে সকলেই আপন আপন কুকার্য্যের ফল ভোগ করে। যেমন কর্ম্ম তেমন ফল।

বেগম। প্রজাগণ কি কুকার্য্য করিয়াছে?

শ্রীনিবাস। কুকার্য্য ও কর্ত্তব্যলঙ্ঘন ভিন্ন এ সংসারে কাহাকেও কষ্ট ভোগ করিতে হয় না।

বেগম। তুমি বলিতেছ যে দেশশুদ্ধ সমুদায় প্রজাই কষ্ট ভোগ করিতেছে। তবে কি দেশশুদ্ধ সমুদায় প্রজাই চুরী ডাকাইতী ইত্যাদি কুকার্য্য করিয়াছে?

শ্রীনিবাস। মা, এ সংসারে চুরী ডাকাইতী কি কেবল কুকার্য্য? চুরী ডাকাইতী অপেক্ষা কত কত গুরুতর কুকার্য্য রহিয়াছে। জন্মের মধ্যে একদিন কিম্বা একবার যে চুরী ডাকাইতী করে, তাহাকে রাজাজ্ঞানুসারে কারাবদ্ধ হইয়া থাকিতে হয়। কিন্তু চিরকালের নিমিত্ত যাহারা চুরী ডাকাতীর দ্বার খুলিয়া রাখে, ঈশ্বরের ন্যায় বিচারে তাহাদিগকে অবশ্য সমধিক দণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

বেগম। তোমার এ কথার অর্থ কিছু বুঝিতে পারিনা। কে চিরকালের নিমিত্ত চুরী ডাকাইতীর দ্বার খুলিয়া রাখিয়াছে?

শ্রীনিবাস। মা, সে সকল কথা আপনার নিকট বলিলে কি হইবে। আপনি তাহা কিছু বুঝিতে পারিবেন না।

বেগম। তুমি বুঝাইয়া বলিলে, আমি বুঝিতে পারিব। তুমি বল দেখি কি জন্য প্রজাদিগের এত কষ্ট হইতেছে।

বেগমের এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে শ্রীনিবাস বলিতে লাগিলেন—

" মা দেশের রাজার পাপেই প্রজাদিগের এই কষ্ট হইতেছে। রাজার পাপানুষ্ঠান এবং কুকার্য্যের ফল প্রজাকেই সর্ব্বাগ্রে ভোগ করিতে হয়।"

শ্রীনিবাস এই পর্য্যন্ত বলিবামাত্রই বেগম তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন—"রাজার পাপ প্রজাকে কেন ভোগ করিতে হইবে। ঈশ্বর কি এক জনের পাপ ও কুকার্য্যের শাস্তি অন্যকে প্রদান করেন ?"

শ্রীনিবাস বলিলেন—

"মা আপনি ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক আমার সমুদায় কথা শুনুন। রাজার পাপে কিরূপে প্রজাদিগকে নষ্ট হইতে হয়; কেন রাজার পাপের শাস্তি প্রজাকে ভোগ করিতে হয়, তাহা ক্রমেই আপনার নিকট বলিতেছি।

—"এ সংসারে ঈশ্বরই সকলের রাজা। ঈশ্বরই একমাত্র পাপের দণ্ডদাতা এবং পুণ্যের পুরস্কারক। কিন্তু সংসারে পাপ এবং অত্যাচার আছে বলিয়া পার্থিব রাজার প্রয়োজন হয়। সংসারে রোগ না থাকিলে চিকিৎসকের প্রয়োজন হইত না। সেই প্রকার সংসারে পাপ, কুকার্য্য এবং অত্যাচার না থাকিলে, রাজা, কোতয়াল, ফৌজদার, এবং কাজীর কোন আবশ্যক হইত না। রোগী যদ্রূপ আপন চিকিৎসক নির্ব্বাচন করে, প্রজা সমষ্টিকেও সেই প্রকার জ্ঞাতসারেই হউক, কি অজ্ঞাতসারেই হউক, আপন আপন রাজা নির্ব্বাচন করিতে হয়। রোগী অনুপযুক্ত চিকিৎসকের হাতে আত্ম সমর্পণ করিলে নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখে পতিত হয়, প্রজাগণকে সেই প্রকার অর্থ-গৃধ্নু রাজার হাতে পড়িয়া বিবিধ কষ্ট ভোগ করিতে হয়।

"চিকিৎসক রোগীর বেতনভোগী ভৃত্য। রাজা প্রজাসমষ্টির ভৃত্য। প্রত্যেক প্রজাকেই তজ্জন্য আপন ভৃত্যের কার্য্যকলাপের প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতে হয়। প্রজাগণ যখন এই সাধারণ ভৃত্যের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে উদাসীনতা প্রকাশ করে, প্রজাগণ যখন রাজাকে যথেচ্ছাচার করিতে সুযোগ প্রদান করে; তখন তাহাদিগকে ভৃত্যের কুকার্য্যের ফল নিশ্চয়ই ভোগ করিতে হয়।

বেগম। ঠাকুর, তুমি যে আশ্চর্য্য কথা বলিতেছ। তোমার একথা কিছুই বুঝিতে পারি না। রাজা প্রজার ভৃত্য হইবেন কেন? বরং প্রজাগণকেই রাজার হুকুমানুসারে চলিতে হয়। সমুদয় প্রজাই রাজার ভৃত্য।

শ্রীনিবাস। মা, আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আপনি আমার এ সকল কথার অর্থ বুঝিতে পারিবেন না। স্থূল দৃষ্টিতে মানুষ মনে করে যে প্রজাগণ

রাজার ভৃত্য। কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে সহজেই অনুভূত হইবে যে রাজাই প্রজাসমষ্টির ভৃত্য। রাজা আপন ক্ষমতা প্রজা সাধারণ হইতে প্রাপ্ত হয়েন।

বেগম। দিল্লীর বাদসাহ আরঙ্গীবকে কি প্রজাগণ একত্র হইয়া সিংহাসনে বসাইয়াছিল? তিনি প্রধান যোদ্ধা ছিলেন। নিজ বাহুবলে সিংহাসন অধিকার করিলেন। অযোধ্যার বরহান মুল্ককে কি প্রজাগণ সিংহাসন প্রদান করিয়াছিল? তিনি যুদ্ধ করিয়া রাজ্য লাভ করিয়াছেন। পরে তাঁহার পুত্র পৌত্রগণ এখন বাহুবলে সেই রাজ্য রক্ষা করিতেছেন।

শ্রীনিবাস। মা, দিল্লীর বাদসাহ আরঙ্গীব এবং অযোধ্যার নবাব বরহান মুল্ক প্রথমে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়াই রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু এইরূপ দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া চিরকাল কেহ রাজত্ব করিতে পারে না।

বেগম। বাহুবলে যাহারা রাজ্য লাভ করেন, তাহারা যদি দস্যুই হয়েন, তবে প্রজাগণ তাহাদের অধীনতা স্বীকার না করিয়া কি করিবে? প্রজাগণের কি আর কিছু করিবার সাধ্য আছে?

শ্রীনিবাস। সাধ্য আছে বইকি? দেশের সমুদয় প্রজাসমষ্টি যদি আপন আপন হৃদয়স্থিত কাপুরুষতা এবং স্বার্থপরতা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক কটিবদ্ধ হয়; তবে পৃথিবীতে এমন কোন দস্যু নাই যে, তাহাদিগের উপর চিরপ্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারে। চিরকাল যুদ্ধ করিয়া কেহ রাজ্য রক্ষা করিতে পারে না। তখন সে দস্যুকেও আক্‌বরের ন্যায় ন্যায়পরায়ণ হইতে হয়। আপনার কি স্মরণ নাই, যে আপনার স্বামী সিংহাসনারূঢ় হইয়াই একটী ক্ষত্রিয় মহিলাকে অন্দরভুক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া, দেশশুদ্ধ লোক তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিতে উদ্যত হইল। তখন আপনার শাশুড়ী স্বয়ং নবাব মাতা রামনারায়ণের হস্ত ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন।* আপনার স্বামী সেই হইতে আর কোন হিন্দু রমণীকে জাতিভ্রষ্ট করিতে সাহস করেন নাই। তখন যদি দেশীয় সমুদয় হিন্দু প্রজা তদ্রূপ কটিবদ্ধ না হইত, তবে শত শত হিন্দু-রমণীকে নবাব সুজাউদ্দৌলার অন্দরভুক্ত হইতে হইত। প্রজাদিগকে সর্ব্বদাই রাজাকে শাসন করিতে হয়। প্রজাগণকে সর্ব্বদাই রাজাকে কুকার্য্য হইতে বিরত রাখিতে হয়। রাজা ও প্রজার মধ্যে এইরূপ পারস্পারিক সম্বন্ধ না থাকিলে চিরকাল প্রজাদিগকে ঘোর কষ্ট সহ্য করিতে হইবে।

---

* কামাল উদ্দিন হায়দরের ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

বেগম। সমুদয় প্রজা একমত হইয়া কার্য্য না করিলে তো আর রাজাকে কখনও এই রূপ শাসন করিতে পারে না?

শ্রীনিবাস। প্রজাদিগের মধ্যে যে রোগ থাকিলে, তাহারা একমত হইয়া রাজাকে শাসন করিতে পারে না, সেই রোগ, চুরী ডাকাতী প্রভৃতি কুকার্য্যাপেক্ষাও সমধিক ঘৃণিত। আপনার এ রাজ্যের প্রজাগণ তদ্রূপ রোগাক্রান্ত হইয়াই এ অসহনীয় কষ্ট ভোগ করিতেছে।

বেগম। সে কি রোগ?

শ্রীনিবাস। সে রোগের নাম স্বার্থপরতা এবং কাপুরুষতা। চুরী, ডাকাতী, নরহত্যা এ সকল মানব মনের সাময়িক বিকার সম্ভূত পাপ। এ সকল মনের সাময়িক রোগ। কিন্তু স্বার্থপরতা এবং কাপুরুষতা মানব মনের চির রোগ। সুতরাং স্বার্থপরতা এবং কাপুরুষতা যে দেশীয় লোকের মধ্যে রহিয়াছে তাহারা চোর ডাকাত অপেক্ষাও অধিকতর ঘৃণিত। সাময়িক রোগ নিবন্ধন লোক সময়ে সময়ে কষ্ট ভোগ করে। চির রোগীকে চিরকাল কষ্ট ভোগ করিতে হয়। চুরী, ডাকাতী, নরহত্যা এবং ব্যভিচার প্রভৃতি সাময়িক পাপের দণ্ডও সাময়িক, কাপুরুষতা এবং স্বার্থপরতা স্বরূপ চিরপাপের দণ্ডও চিরস্থায়ী।

বেগম। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) ঠাকুর এ রোগ সংসার হইতে কখনও দূর হইবে না।

শ্রীনিবাস। এ রোগ দূর না হইলে সংসারে লোকের দুঃখ যন্ত্রণারও অবসান হইবে না। এই অযোধ্যাবাসী প্রজাগণ ক্ষত্রিয় রমণীকে নবাবের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত যদ্রূপ বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিল; রোহিলাযুদ্ধ হইতে নবাবকে বিরত রাখিবার নিমিত্ত তদ্রূপ বীরত্ব প্রকাশ করিলে, আজ তাহাদিগকে এত কষ্ট ভোগ করিতে হইত না। এই প্রজাদিগের প্রদত্ত আর্থিক এবং শারীরিক সাহায্য প্রাপ্তি নিবন্ধনই নবাব সুজা উদ্দৌলা শত শত রোহিলা সর্দ্দারের প্রাণ বিনাশ করিয়াছেন। সহস্র সহস্র রোহিলা রমণীর উপর ঘোর অত্যাচার করিয়াছেন। নবাবকে ঈদৃশ কুকার্য্যে এই প্রজাগণই অজ্ঞাতসারে সাহায্য করিয়াছে। সুতরাং প্রজাদিগকে এখন সেই পাপানলে জ্বলিয়া মরিতে হইতেছে। প্রজার সাহায্য ভিন্ন নবাব ঈদৃশ কুকার্য্য করিতে সমর্থ হইতেন না।

বেগম। প্রজাগণ তখন স্বপ্নেও মনে করে নাই যে, রোহিলা যুদ্ধের চরমফল এই দুরবস্থায় পরিণত হইবে।

শ্রীনিবাস। অজ্ঞানান্ধকারে পড়িয়া লোক ভবিষ্য দৃষ্টি বিবর্জ্জিত হইতে পারে। কিন্তু রোহিলা যুদ্ধের পর যখন প্রথম অত্যাচার আরম্ভ হইল, তখন যদি সকলে কটিবদ্ধ হইয়া অত্যাচারের অবরোধ করিত, তবে আজ আর ইহাদিগের সন্তান সন্ততি বিক্রয় করিতে হইত না। এখনও যদি ইহারা আপন আপন হৃদয়স্থিত কাপুরুষতা বিসর্জ্জন করে, তবে কে ইহাদিগের প্রতি অত্যাচার করিতে পারে?

বেগম। একদিনে তো সকল প্রজার উপর অত্যাচার আরম্ভ হয় নাই। আজ একজনের উপর, কাল আর একজনের উপর, তৎপর দিবস তৃতীয় ব্যক্তির উপর অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইতেছিল। সুতরাং অত্যাচারের প্রারম্ভে কেহ মনে করে নাই যে, এ অত্যাচার ক্রমে সকলের উপরই অনুষ্ঠিত হইবে।

শ্রীনিবাস। নিজের উপর অত্যাচার হইতেছে, কি অপর কাহারও প্রতি অত্যাচার হইতেছে, সে বিষয় প্রজাকে কিছু দেখিতে হইবে না। রাজা তাহাদের প্রত্যেকের সাধারণ ভৃত্য। এই ভৃত্যটী বিশ্বাসঘাতক না হয়, অর্থ গৃধ্নু না হয়, তৎপ্রতি প্রজাসাধারণের বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বিশ্বাসঘাতক ভৃত্যকে শাসন না করিলে এক দিন না একদিন সে নিশ্চয়ই বুকে ছুরী দিবে। যে রাজা প্রজাসাধারণকে নিরস্ত্র করিয়া, প্রজাদিগকে নিস্তেজ করিয়া, প্রজাদিগকে আত্মরক্ষার অনুপযুক্ত করিয়া রাজ্যশাসন করিতে চেষ্টা করেন, তিনি বিশ্বাসঘাতক রাজা।

বেগম শ্রীনিবাসের সমুদয় কথা শ্রবণ করিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন।

"এ পণ্ডিত যথার্থ কথাই বলিয়াছে। শুদ্ধ কেবল কাপুরুষতা এবং স্বার্থপরতা নিবন্ধনই প্রজাগণ এত কষ্ট পাইতেছে। বেরুচ এবং গোরক-পুরের লোকে অনেক অত্যাচারের পর অস্ত্রধারণ করিবামাত্রই অত্যাচার নিবারিত হইল। রাজা যে প্রজার ভৃত্য ইহার কোন সন্দেহ নাই। প্রজা প্রতিপালন, প্রজার সেবা, প্রজা রক্ষা না করিলে কখন রাজ্য রক্ষা হয় না। আমার হতভাগ্য আসফ উদ্দৌলাকে নিশ্চয়ই রাজ্যচ্যুত হইতে হইবে। সে [illegible] হইয়া একবারও প্রজার এই দুঃখ যন্ত্রণার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না। নবাব বরহান মুলক বাহুবলে রাজ্যলাভ করিয়া পরে প্রজাদিগকে সস্নেহে পালন করিয়াছেন, নবাব মন্সুর আলিখাঁ সফদর জঙ্গ অত্যন্ত ধার্ম্মিক ছিলেন।

তাঁহার প্রজাদিগের উপর অন্য কেহ কখনও অত্যাচার করিতে পারিত না। স্বয়ং জাঁহাপনার আমলে একটা ফিরিঙ্গী এই সুবায় বাণিজ্য করিতে আসিবামাত্র, তিনি তাহাদিগের দোকান সরযু নদীতে ডুবাইয়া দিবেন বলিয়া আমার নিকট বলিয়াছিলেন। ইহাদিগের তিন জনেরই প্রজার মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি ছিল। হা পরমেশ্বর! এ রাজ্য রক্ষার আর উপায় নাই। বিশ্বাসঘাতক ভৃত্য কখনও দীর্ঘকাল আপন পদ রক্ষা করিতে পারে না।

বেগম কিছুকাল নির্ব্বাক থাকিয়া এই প্রকার চিন্তা করিতেছিলেন। এই সময় বেলা প্রায় এক প্রহর হইয়াছে। বেগম শ্রীনিবাসকে তখন বিদায় দিবার সময়ে দারাবালীকে বলিলেন " এই পণ্ডিতকে এক শত স্বর্ণমুদ্রা আনিয়া দাও। ইনি সত্য সত্যই একজন ধার্ম্মিক লোক।

শ্রীনিবাস বলিলেন "মা, আমি অর্থাকাঙ্ক্ষী ব্রাহ্মণ নহি। আমি কাহারও দান গ্রহণ করিব না।

বাণেশ্বর শ্রীনিবাসের কাণে কাণে বলিলেন "টাকা কয়েকটা লইতে ক্ষতি কি ?"

শ্রীনিবাস বাণেশ্বরের প্রতি কোপাবিষ্ট হইয়া বলিলেন "এখনও তোমার অর্থাকাঙ্ক্ষা দূর হয় নাই। আর মুখে তুমি "অসার সংসার প্রভুর চরণ সার" কেবল এই ধ্বনি করিতেছিলে।"

বাণেশ্বর শ্রীনিবাস কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া নির্ব্বাক রহিলেন। পরে উভয়েই বেগমের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক চক্ বাজারে আসিয়া আহারাদির আয়োজন করিতে লাগিলেন। চক্ বাজারে পৌঁছিয়া বাণেশ্বর শ্রীনিবাসকে আবার বলিলেন।

"ঠাকুর এ বেগমটাকে আমার বড় ভাল স্ত্রীলোক বলিয়া বোধ হয় না। পর্দ্দার বাহিরে আসিয়া আমাদের সঙ্গে কথা বলিল। এই রূপ স্ত্রীলোক ভদ্র লোকের ঘরে আমি কোথাও দেখি নাই।"

শ্রীনিবাস পণ্ডিত মহারাষ্ট্রীয় লোক। ইহাদের দেশে স্ত্রী স্বাধীনতা রহিয়াছে। সুতরাং বাণেশ্বরের কথা শুনিয়া তিনি একটু কোপাবিষ্ট হইলেন। আজ দশ বৎসরের মধ্যে শ্রীনিবাস কাহাকেও একটী কর্কশ কথা বলেন নাই; কাহারও প্রতি কখনও কোপাবিষ্ট হয়েন নাই। তিনি জিতেন্দ্রিয়। কাম ক্রোধাদি সমুদয় রিপুকে তিনি বশীভূত করিয়া। কিন্তু

বাণেশ্বরের এই কথা শুনিয়া তিনি আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে সমর্থ হইলেন না। অত্যন্ত কোপাবিষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন।

"বাণেশ্বর তোমার দুরবস্থার কথা শুনিয়াই তোমার প্রতি আমার অত্যন্ত দয়া হইয়াছে। সেই জন্যই তোমাকে অত্যন্ত ভালবাসি। তোমাদের বঙ্গদেশের লোকের প্রতি পূর্ব্ব হইতেই আমার একটা ঘৃণার ভাব ছিল। কিন্তু সে ভাব আমার অন্তরে এখন আর নাই। তোমাদের দেশের দুরবস্থা দর্শনে, তোমাদের দেশীয় লোকের প্রতি সকলেরই দয়া হয়। কিন্তু আজ তোমার কথা শুনিয়া আমার মনে বাঙ্গালীদিগের প্রতি ঘৃণার ভাব শতগুণে বৃদ্ধি হইল। তোমাদের বাঙ্গালীর মন যে নরক সদৃশ তাহার কোন সন্দেহ নাই। তোমরা পবিত্র চক্ষে রমণীদিগের প্রতি দৃষ্টি করিতে পার না। কেমনেই বা পারিবে। নারীজাতি সম্বন্ধে তোমরা যাবনিক আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়াছ। তোমরা এই বিষয়ে মুসলমানদিগকে সর্ব্বাংশে অনুকরণ করিয়াছ। এই বেগমটী সীতা সদৃশী। সকলেই জানে যে ইনি স্বামীর বিপদের কথা শুনিয়া, স্বামীর উদ্ধারার্থ বক্সারের যুদ্ধ ক্ষেত্রে গিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে তোমরা স্ত্রীলোকদিগকে সর্ব্বদা অবরুদ্ধাবস্থায় রাখ। সেই জন্যই তোমাদের চক্ষু কর্ণ চিরকাল অপবিত্র হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু নিশ্চয় জানিবে স্ত্রীলোকদিগের সেই অস্বাভাবিক অবরুদ্ধাবস্থা সততই তাহাদিগকে কুচিন্তা এবং কুপথে পরিচালন করে। কুকার্য্য কখনও পর্দ্দার বাহিরে হয় না। সর্ব্বপ্রকার কুকার্য্যই পর্দ্দার অন্তরালে হয়। নারী জাতীর পক্ষে পর্দ্দার অন্তরালই একমাত্র কুচিন্তার আলয়। পর্দ্দা অন্যান্য লোকের প্রবেশ পথ অবরোধ করে। কিন্তু পর্দ্দা কুচিন্তার প্রবেশ পথ অবরোধ করিতে পারে না। কুচিন্তা হইতে কুকার্য্য সমুৎপন্ন হয়। সুতরাং পর্দ্দার দ্বারায় কুকার্য্যের সাহায্য ভিন্ন নিবারণ হয় না। এই অনাবৃত বিশাল বিশ্বমণ্ডল নর নারী সকলেরই একমাত্র সংশিক্ষার বিদ্যালয়, সুপবিত্র ধর্ম্ম মন্দির; এবং মহান্ স্বর্গ রাজ্য।

অষ্টত্রিংশত্তম অধ্যায়।

পিতৃচরণ দর্শন।

আহারান্তে শ্রীনিবাস এবং বাণেশ্বর ফায়েজাবাদের সেই ভগ্ন গৃহাভিমুখে চলিলেন। ভগ্ন গৃহের পশ্চিম বারান্দার প্রাচীরে বাণেশ্বর স্বীয় পুত্রের হস্তলিপি দেখিয়া গিয়াছেন। গৃহের নিকটে পৌঁছিয়া তিনি গৃহের পশ্চাৎদিক দিয়া শ্রীনিবাসকে সেই গৃহের পশ্চিম বারান্দায় লইয়া গেলেন। ইহারা উভয়েই বারান্দায় দাঁড়াইয়া হস্তলিপি দেখিতে লাগিলেন। গৃহে প্রবেশকালে ইহারা মনে করিয়াছিলেন যে, গৃহে অন্য কোন লোক নাই। কিন্তু বারান্দায় দাঁড়াইয়া হস্তলিপি দর্শন করিবার সময় ইহাঁদের বোধ হইল যেন অপর দুইজন লোক গৃহের প্রকোষ্ঠান্তরে বসিয়া পরস্পরের নিকট পরস্পর কথা বলিতেছে। তাহাদিগের পরস্পরের কথাবার্ত্তা ইহাঁরা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন না। কিছুকালপরে তাহাদিগের মধ্যের একজন বিশেষ উত্তেজিত হইয়া বলিল—

"দাদা, কি কলঙ্কের কথা! কাশীর রাণী চেৎসিংহের মা এবং স্ত্রীর উপর এইরূপ অত্যাচার করিয়াছে। আমি নিশ্চয়ই তোমাকে বলিতেছি এই সময় কাশীতে থাকিলে নরপিশাচ হেষ্টিংসের মাথা কাটিয়া ফেলিতাম।"

"চেৎসিংহের মা এবং স্ত্রীর উপর এইরূপ অত্যাচার করিয়াছে" এই কথা শ্রীনিবাসের কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্রই তিনি চমকিয়া উঠিলেন। বক্তা যে প্রকোষ্ঠে বসিয়া কথা বলিতেছিলেন, তিনি সেই প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু সেখানে প্রবেশ করিয়াই দেখেন যে তাঁহার পূর্ব্ব পরিচিত নেহাল সিংহের পুত্র অমর সিংহ অপর একটী বৃদ্ধ লোককে সম্বোধন করিয়া কথা বলিতেছেন। শ্রীনিবাস কলিকাতায় কয়েক দিন নেহাল সিংহের ভবনে অবস্থান করিয়াছিলেন। ইহাতেই প্রথম অমর সিংহের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয়। শ্রীনিবাস জানিতেন অমর সিংহ নেহাল সিংহের পুত্র। বক্সারের যুদ্ধের সময়েও ইহাদিগের পরস্পরের মধ্যে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। বক্সারের যুদ্ধের পর ষোল বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে। ষোল বৎসর পরে অমর সিংহ এবং শ্রীনিবাস ইহাদিগের

পরস্পরের মধ্যে সাক্ষাৎ হইল। কিন্তু পরস্পর পরস্পরের মুখাকৃতি বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। ভক্তি ও স্নেহের চমৎকার শক্তি। শ্রীনিবাসের প্রতি অমর সিংহের অত্যন্ত ভক্তি। সুতরাং শ্রীনিবাসের মুখাকৃতি তাহার হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। আবার শ্রীনিবাসও নেহাল সিংহের ভবনে অবস্থানকালে অমর সিংহের সৌজন্য এবং শাস্ত্রানুশীলন দর্শনে তাহাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। অমর সিংহ অকস্মাৎ শ্রীনিবাসকে দেখিয়াই আশ্চর্য্য হইলেন। বাণেশ্বর শ্রীনিবাসের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। অমর সিংহ এখনও তাঁহাকে দেখিতে পান নাই। তিনিও অমর সিংহের মুখাকৃতি সম্পূর্ণরূপে দেখিতে পাইলেন না।

অমর সিংহ শ্রীনিবাসকে দেখিবামাত্রই তাহার পদতলে পড়িয়া প্রণাম করিলেন। শ্রীনিবাস সস্নেহে তাহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন —"বাছা তুমি কোথা হইতে এখানে আসিলে ?"

অমর সিংহ বলিলেন—"গুরুদেব, আপনি আমার সমুদয় দুরবস্থার কথা জানেন না। কলিকাতায় অবস্থানকালে আপনি আমাকে ৺ নেহাল সিংহের পুত্র বলিয়াই জানিতেন। কিন্তু নেহালসিংহ আমার পিতা ছিলেন না। তিনি আমার জীবনদাতা এবং অস্ত্রগুরু ছিলেন। আমার পিতার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া পূর্ব্বে আমার বিশ্বাস ছিল। কিন্তু এখন জানিতে পারিয়াছি, তিনি জীবিত আছেন। ঘটনাক্রমে তিনি এই গৃহে আসিয়া আমার হস্তলিপি দেখিতে পাইলেন। হস্তলিপি দর্শন করিয়াই তিনি স্থানে স্থানে আমার অনুসন্ধানে ভ্রমণ করিতেছেন।"

অমর সিংহ এই পর্য্যন্ত বলিবামাত্রই শ্রীনিবাসের পশ্চাৎ হইতে বাণেশ্বর অগ্রসর হইয়া অমর সিংহের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন "এই যে আমার বাছা—এই যে আমার ভুবন—আমি আমার বাছাকে এতক্ষণ চিনিতেও পারি নাই"—

অমর সিংহ আশ্চর্য্য হইয়া বাণেশ্বরের মুখের দিকে চাহিবামাত্র আপন পিতাকে চিনিতে পারিলেন। তখন পিতার পদতলে পড়িয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

কিছুকাল পরে উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ সম্বরণ পূর্ব্বক, অমর সিংহ পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"আমি মুসলমান কন্যা বিবাহ করিয়াছি বলিয়া অনর্থক আপনার মনে

সন্দেহ হইয়াছে। পিতৃ মাতৃ শোকানলে যাহার হৃদয় সর্ব্বদা দগ্ধ হইতেছিল, তাহার কি আর বিবাহ করিতে ইচ্ছা হয়? ফরকাবাদের নবাবের কন্যাকে আমি হাফেজ নন্দিনী বলিতাম। তাহার কি নাম ছিল, তাহা কখনও আমি জানিতে পারি নাই। সেই পিতৃমাতৃহীন নবাবকন্যাকে কামাসক্ত লম্পট অযোধ্যার পূর্ব্ব নবাব সুজাউদ্দৌলার অত্যাচার হইতে রক্ষা করিব বলিয়া, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। তাহাকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত আমি এবং আমার সঙ্গী এই বৃদ্ধ সিপাহী, এই গৃহে আসিয়া গোপনে অবস্থান করিতে লাগিলাম। ইনি তখন গাঁজা খাইতেন। এখন সে অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহাঁর গাঁজার কল্কী হইতে সময়ে সময়ে এক একটী অঙ্গার হাতে লইয়া আমি এই প্রাচীরে শ্লোক লিখিতাম। যখনই হাফেজ নন্দিনীর বিষয় ভাবিতে ভাবিতে মন অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া পড়িত। তখনই এই প্রকার শ্লোক লিখিয়া হৃদয়কে আশ্বস্ত করিতাম।

"ইহার পর অমরসিংহ, হাফেজ নন্দিনীর সঙ্গে তাহার প্রথম সাক্ষাতের দিবস হইতে তাহার মৃত্যুর দিবস পর্য্যন্ত যে সকল ঘটনা হইয়াছিল, তৎ-সমুদয় শ্রীনিবাস পণ্ডিত এবং তাঁহার পিতার নিকট বিবৃত করিলেন। চিন্তাশীল শ্রীনিবাস পণ্ডিত অমর সিংহের সমুদয় কথা শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিলেন।

"এ সংসারে কার্য্যকলাপের মধ্যেও ঈশ্বরের অখণ্ডনীয় নিয়ম এবং অনন্ত কৌশল পরিলক্ষিত হয়। অন্তরস্থিত সদিচ্ছা এবং হৃদয়ের সদ্ভাব, ফানস্-বাজীর মধ্যস্থিত দীপের ন্যায় কার্য্য করিয়া, মানুষকে উর্দ্ধে এবং স্বর্গের দিকে সমুত্থিত করে। আর সেই দীপটী নির্ব্বাণ হইলে ফানস্টী যদ্রূপ ভূমিতলে পড়িয়া যায়, মানুষের হৃদয়ও সেই প্রকার সদিচ্ছা এবং সদ্ভাব পরিশূন্য হইলে, ক্রমেই তাহার অধঃপতন হয়, ক্রমেই সে বিপদ হইতে বিপদান্তরে নিমগ্ন হইতে থাকে।

"বাছা, এই অনাথা নবাব কন্যাকে উদ্ধার করিবার সদিচ্ছাই তোমাকে পিতা, মাতা, স্ত্রী এবং ভগ্নীর সহ পুনর্মিলনের সুযোগ প্রদান করিয়াছে। মনে কর এই সদিচ্ছা এই সদ্ভাব যদি তোমার হৃদয়ে সমুদিত না হইত, তবে এ জন্মে তুমি কখনও পিতৃ মাতৃ চরণ দর্শনে সমর্থ হইতে না।

"পরমেশ্বর এ সংসারের প্রত্যেক মনুষ্যকেই তাহার ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু সমগ্র মানব মণ্ডলীর কার্য্য

সমষ্টির মধ্যে তাঁহার এক অপূর্ব্ব কৌশল রহিয়াছে। সেই অপূর্ব্ব কৌশলই একটী অখণ্ডনীয় নিয়ম। সে নিয়ম দ্বারা আমরা সকলেই আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছি। সেই অখণ্ডনীয় নিয়মই আমাদিগের জীবনের সমুদয় কার্য্যকলাপ পরিশাসন করিতেছে। এই অখণ্ডনীয় নিয়ম সম্বন্ধীয় জ্ঞানই প্রকৃত শাস্ত্র-জ্ঞান। এই জ্ঞানের অভাবে শাস্ত্র-অধ্যয়ন কেবল অভিমান উৎপাদন করে, এই জ্ঞানের অভাবে সংসারের ধন, রত্ন,পদ, প্রভুত্ব বিষের ন্যায় কার্য্য করিয়া, তদধিকারীর হৃদয় পাষাণবৎ করে। এই শ্রেষ্ঠজ্ঞান লাভ হইলেই মানুষ আপনা আপনি ঈশ্বরের নিকট বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বলিয়া উঠে—

"কি হবে সে জ্ঞানে, যা'তে তোমাকে না পাই।
কি হবে সে ধনে, যা'তে তোমাকে হারাই।"

শ্রীনিবাস পণ্ডিতের বাক্যাবসানে অমরসিংহ বলিলেন, "গুরুদেব, আমাদের এখন আর এখানে বিলম্ব করা শ্রেয়ঃ বোধ হইতেছে না। লোক-পরম্পরায় শুনিতে পাইলাম, কাশীতে মহারাজ চেৎসিংহের সঙ্গে ইংরাজ-দিগের যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ইংরাজ সৈন্যগণ অত্যন্ত জঘন্য চরিত্রের লোক; তাহারা নাকি চেৎসিংহের জননী এবং স্ত্রীর উপর পর্য্যন্ত অত্যাচার করিয়াছে! রোহিলখণ্ডের স্ত্রীলোকদিগের উপর ইংরাজ সৈন্য যেরূপ অত্যাচার করিয়াছিল, কাশীতে তদ্রূপ নিষ্ঠুরাচরণ করিয়া থাকিলে, আমাদের পরিবারদিগের যে কি অবস্থা হইয়াছে, তাহা ভাবিলেও হৃদয় কাঁপিয়া উঠে! অতএব আপনার নিকট হইতে এখন বিদায় গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি।"

শ্রীনিবাস পণ্ডিত এখন সর্ব্বদাই অন্যের সুখ দুঃখের কথা শুনিতে আরম্ভ করিলে নিজের সুখ দুঃখের বিষয় বিস্মৃত হইয়া পড়েন। চেৎসিংহের জননীর উপর ইংরাজেরা অত্যাচার করিয়াছে, শুনিয়াই তিনি গৃহের এই প্রকোষ্ঠের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু অমর সিংহের কথা শুনিতে আরম্ভ করিলে পর তিনি সে কথা বিস্মৃত হইয়া পড়িলেন। চেৎসিংহের জননী পূর্ণিমা শ্রীনিবাসের কন্যা। আপন কন্যার প্রতি অত্যাচার হইয়াছে, শুনিয়া তিনি প্রথমতঃ চমকিয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু অন্যান্য কথায় তাহা বিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এখন অমর সিংহ সেই কথা আবার বলিবামাত্র তিনি বলিয়া উঠিলেন,—

"বাছা, আমি তোমাদিগের সঙ্গে কাশীতে যাইব। চেৎসিংহের জননী আমারই কন্যা। এ সংসারে মানুষ সর্ব্বত্যাগী হইলেও বোধ হয় সন্তান-স্নেহ বিবর্জ্জিত হইতে পারে না। আমার পূর্ণিমার বিপদ সংবাদ তাঁহার দিকেই আমার চিত্তাকর্ষণ করিতেছে।"

ইঁহারা চারিজন তখন তৎক্ষণাৎ জোন্‌পুরের রাস্তা দিয়া কাশীতে রওয়ানা হইলেন। কিন্তু বাণেশ্বরের সঙ্গে ছত্রসিংহ রাস্তায় কি তৎপূর্ব্বে একবারও বাক্যালাপ করেন নাই। বাণেশ্বরের সংসর্গ ছত্রসিংহের নিকট অত্যন্ত ত্যক্তজনক বোধ হইতে লাগিল।

ছত্রসিংহ ইতিপূর্ব্বে প্রায় দুই বৎসর কাল অমরসিংহের সঙ্গে একত্র হইয়া বাণেশ্বরের অনুসন্ধান করিতেছিলেন। অনুসন্ধানের সময় তিনি কতবার অমর সিংহকে বলিয়াছেন—"তোমার পিতাকে দেখিতে পাইলে আমার চক্ষু সফল হইবে।" কিন্তু এখন বাণেশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবার পর তিনি একবারও তাঁহার সঙ্গে বাক্যালাপ করেন নাই।

অমর সিংহ ছত্রসিংহের বর্ত্তমান আচরণের কিছুই মর্ম্মভেদ করিতে সমর্থ হইলেন না। রাস্তায় একদিন গোপনে অমর সিংহ ছত্র সিংহকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"দাদা, তুমি আমার পিতার সঙ্গে ত একবারও কথা বলিলে না। তোমার যে এই কয়েকদিন হইতে কি হইয়াছে, কিছুই আমি বুঝিতে পারি না।"

ছত্র সিংহ অমর সিংহের প্রশ্নোত্তরে প্রথমতঃ কিছুই বলিলেন না। কিন্তু অমর সিংহ বারম্বার অনুরোধ করিলে পর, তিনি বলিতে লাগিলেন—

"তোমার পিতাকে দেখিবামাত্রই ইঁহার প্রতি আমার বড় ঘৃণার ভাব উপস্থিত হইল। আমার মনে হইতে লাগিল যে ইঁহাকে আর কোথাও দেখিয়া থাকিব। অনেক চিন্তা করিতে করিতে আমার স্মরণ হইয়াছে। বক্সারের যুদ্ধক্ষেত্রে ইঁহাকে দেখিয়াছিলাম। ইঁহার মুখাকৃতি আমার বিলক্ষণ স্মরণ আছে। ইঁহার ন্যায় নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক বোধ হয় এ সংসারে আর কোথায় দেখি নাই। আমি আর সে সকল কথা তোমার নিকট বলিতে চাহি না।"

অমর সিংহ বলিলেন, "আমার পিতার হৃদয় অত্যন্ত কোমল। আমার পিতার মুখাকৃতি সম্বন্ধে নিশ্চয়ই তোমার ভ্রম হইয়াছে।"

ছত্র সিংহ বলিলেন, "আমার কখন ভুল হয় নাই। তোমার পিতাকে জিজ্ঞাসা কর, বক্সারের যুদ্ধের পর কোন মৃতপ্রায় লোক সংগ্রামক্ষেত্রে পড়িয়া ইহাঁর নিকট একটু জল চাহিয়াছিল কি না? বক্সারের যুদ্ধে যখন আমি আহত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে পড়িয়াছিলাম, তখন ইহাকে দেখিতে পাইয়া ইহার নিকট একটু জল চাহিয়াছিলাম। এ ব্রাহ্মণ এত নিষ্ঠুর যে, আমাকে একটা দুর্ব্বাক্য বলিয়া চলিয়া গেল। ইহার চলিয়া যাইবার পাঁচ মিনিট পরে তুমি সংগ্রাম ক্ষেত্রে আসিয়া আমাকে ক্রোড়ে করিয়া তাঁবুতে লইয়া গেলে।"

অমর সিংহ এই কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন; সত্য সত্যই তাঁহার পিতা এইরূপ নিষ্ঠুরাচরণ করিয়াছিলেন কি না, তাহা জানিবার নিমিত্ত তাঁহার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"বাবা, আপনি বক্সারের যুদ্ধের সময় কি বক্সারে ছিলেন?"

"বাণেশ্বর বলিলেন, "হাঁ—আমি তখন বক্সারে ছিলাম।"

অমর সিংহ। "কোন মৃতপ্রায় ধরাশায়ী সিপাহী আপনার নিকট বক্সারে কখন একটু জল চাহিয়াছিল?

বাণেশ্বর। "হাঁ চাহিয়াছিল বটে। কিন্তু তখন এই পৃথিবী যাহাতে লোকশূন্য হয়, তাহাই আমার একমাত্র কামনা ছিল। আমি তাহাকে বলিয়াছিলাম,—"তোর মৃত্যু হইলে ভাল—আমি তোকে জল দিব না।"

অমরসিংহ। "মৃতপ্রায় লোককে আপনি এইরূপ দুর্ব্বাক্য বলিয়াছিলেন? তাঁহার দুরবস্থা দেখিয়া আপনার হৃদয়ে একটু দয়ার সঞ্চার হইল না?"

শ্রীনিবাস ইহাদিগের পরস্পরের কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন "বাণেশ্বর তখন প্রকৃতিভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। এ সংসারের অত্যাচারই মানুষকে সময় সময় এই প্রকার নিষ্ঠুর করে। এ বাণেশ্বরের দোষ নহে, দেশপ্রচলিত অত্যাচারের অবশ্যম্ভাবী ফল।"

ছত্রসিংহ বাণেশ্বরকে আপন দোষ স্বীকার করিতে দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। ছত্রসিংহের হৃদয় সাংগ্রামিক ভাবে পরিপূর্ণ। বীরোচিত হৃদয়ে হিংসা এবং বিদ্বেষের ভাব অধিক কাল স্থায়ী হয় না। তিনি তখন বাণেশ্বরের চরণে প্রণাম করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ঠাকুর! তুমি তখন পাগল হইয়াছিলে, তাহা আমি জানিতাম না।"

শ্রীনিবাস এই ঘটনা শ্রবণ করিয়া আবার বাণেশ্বরকে বলিলেন, "আমি কতবার তোমাকে বলিয়াছি, কর্ত্তব্যের পথই একমাত্র সুখ শান্তির দিকে পরিচালন করে। মৃতপ্রায় ছত্রসিংহকে বারি-দান করিবার নিমিত্ত যদি তখন কেবল পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করিতে, তবে সেই দিনই তোমার পুত্রের সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হইত। ষোল বৎসর হইল, বক্সারের যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এই ষোল বৎসর আর তোমাকে পথভ্রান্ত পথিকের ন্যায় এই সংসারারণ্যে ভ্রমণ করিতে হইত না।"

বাণেশ্বরের প্রতি যে ছত্রসিংহের ঘৃণার ভাব ছিল, তাহা দূর হইল। ইঁহারা চারিজনে পরমানন্দে একত্র হইয়া চারি পাঁচদিনের মধ্যে কাশীতে আসিয়া পৌছিলেন।

ঊনচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

ডাকাইতী।

বউ বেগম এবং মতী বেগমের ধনাগার লুণ্ঠন করিবার নিমিত্ত ওয়ারেণ হেষ্টিংস, যে সকল ষড়যন্ত্র করিয়াছেন, তাহা এতদ্পূর্ব্ব অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে। ১৭৮১ সনের সেপ্টেম্বর মাসে চুনারে অবস্থান কালেই তিনি এই সকল ষড়যন্ত্র করিলেন। কাপুরুষ আসফ উদ্দৌলাও তখন হেষ্টিংসের ভয়ে ভয়ে স্বীয় জননী এবং পিতামহীর ধনাগার লুণ্ঠন করিবার প্রস্তাবে এক প্রকার মৌন সম্মতি প্রদান করিলেন। কিন্তু লক্ষ্ণৌ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই তিনি এই ঘোর নিষ্ঠুরাচরণে আবার অসম্মত হইলেন। ইংরাজ রেসিডেণ্ট মিড্‌ল্টনসাহেব দিন দিন তাঁহাকে এই কুকার্য্যানুষ্ঠানে পরামর্শ প্রদান করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না। সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নবেম্বর তিন মাস গত হইল। ইংরাজ রেসিডেণ্ট শত চেষ্টা করিয়াও আসফউদ্দৌলাকে এই তিন মাসের মধ্যে এ কুকার্য্যানুষ্ঠানে পরিচালন করিতে সমর্থ হইলেন না।

এদিকে ওয়ারেণ হেষ্টিংস দিন দিন বেনারস হইতে রেসিডেণ্ট মিড্‌ল্টন্ সাহেবের নিকট পত্র লিখিতে লাগিলেন, "তুমি অবিলম্বে নবাবের দ্বারা বেগমদিগের জায়গীর বাজে আপ্ত এবং ধনাগার লুণ্ঠন করাইবে।

১৭৮১ সনের ৬ই ডিসেম্বর তারিখে মিড্‌ল্টন সাহেব হেষ্টিংসকে লিখিলেন, "নবাব এখন পর্য্যন্ত জায়গীর বাজেআপ্ত এবং ধনাগার লুণ্ঠন সম্বন্ধে স্পষ্টরূপে কোন মতামত প্রকাশ করিতেছেন না। আপনার আদেশ অনুসরে অগত্যা অদ্য আমি নিজেই জায়গীর খাষ করিবার পরওয়ানা বাহির করিতেছিলাম। কিন্তু আমি পরওয়ানা বাহির করিতেছি, এই কথা নবাব তাঁহার মন্ত্রীর প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়া, একদিনের নিমিত্ত পরওয়ানা জারি স্থগিত রাখিতে বলিয়াছেন। কল্য প্রাতে তিনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। অন্ততঃ একদিনের নিমিত্ত আমি পরওয়ানা স্থগিত রাখিলাম। যদি নবাব সম্মতি প্রদান করেন, তাহা হইলে সকল কার্য্যই সুশৃঙ্খলরূপে নির্ব্বাহ হইবে। কিন্তু কল্য তিনি সম্মতি প্রদান না করিলেও আমি নিজেই বেগমদিগের জায়গীর বাজেআপ্ত করিবার পরওয়ানা জারী করিব। বেগমদ্বয়ের সম্বন্ধে অন্যান্য যে সকল সৎপরামর্শ করিয়াছেন, তৎসমুদয় আমি সার্ ইলাইজা ইম্‌পির প্রমুখাৎ বিস্তারিতরূপে শুনিয়াছি। জায়গীর বাজেআপ্তের অব্যবহিত পরে সে সকল সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইব।*

* Finding the Nabab wavering in his determination about the resumption of the Jagheers, I this day, in the presence of, and with the minister's concurrence, ordered the necessary Purwannahs to be written to the several Aumils for that purpose, and it was my firm resolution to have despatched them this evening, with proper people to see them punctually and implicitly carried into execution ; but before they were all transcribed, I received a message from the Nabab, who had been informed by the minister of the resolution I had taken, intreating that I would withhold the Purwannahs until to-morrow morning when he would attend me. As the loss of a few hours in the despatch of the Purwannahs appeared of little moment, and as it is possible the Nabab, seeing that the business will at all events be done, may make it an act of his own, I have consented to indulge him in this request ; but be the result of our interview whatever it may, nothing shall prevent the orders being issued to-morrow, either by him or myself, with the concurrence of the minister. Your pleasure respecting the Begums I have learnt from Sir Elijah, and the measure heretofore proposed will soon follow the resumption of the Jagheers. From both, or indeed from the former alone, I have no doubt of the complete liquidation of the Company's balance.—*Letter from Mr. N. Middleton to Warren Hastings Esq. Dated 6th December, 1781.*

ইহার পর ৭ই ডিসেম্বর মিড্‌ল্‌টন সাহেব আবার হেষ্টিংসের নিকট এই মর্ম্মে পত্র লিখিলেন,—

অদ্য প্রাতে নবাব আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি বৃথা কথায় কাল হরণ করেন। প্রস্তাবিত বিষয়ে কোন মতামত প্রদান করেন না। আমি অগত্যা নিজে জায়গীর খাযের পরওয়ানা জারী করিব বলিয়া মনে মনে স্থির করিয়াছি। *

৯ই ডিসেম্বর তারিখে মিড্‌ল্‌টন সাহেব আবার হেষ্টিংসের নিকট লিখিলেন, "আমি পরওয়ানা জারী করিয়াছি, এই কথা শুনিয়া নবাব অত্যন্ত কোপাবিষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার মন্ত্রী আমার এই কার্য্যে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন বলিয়া, মন্ত্রীকে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া ভৎর্সনা করিয়াছেন। কিন্তু এখন বুঝিতে পারিয়াছেন, যে আমাদের এ সকল কার্য্য তিনি নিবারণ করিতে পারিবেন না। অগত্যা বাধ্য হইয়া অবশেষে নিজের প্রভুত্ব সংরক্ষণার্থই নিজেই জায়গীর খাযের পরওয়ানা জারী করিতেছেন। আমি যার পর নাই আনন্দের সহিত আপনাকে আরও জানাইতেছি যে, নবাব এখন বেগমদিগের ধনাগার লুণ্ঠনার্থ আমার সঙ্গে ফায়েজাবাদ যাইতেও অগত্যা সম্মত হইয়াছেন।" †

* This morning the Vizier came to me according to his agreement, but seemingly without any intention or desire to yield me satisfaction on the subject under discussion; for, after a great deal of conversation, consisting on his part of trifling evasion and puerile excuses for withholding his assent to the measure, though at the same time professing the most implicit submission to your wishes, I found myself without any other resource than one of employing that exclusive authority with which I consider your instruction to vest me.—*Letter from Mr. N. Middleton to W. Hastings, 7th Dec.* 1781.

† His Excellency appeared to be very much hurt and incensed at the measure, and loudly complains of the treachery of the minister. He at length yielded a nominal acquiescence and has this day issued his own Purwannah; declaring at the same time both to me and his minister, that *it is an act of compulsion.*

I have the pleasure to inform you, the Nabab still adheres to his resolution of proceeding immediately to Fyzabad for the purpose already mentioned to you. *Letter from N. Middletan to W. Hastings Esq. Dated 9th December* 1781.

নিস্তেজ হতভাগ্য আসফ উদ্দৌলা যখন দেখিলেন যে, ইংরাজেরা কোন ক্রমে তাঁহাদিগের অভিপ্রেত কুকার্য্য হইতে বিরত হইল না, তখন অগত্যা প্রজাদিগের দৃষ্টিতে আপন সম্ভ্রম রক্ষার্থ ইংরাজদিগের এই সকল কার্য্য নিজের কার্য্য বলিয়া প্রকাশ করিলেন। কিন্তু জননী এবং পিতামহীর ধনাগার লুণ্ঠন করিবার ইচ্ছা তাহার একেবারেই ছিল না। ইংরাজ রেসি-ডেণ্ট মিড্‌ল্টন সাহেব বলিলেন,—"নবাব স্বয়ং ফায়েজাবাদে যাইয়া তাঁহার জননী এবং পিতামহীর ধনাগার লুণ্ঠন না করিলে, ইংরাজ সৈন্যগণ তাঁহার জননী ও পিতামহীর অন্দরে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহাদের যথাসর্ব্বস্ব লুট করিবে।"

রেসিডেণ্টের এই কথা শুনিয়া আসফ উদ্দৌলা অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলেন; মনে করিতে লাগিলেন যে, ইংরাজ সৈন্য তাঁহার জননীর এবং পিতামহীর অন্দরে প্রবেশ করিলে ভদ্র সমাজে তাঁহার অত্যন্ত কলঙ্ক হইবে। প্রজাগণ তাঁহাকে ঘৃণা করিবে। সুতরাং অগত্যা তিনি নিজেই জননী এবং পিতামহীর ধনাগার লুণ্ঠন করিতে যাইবেন বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। তাঁহার এই প্রকার সম্মত হইবার মুখ্যাভিপ্রায় এই যে, তাঁহার প্রজাগণ জানিতে না পারে যে, ইংরাজেরা তাঁহার জননীর উপর অত্যা-চার করিতে সমর্থ।

এদিকে ওয়ারেণ হেষ্টিংস এই সকল কুকার্য্য সংসাধনে বিলম্ব দেখিয়া ২৬এ ডিসেম্বর তারিখে বেনারস হইতে মিড্‌ল্টন সাহেবের নিকট পত্র লিখিলেন—

"আমি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছি। এখন এখান হইতে কলি-কাতা প্রত্যাবর্ত্তন করিব, কি লক্ষ্ণৌ যাইব কিছুই স্থির করিতে পারি না। আমি আশা করিয়াছিলাম যে এত দিনে তুমি সকল কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছ; চুনারে অবস্থানকালে আমি যে সকল বন্দোবস্ত করিয়াছি, তৎসমুদয়ই তুমি কার্য্যে পরিণত করিয়াছ। কিন্তু এখন দেখিতেছি যে বিগত তিন মাসের মধ্যে তুমি কিছুই কর নাই। তোমাকে আমি লিখি-তেছি যে ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিয়া আমার নিকট বলিবে, যে সকল কার্য্যের ভার তোমার প্রতি অর্পিত হইয়াছে, তাহা তুমি সম্পন্ন করিতে পারিবে কি না? যদি এই সকল কার্য্য সংসাধনে তুমি আপনাকে নিতান্ত অসমর্থ বলিয়া মনে কর, তবে অবিলম্বে আমাকে তাহা জানাইবে। আমি সত্বরই লক্ষ্ণৌ যাত্রা করিব। আমি বিলক্ষণ জানি যে তোমার অসাধ্য

কিছুই নহে। কিন্তু তত্রাচ তোমাকে সাবধান করিতেছি, কার্য্যে কোন বিলম্ব না হয় *।”

মিড্‌ল্টন সাহেবকে যে হেষ্টিংস লিখিয়াছেন, “তোমার অসাধ্য কোন কার্য্য নাই,” এ কথা মিথ্যা নহে। দুই একজন লোক ভিন্ন সাধারণতঃ ইংরাজ রেসিডেণ্টদিগের অসাধ্য কোন কার্য্যই নহে। মিথ্যা প্রবঞ্চনা এবং উৎকোচ গ্রহণে ইহারা বিলক্ষণ পটু।

এই প্রকারে ১৭৮২ সালের জানুয়ারির প্রারম্ভ পর্য্যন্ত মিড্‌ল্টন সাহেব এবং হেষ্টিংসের মধ্যে অসংখ্য অসংখ্য পত্রাপত্রি চলিতে লাগিল। সে সমুদয় পত্রের সারাংশ উদ্ধৃত করিতে হইলে পুস্তকের আয়তন আটগুণ বৃদ্ধি হইয়া পড়িবে। এই স্থানে সংক্ষেপে কেবল এই ডাকাইতীর মূল বিবরণ বিবৃত করিতেছি।

ছয় বৎসর বয়স্ক বালককে ধৃত করিয়া গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় লইয়া যাইবার সময়, বালক গুরুমহাশয়ের বেত্রাঘাতের বিষয় স্মরণ করিয়া যদ্রূপ কাঁপিতে থাকে, আজ হতভাগ্য আসফউদ্দৌলা সেই প্রকার কাঁপিতে কাঁপিতে মিড্‌ল্টন সাহেবের সঙ্গে স্বীয় জননী এবং পিতামহীর ধনাগার লুণ্ঠনার্থ ফায়েজাবাদে যাত্রা করিলেন।

বেগমদ্বয় অন্যান্য চিন্তায় দিন যামিনী যাপন করিতেছেন। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর গবর্ণর জেনেরেল যে ষড়যন্ত্র পূর্ব্বক তাঁহাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ প্রস্তুত করিয়া, তাঁহাদের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিবেন, ইহা স্বপ্নেও তাঁহারা কখন মনে করেন নাই। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁহাদের দুইজনের নিকটই পৃথক্ পৃথক্ একরারনামা লিখিয়া দিয়াছেন যে অন্য কেহ তাঁহাদের ধন সম্পত্তি অপহরণ করিতে উদ্যত হইলে, কোম্পানী স্বীয় সৈন্য প্রদান করিয়া তাঁহাদিগের ধন সম্পত্তি রক্ষা করিবেন। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া

* I have waited this long in the hopes of hearing that some progress had been made in the execution of the plan which I concluded with the Nabab in September last. I do not find that any step towards it has been yet taken though three months are elapsed * * * *
I now demand and require you most solemnly to answer me. Are you confident in your own ability to accomplish all these purposes and the other points of my instructions? If you reply that you are, I will depart with a quiet and assured mind to the presidency * * * *
I know that your capacity is equal to any service.—*Letter from W. Hastings to Mr. Middleton dated 26th December* 1781.

কোম্পানী কেবল অনুগ্রহ করিয়া এই প্রকার একরারনামা লিখিয়া দেন নাই। আসফ উদ্দৌলা ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীকে টাকা দিতে অসমর্থ হইলে, বেগমেরা আপন আপন তহবিল হইতে সময়ে সময়ে ইংরাজদিগকে টাকা দিয়াছেন। বেগমদ্বয়ের সাহায্য প্রাপ্তি নিবন্ধন ইংরাজেরা এইরূপ উপকৃত হইয়াই তদ্রূপ একরারনামা লিখিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু সন্ধি ভঙ্গ কিম্বা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে ফিরিঙ্গীর একটুও লজ্জা বোধ হয় না। অর্থের লোভে তৎকালের ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ কোন প্রকার কুকার্য্যেই বিরত হইতেন না। বেগমদিগের বিরুদ্ধে ওয়ারেণ হেষ্টিংস মিথ্যা অভিযোগ প্রস্তুত করিয়া পরে তাহার প্রমাণ সংগ্রহার্থ সুপ্রিমকোর্টের প্রধান জজকে নিযুক্ত করিলেন। মিথ্যা প্রমাণ সংগ্রহই প্রধান বিচারপতির একমাত্র কর্ত্তব্য হইল। এখন প্রমাণ প্রস্তুত করা হইয়াছে। সুতরাং নিঃশঙ্ক হৃদয়ে মিড্‌ল্‌টন্ সাহেব আসফ উদ্দৌলাকে সঙ্গে করিয়া ফায়েজাবাদে চলিয়াছেন।

বেগমদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ হইয়াছে যে, তাঁহারা সৈন্য প্রদান করিয়া চেৎসিংহের সাহায্য করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, চেৎসিংহ প্রাণান্তেও ইংরাজদিগের সঙ্গে কখনও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন নাই। ইংরাজেরা তাঁহার এক একটী দুর্গ আক্রমণ করিবামাত্র, তিনি এক দুর্গ হইতে অপর দুর্গে, তৎপর তৃতীয় দুর্গে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়াছিলেন। অবশেষে শেষ দুর্গ আক্রান্ত হইবামাত্র তিনি দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন।

এদিকে বেগমেরা চেৎসিংহকে চিনিতেন না। বেনারসে যে চেৎসিংহের সঙ্গে ইংরাজদের বিবাদ হইয়াছে তাহার বিন্দু-বিসর্গও এখন পর্য্যন্ত জানেন না। ইহাদিগের চেৎসিংহের নাম শুনিবার কখনও সুযোগ হইত না। কিন্তু রাজা বলবন্ত সিংহের মৃত্যুর পর নব্যাব সুজা উদ্দৌলা বলবন্ত সিংহের রাজ্য দখল করিবার নিমিত্ত একবার বেনারসে গিয়াছিলেন। চেৎসিংহ সুজার আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া একাকী জোনপুরে আসিয়া নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। এবং আপন উষ্ণীষ নবাবের ক্রোড়ে রাখিয়া বলিলেন "আপনি আমার পিতা আমাকে রক্ষা করুন।"

সুজা চেৎসিংহকে শরণাগত হইতে দেখিয়া, তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক আপন পুত্র স্বরূপ গ্রহণ করিলেন। চেৎসিংহ পরম সুন্দর পুরুষ। তাঁহার বয়ঃক্রম তখন বার বৎসর মাত্র। এই সময় নবাব পুত্র বালক আসফ

উদ্দৌলাও সুজার সঙ্গে ছিলেন। সুজার আদেশানুসারে চৌদ্দ বৎসর বয়স্ক আসফ উদ্দৌলা চেৎসিংহের সঙ্গে আপন পাগড়ী বদল করিলেন।* বেগমেরা বাল্যাবস্থায় আসফ উদ্দৌলার মস্তকে চেৎসিংহের সেই বিবিধ মণি মুক্তা খচিত পাগড়ী দেখিয়াই পূর্ব্বে চেৎসিংহের নাম শুনিয়াছিলেন। এই ঘটনা না হইলে চেৎসিংহের নাম পর্য্যন্ত বেগমদিগের শুনিবার সুযোগ হইত না।

মিডল্টন সাহেব নবাব আসফ উদ্দৌলাকে সঙ্গে করিয়া ফায়েজাবাদে আসিয়া পৌঁছিলেন। এই ঘটনার কয়েক মাস পূর্ব্বে আসফ উদ্দৌলা একবার জননীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া গিয়াছেন। আবার অত্যল্পকাল মধ্যেই তাঁহাকে ফায়েজাবাদে আসিতে দেখিয়া, সকলে আশ্চর্য্য হইলেন। ইঁহারা যে উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন তাহার বিন্দু-বিসর্গও এখন পর্য্যন্ত বউ বেগম বিমতী বেগম জানিতে পারেন নাই। বউ কোন সাদরে এবং সস্নেহে পুত্রকে গ্রহণ করিবেন বলিয়া বিবিধ আয়োজন করিতেছেন।

নবাব আসফ উদ্দৌলা এবং ইংরাজ রেসিডেণ্ট ক্রমে বেগমদিগের প্রাসাদের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন। ইঁহারা সিংহদ্বারের নিকট পৌঁছিয়াই দ্বাররক্ষক সিপাহীদিগকে তাড়াইয়া দিয়া সঙ্গীয় সৈন্যদিগকে বেগমের প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক বেগমের ধনাগার লুণ্ঠন করিবার আদেশ করিলেন। বেগমেরা তচ্ছ্রবনে একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। প্রাসাদের ভিন্ন ভিন্ন দ্বারে প্রায় একশত সিপাহী ছিল। তাহারা ইংরাজ রেসিডেণ্টের সঙ্গীয় সৈন্যদিগকে বেগমের প্রাসাদ আক্রমণ করিতে দেখিয়া, অস্ত্র শস্ত্রসহ সংগ্রামার্থ প্রস্তুত হইল। ফায়েজাবাদে বউ বেগমের যে অল্পসংখ্যক সিপাহী ছিল, তাহারা সকলেই বউ বেগমকে আপন জননী বলিয়া মনে করিত। সুতরাং তাহারা প্রাণপণে দ্বার রক্ষা করিতে লাগিল। এদিকে ইংরাজ রেসিডেণ্টের সঙ্গে যে সকল দেশীয় সৈন্য আসিয়াছিল, তাহারা পূর্ব্বে অযোধ্যার নবাবের সিপাহী ছিল। বিদেশীয় রাজনৈতিক কৌশলেই তাহারা এখন ইংরাজদের সৈন্য ভুক্ত হইয়াছে। তাহারা বেগমের অন্দরে প্রবেশ করিতে হইবে এই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিল "আমরা সাত পুরুষ যাহার নুন খাইয়াছি তাহার অন্দর লুট করিতে পারিব না।" †

* বলবন্ত নামায় এই ঘটনা উল্লিখিত হইয়াছে।

† Mr. Middleton (in his evidence) states that they found great diffi-

মিডল্‌টন সাহেব দেখিলেন যে, ঘোর বিপদ উপস্থিত। সিপাহীগণ বেগমদিগের অন্দর এবং ধনাগার দেবমন্দির বলিয়া মনে করে। যে কয়েকজন ইংরাজ সৈনিক পুরুষ আছে, তাহারা অন্যান্য সিপাহীর সাহায্য ভিন্ন অন্দরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইবে না; বেগমদিগের সিপাহীগণ অনায়াসে তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে পারিবে; তিনি অনন্যোপায় হইয়া আসফ উদ্দৌলার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন—"ধনাগার লুণ্ঠনার্থ এখন কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে?"

আসফ উদ্দৌলা অত্যন্ত বিরক্তিভাব প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন, "আমি কিছু বলিতে পারি না। তোমাদের যাহা ইচ্ছা কর।"

কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিদেশীয় রাজনৈতিক কৌশল অতি চমৎকার। ইহারা দেশীয় রাজগণের মন্ত্রী এবং প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীকে সর্ব্বদাই হাতের মধ্যে রাখেন। দেশীয় রাজগণের মন্ত্রী এবং অন্যান্য প্রধান কর্ম্মচারী নির্ব্বাচনের ক্ষমতা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টই সঞ্চালন করেন। এই সময় যদিও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এই বিষয়ে সম্পূর্ণ ক্ষমতা ছিল না। তত্রাচ উৎকোচ ইত্যাদি প্রদান পূর্ব্বক দেশীয় রাজগণের মন্ত্রীকে হাতের মধ্যে রাখিতেন। আসফ উদ্দৌলার মন্ত্রী হায়দরবেগ খাঁ এখন ইংরাজদিগের প্রসাদাকাঙ্ক্ষী। মিডল্টন সাহেব কিরূপে বেগমদিগের ধনাগার লুট করিবেন তৎসম্বন্ধে হায়দরবেগ খাঁর পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। অকৃতজ্ঞ, বিশ্বাসঘাতক হায়দরবেগ খাঁ মন্ত্রীর পদ প্রাপ্তির দীর্ঘকাল পূর্ব্বে সুজা উদ্দৌলার আমলে একজন ক্ষুদ্র আমিল ছিল। তহবিল তছরূপের অপরাধে সুজা উদ্দৌলা ইহাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু দয়াবতী বউ বেগমের অনুরোধে সুজা ইহাকে কারামুক্ত করিয়া পুনর্ব্বার কার্য্যে বাহাল করিলেন। আজ হায়দরবেগ খাঁ বউ বেগমকে সেই উপকারের প্রতিশোধ প্রদান করিল। মিডল্টন সাহেবের নিকট বলিল যে, বউ বেগমের খোজা বহরালী এবং জহরালীকে কারারুদ্ধ করিয়া প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেই, বেগম তাহাদের প্রাণ রক্ষার্থ সমুদয় ধনাগার ছাড়িয়া দিবেন *

culties in getting at their treasures; that they stormed their fort successively; but found great reluctance in the Sepoys to make their way into the inner enclosure of the womens appartment. E. Burke page 191.

* হায়দরবেগ খাঁ যে এইরূপ পরামর্শ দিয়াছিলেন, তাহা নিম্ন উদ্ধৃত মিডল্‌টন

বউ বেগম এবং মতী বেগমের ধনাগার খোজা জহরালী, বহরালী এবং দারাবালী খাঁর জেম্বা ছিল। এই সকল খোজা বেগমদিগের মন্ত্রীর ন্যায় সৎপরামর্শদাতা; বন্ধুর ন্যায় সহচর; বিশ্বস্ত ভৃত্যের ন্যায় মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী; পিতার ন্যায় রক্ষক; জননীর ন্যায় প্রতিপালক ছিল। বিশেষতঃ বউ বেগম বাল্যাবস্থায় বৃদ্ধ জহরালী এবং বহরালীর অঙ্কে প্রতিপালিত হইয়াছেন। এখনও তিনি ইহাদিগকে জননীর ন্যায় মনে করেন। অকৃতজ্ঞ বিশ্বাসঘাতক হায়দরবেগ খাঁর পরামর্শানুসারে অর্থলোভী নরপিশাচ মিডল্টন সাহেব বৃদ্ধ জহরালী এবং বহরালীকে কারারুদ্ধ করিয়া লৌহ শৃঙ্খল দ্বারা তাহাদের হস্ত পদ বন্ধন পূর্ব্বক প্রহার করিতে লাগিলেন। বেগমেরা ইহাদের যন্ত্রনা এবং কষ্টের কথা শ্রবণ করিয়া, শোক ও দুঃখে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন।

মিডল্টন সাহেব বেগমদিগের নিকট বলিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহারা উভয়ের ধনাগারের সমুদয় টাকা প্রদান করিলে খোজা জহরালী ও বহরালীকে কারামুক্ত করিবেন। বেগমেরা তখন আপন আপন ধনাগার শূন্য করিয়া প্রায় দুই কোটী টাকা প্রদান করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের ধনাগারের টাকা পথেই লুট হইতে লাগিল। এই দুই কোটী ...

সাহেবের পত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। Dear Sir Elijah—I have the satisfaction to inform you that we have at length so far obtained the great object of our expedition to this place as to commence on the receipt of money, of which, in the course of this day, we have got about sixty lacs. I know not yet what amount we shall actually realize. * * *

It has been at once the most important and the most difficult point of duty, which have ever occured in my office; and the anxiety, the hopes and fears which have alternately agitated my mind, can not be described or conceived but by those who have been witness to what has passed in the course of this long contest. The Nabab's ministers have supported me nobly and deserve much commendation. Without the shrewed discernment and knowledge of the finesse and tricks of the country which Hyder Beg Khan possesses, I believe we should have succeeded but indifferently; for I soon found that no real advantage was to be obtained by proceeding at once to violent extremities with the Begum, and she was only to be attacked through the medium of her confidential servants * * We at last effected it; and by using some few serverities with them, we at length came to the secret hoards of this old lady.

ষাট লক্ষ টাকা মাত্র হইয়া পড়িল। কোম্পানীর প্রাপ্য টাকার মধ্যে কেবল ষাট লক্ষ টাকা উসুল পড়িল। বক্রী সমুদয় টাকাই পথে লুট হইল। ইহাতে আসফ উদ্দৌলার সমুদয় দেনা পরিশোধ হইল না।

মিডল্টন সাহেব আবার বেগমদিগের নিকট লিখিলেন, "আরও টাকা না দিলে খোজাদিগকে কারামুক্ত করা হইবে না। কিন্তু বেগমদিগের আর নগদ টাকা প্রদান করিবার সাধ্য নাই। সুতরাং গৃহের সমুদয় মূল্যবান মণি-মুক্তা নগদ টাকার পরিবর্ত্তে প্রদান করিলেন। লক্ষটাকা মূল্যের হীরক দশ হাজার টাকা মূল্যের মুক্তা দশ পাঁচ টাকা মূল্যে নিলাম হইতে লাগিল। ফয়েজাবাদস্থ ইংরাজ এবং ইংরাজ রমণীগণ এই সকল মণি মুক্তা ক্রয় করিতে লাগিলেন। এই সকল মহামূল্য মণি মুক্তা দ্বারাও আসফ উদ্দৌলার দেনা পরিশোধ হইল না। বৃদ্ধ খোজাদ্বয়কে রেসিডেণ্ট কারামুক্ত করিলেন না। আজীবন এই খোজাদ্বয় নবাবদিগের ন্যায় পরম সুখে নবাব গৃহে জীবন যাপন করিয়াছেন। আজ হস্ত পদে লৌহ শৃঙ্খল পরিধান পূর্ব্বক অতি মলিন গৃহে কারারুদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন। কয়েদীর ভোগ্যবস্তু দ্বারা ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়া জীবন ধারণ করিতেছেন।

চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

আজ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল।

পাঠক, জহরালী এবং বহরালীকে কারাগারে রাখিয়া একবার খোর্দ্দ-মহলে প্রবেশ কর। জহরালী খাঁ এবং বহরালী খাঁর কারামুক্ত হইবার এখনও ছয়মাস বিলম্ব আছে। যখন ইহাঁরা একেবারে মৃত-প্রায় হইয়া পড়িবে; যখন দস্যুদলাধিপতি ওয়ারেণ হেষ্টিংস বুঝিতে পারিবেন যে, বেগম-দিগের আর একটী পয়সা প্রদান করিবারও ক্ষমতা নাই, তখন ইহাঁরা কারামুক্ত হইতে পারেন। কারাগারে বসিয়া দিন দিন ইহাঁদের কষ্ট যন্ত্রণা দর্শন করিতে কি কাহারও ইচ্ছা হয়? কারাগারে ইহাঁদের দুরবস্থা দর্শন করিলে পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হয়। পাঠক ও পাঠিকাগণ একবার খোর্দ্দ-মহলে প্রবেশ কর।

ভিন্ন ভিন্ন খোর্দ্দমহলবাসিনী নবাব সুজা উদ্দৌলার এবং তাঁহার পিতা পিতামহের প্রত্যেক উপপত্নী এবং তাঁহাদের গর্ভজাত সন্তান সন্ততি সুজা উদ্দৌলার আমলে নবাব সরকার হইতে ভরণ পোষণের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ মাস মাস নির্দ্দিষ্ট হারে কতক টাকা পাইতেন।

আমরা ইহাঁদিগকে উপপত্নী বলিয়া অভিহিত করিতেছি। কিন্তু মুসলমানদিগের শাস্ত্রানুসারে ইহাঁরা সকলেই নবাবের ধর্ম্মপত্নী। ইহাঁদিগের গর্ভজাত সন্তানগণও কখন কখন সিংহাসন লাভ করিতেন।

নবাব আসফ উদ্দৌলার সিংহাসনারোহণের পর ইহাঁদিগের প্রাপ্য টাকা বাকী পড়িতে লাগিল। সুজা উদ্দৌলার একজন পত্নীর গর্ভজাত পুত্র মৃজাজুঙ্গলী অত্যন্ত তেজস্বী ছিলেন। তাঁহার দুই বৎসরের প্রাপ্য টাকা বাকী পড়িলে পর, তিনি অযোধ্যা হইতে পলায়ন পূর্ব্বক সিন্ধিয়ার রাজ্যে চলিয়া গেলেন। সেখানে সিন্ধিয়ার সৈন্যাধ্যক্ষের পদের প্রার্থী হইলেন।

খোর্দ্দমহলবাসিনী নবাব পত্নীদিগের ভরণ পোষণের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ আসফ উদ্দৌলা প্রায় চারি পাঁচ বৎসর হইতে একটী পয়সাও দিতে পারেন না। কিন্তু সহৃদয়া বউ বেগম এবং মতী বেগম আপন আপন জায়গীরের উপস্বত্ব দ্বারা আজ চারি বৎসর কাল খোর্দ্দমহল বাসিনী প্রায় দুই হাজার নিরাশ্রয়া রমণীকে ভরণ পোষণ করিতেছেন। ইহাদিগের অন্নকষ্ট নিবারণ করিবার উদ্দেশ্যেই বউ বেগম টাকা সঞ্চয়ার্থ এত যত্ন করিতেন। খোর্দ্দমহলবাসিনী রমণীদিগের সন্তান সন্ততির বিবাহের ব্যয়ও বউ বেগম এবং মতীবেগম বহন করিতেন।

কিন্তু ১৭৮২ সনের জানুয়ারি মাসে বেগমদ্বয়ের তহবিলের সমুদয় অর্থ সম্পত্তি ইংরাজেরা লুণ্ঠন করিয়াছে। বেগমদিগের সমুদয় জায়গীর বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। খোর্দ্দ মহলের মাসিক নিয়মিত ব্যয় প্রায় বিশ হাজার টাকা। খোর্দ্দমহলবাসিনী প্রত্যেক নবাব পত্নীর তিন চারিজন বাঁদী এবং তিন চারি জন গোলাম রহিয়াছে। এই সকল বাঁদীদিগের সন্তান সন্ততির ভরণ পোষণের ব্যয়ও বউ বেগম এবং মতীবেগমকে দিতে হইত।

জানুয়ারি মাস হইতেই বউ বেগম এবং মতীবেগম খোর্দ্দ মহলের ব্যয় বহন করিতে একেবারে অসমর্থা হইলেন। তাঁহাদের হাতে এখন আর একটী পয়সাও নাই। খোর্দ্দ মহলবাসিনী রমণীগণ অতি কষ্টে আপন

আপন গাত্রাভরণ বিক্রয় করিয়া একমাসের অন্নের সংস্থান করিলেন। ফেব্রুয়ারী মাসে কয়েকদিন ঋণ ইত্যাদি করিয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ফেব্রুয়ারী মাস গত হইতে না হইতেই ইহাঁদের ঘোর অন্নকষ্ট উপস্থিত হইল। পরিধেয় বস্ত্রাদি বিক্রয় করিয়া ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যেক দিন এক সন্ধ্যা আহার করিয়া দিন যাপন করিতে লাগিলেন। খোর্দ্দমহলে নবাব পত্নীগণ এবং দাস দাসী ভিন্ন অন্যূন তিন চারি শত বালক বালিকাও অনাহারে এইরূপ কষ্ট ভোগ করিতে লাগিল।

মার্চ্চমাসের ৩রা, ৪ঠা, ৫ই তারিখ তিন চারি শত বালক বালিকা-সহ সমুদয় খোর্দ্দমহলবাসিনী রমণী অনাহারে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। তিন দিনের অনশন এবং অন্নকষ্ট ইহাঁদিগের অন্তরস্থিত লজ্জা ভয় একেবারে বিদূরিত করিল। অনাহার এবং দারিদ্র্য ইহাঁদিগের মানব প্রকৃতি হরণ পূর্ব্বক ইহাঁদিগকে রাক্ষস প্রকৃতি প্রদান করিল। ৫ই মার্চ্চ তারিখ রাত্রে ইহারা খোর্দ্দমহলের সিংহদ্বার ভগ্ন করিয়া বাহির হইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। খোর্দ্দমহলবাসিনী রমণীগণ দ্বাররক্ষক সিপাহী দিগের মস্তকে ইষ্টক নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন * কোন কোন রমণী আত্ম-হত্যা করিবার নিমিত্ত ছাদে উঠিতে আরম্ভ করিলেন।

ইংরাজদিগের ফায়েজাবাদের কেণ্টনমেণ্টের অধ্যক্ষ কাপ্তেন লেনার্ড জ্যাক্‌স্ সাহেব এই সকল ঘটনা লক্ষ্ণৌর প্রতিনিধি রেসিডেণ্ট জনসন সাহেবের নিকট পত্র লিখিলেন। কিন্তু ইহাঁদিগের আহারের কোন সংস্থান করিলেন না।

বহু বেগমের হাতে একটী পয়সাও নাই। তিনি বাজারের দোকান-দারদিগকে ইহাঁদিগকে আহার্য্য দ্রব্য দিতে হুকুম করিয়া পাঠাইলেন। তাহার মূল্যের বাবত নিজে প্রতিভূ হইলেন।

এই বন্দোবস্ত দ্বারা দুই তিন মাসের মধ্যে আর ইহাঁদের একেবারে অনশনে দিন যাপন করিতে হইল না। মার্চ্চ, এপ্রিল, মে এই তিন মাস অতি কষ্টে দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

---

* The women belouging to the Khourd Mahl are at last drove to desperation * * They at night get on the top of the zenana, make a great disturbance * * * Last might not only abused the sentinels, but threw dirt at them; they threatened to throw themselves from the walls of the zenana, and also to break out of it.—*Letter from Captain Leonard Jaques to R. Johnson Esq., offg. Resident, Lucknow, Dated 6th March,* 1782.

মে মাসে এদিকে বউ বেগমের প্রিয় খোজা বহরালী এবং জহরালী কারাগারে একেবারে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িল। ওয়ারেণ হেষ্টিংস কলিকাতা হইতে লিখিলেন বেগমদ্বয় তাঁহাদের সমুদয় টাকা এখনও বাহির করেন নাই। খোজাদিগকে আরও কষ্ট প্রদান করিবে। কিন্তু খোজাদ্বয় মে মাসে একেবারে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িলে, ফায়েজাবাদের কেণ্টনমেণ্টের অধ্যক্ষ লেনার্ড জ্যাক্‌স্ রেসিডেণ্ট মিডল্টন সাহেবের নিকট লিখিলেন, * "জহরালী এবং বহরালী মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে। এখন তাহাদের হস্ত পদের লৌহ শৃঙ্খল মোচন করিলেও তাহারা পলায়ন করিতে পারিবে না। অতএব এই বিষয়ে আপনার মতামত সত্বর আমার নিকট লিখিবেন।"

এই পত্রের প্রত্যুত্তরে মিডল্টন সাহেব লিখিলেন যে ইহাদিগের লৌহ শৃঙ্খল মোচন করা হইবে না। ইহারা এখন পর্য্যন্ত সমুদয় টাকা প্রদান করে নাই। †

ইহার কয়েক দিন পরে মেজর গিল্পিন সাহেব হেষ্টিংস এবং মিডল্টন সাহেবের আদেশানুসারে জহরালী এবং বহরালীকে অযোধ্যা হইতে ইংরাজদিগের রাজ্যে দ্বীপান্তর করিবেন বলিয়া বেগমদিগকে ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। বেগমেরা এই সংবাদ শ্রবণে একেবারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কি উপায়ে যে এই খোজাদিগকে উদ্ধার করিবেন তাহা আর চিন্তা করিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে বেগমদ্বয়ের গৃহে যে কিছু জিনিস পত্র ছিল—জল পান করিবার গ্লাসটী ঘটীটী পর্য্যন্ত—সমুদয় বিক্রয় করিয়া যে কিছু টাকা সংগ্রহ করিলেন; তৎসমুদয় ইংরাজদিগকে প্রদান করিলেন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহারা খোজাদিগকে কারামুক্ত করিলেন না। ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগের নিকট বেগম

* The prisoners, Behar and Jowar Ali Khan, who seem to be very sickly, have requested their irons might be taken off for a few days, that they might take medicine, and walk about the garden of the place where they are confined, to assist the medicine in its operation. Now as I am sure they would be equally as secure without their irons as with them &c. ***Letter from Leonard** Jaques to Mr. Middleton Esq., Resident at Lucknow,* ***Dated, Fyzabad,*** **18*th May*, 1782.**

† **I am sorry it is** not in my power to comply with your proposal of **erasing the prisoners** for a few days of **their** fetters &c. *Letter from N. Middleton Esq' Resident at Lucknow to Captain L. Jaques at Fyzabad,* ***Dated Lucknow,* 22*nd May*** 1782.

বিনীত ভাবে ইহাদিগকে কারামুক্ত করিবার অনুরোধ করিলে, তাঁহারা বলিতেন "এ সকল নবাব আসফ উদ্দৌলার হুকুমানুসারে হইতেছে। আমাদের ইহাতে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই।"

বেগম গৃহের জিনিস পত্র বিক্রয়ের টাকা দিয়াও খোজাদিগকে কারামুক্ত করিতে পারিলেন না। ইহার পর, নিজের এবং তাঁহার বাঁদীদিগের যে সকল মূল্যবান বস্ত্র ছিল, তাহা বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিলেন। একজন বাঁদীর একখানি ছিন্ন বস্ত্র বেগম নিজে পরিধান করিয়া নিজের পরিধেয় বস্ত্রখানি পর্য্যন্ত বিক্রয় করিলেন। কিন্তু ইহাতেও পাষাণ সদৃশ ইংরাজ হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল না। বস্ত্র বিক্রয়ের সমুদয় টাকা গ্রহণ করিয়া পরে জুন মাসে জহরালী এবং বহরালীকে ইংরাজেরা লক্ষ্ণৌ জেলে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু এদিকে প্রচার করা হইল যে, নবাব আসফ উদ্দৌলার হুকুমানুসারে ইহারা লক্ষ্ণৌ প্রেরিত হইল।

বেগমের নিকট যখন ইংরাজেরা বলিয়া পাঠাইলেন যে, নবাব আসফ উদ্দৌলার হুকুমানুসারে এই খোজাদ্বয় লক্ষ্ণৌ প্রেরিত হইল; তখন পুত্রের প্রতি তাঁহার ক্রোধানল শতগুণে প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। তিনি অত্যধিক কোপাবিষ্ট হইয়া আসফ উদ্দৌলাকে লিখিয়া পাঠাইলেন—

"রে নরাধম! মুসলমান কুলের কুলাঙ্গার! যে হতভাগিনী দশমাস তোকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিল, আজ একবার তাঁহার দুর্দ্দশা এখানে আসিয়া স্বচক্ষে দেখিয়া যা। তোর ন্যায় কুপুত্র গর্ভে ধারণ করা অপেক্ষা আজীবন বন্ধ্যা থাক্যই ভাল ছিল। তোর ন্যায় কুপুত্রকে গর্ভে ধারণ করিয়া যে ঘোর পাপানুষ্ঠান করিয়াছি, আজ সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল। তোকে রাজপদে অভিষিক্ত করাইয়া, রাজপদের উপযুক্ত সপত্নী পুত্রের প্রতি যে অন্যায়াচরণ করিয়াছি, আজ সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল। আমার যে বক্ষ সতত স্বর্ণমুক্তাখচিত বস্ত্রাবৃত থাকিত; যে বক্ষ তোরই নিরাশ্রয় বাল্যকালের একমাত্র শয্যা ছিল; এ সংসারের অন্য কেহ যে বক্ষ কখন দেখিতে পায় নাই; বস্ত্রাভাবে আজ সেই বক্ষ অনাবৃত হইয়া রহিয়াছে; আজ আমি অনাবৃত বক্ষে ভিখারিণীর বেশে কাল যাপন করিতেছি। এ বক্ষ মধ্যে শোকানল প্রজ্জলিত হইয়া আমার সমুদয় শরীর দগ্ধ করিতেছে। তুই আজ এ বক্ষে আগুন জালিয়া দিয়াছিস। ধিক্ তোর রাজপদ! ধিক্ তোর জীবন!"

পারস্য ভাষায় বেগমের স্বহস্ত লিখিত এই পত্রখানি নবাব আসফ উদ্দৌলার নিকট প্রেরিত হইল। কিন্তু এ পত্র তো পত্র নহে। এ মাতৃ হৃদয়ের আগুন। বেগম কোপাবিষ্ট হইয়া বুঝিলেন না যে, এ অগ্নি সংস্পর্শে নিশ্চয়ই আসফ উদ্দৌলাকে জ্বলিয়া মরিতে হইবে। হতভাগ্য আসফ উদ্দৌলার যদি কোন অপরাধ থাকে, তবে সে কেবল কাপুরুষতা। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অর্থ গৃধ্নুতা অযোধ্যা বিনাশের মূল কারণ। হাফেজ নন্দিনীর শোণিতানলেই সমুদয় অযোধ্যা দগ্ধ হইতেছে।

এই সকল ঘটনার পর বেগম চিত্ত সংযম পূর্ব্বক ভাবিতে লাগিলেন—"এ সকলই আমার নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত। হিন্দু পণ্ডিত যাহা বলিয়াছে সে সকলই সত্য। বিশ্বাসই নারীর বল, প্রেম নারীর অস্ত্র, পবিত্রতা নারীর বর্ম্ম। ধন সম্পত্তি রক্ষার চিন্তা এক সময়ে আমাকে ঘোর মোহান্ধকারে নিমগ্ন করিয়াছিল। আমার হৃদয় বিশ্বাস এবং প্রেম শূন্য করিয়াছিল। সে অসার ধন সম্পত্তি বিনষ্ট হইল। কিন্তু লাভের মধ্যে কেবল বিশ্বাস এবং প্রেমের পথ পরিত্যাগ করিয়া, আমাকে এই ঘোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইল। অবলার বল একমাত্র ঈশ্বর। ধন সম্পত্তি পদ প্রভুত্বের চিন্তায় ঈশ্বরকে বিস্মৃত হইলেই নারীদিগকে এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। নারীগণ যেন আমার দুরবস্থার কথা স্মরণ করিয়া, অর্থাকাঙ্ক্ষা এবং পদ প্রভুত্বের লিপ্সা পরিত্যাগ করে। বিশ্বাস, প্রেম এবং পবিত্রতার পথ অবলম্বন করে।"

একচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

বাঁদীর বেশ।

কয়েক মাস পর্য্যন্ত বউ বেগম নিজে ঋণ করিয়া খোর্দ্দ মহলবাসিনী রমণী এবং বালক বালিকাদিগের দৈনিক অন্নের সংস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, হয়ত কয়েক মাস পরে ইংরাজেরা তাঁহার জায়গীর ছাড়িয়া দিতে পারেন। এই সম্বন্ধে অনেক পত্রাপত্রি চলিতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার সে আশা নিষ্ফল হইল। দুই বৎসরের পূর্ব্বে তাঁহার জায়গীর মুক্ত হইল না। ইংরাজগণ তাঁহার জায়গীরের উপস্বত্ব আসফ উদ্দৌলার দেয় টাকার পরিবর্ত্তে আদায় করিয়া লইতে লাগিলেন।

খোর্দ্দ মহলের মাসিক ব্যয় প্রায় বিশ হাজার টাকা। বউ বেগম এবং মতী বেগম আর খোর্দ্দমহলবাসিনী হতভাগিনীদিগকে এবং এই সকল হতভাগিনীর সন্তান সন্ততিদিগকে অন্ন প্রদান করিতে সমর্থা হইলেন না।

অক্টোবর মাসে আবার খোর্দ্দমহাল হইতে অন্নকষ্টের চীৎকার শুনা যাইতে লাগিল। এ চীৎকারে গগণ মেদিনী পরিপূর্ণ হইল।

এই হতভাগিনী খোর্দ্দমহলবাসিনীগণ কি বলিয়া আর্ত্তনাদ এবং চীৎকার করিয়াছিল,তাহা এই স্থানে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। কখনও তাহারা আপন আপন অদৃষ্টকে তিরস্কার করিয়াছে, কখনও পরমেশ্বরকে গালি বর্ষণ করিয়াছে, কখনও কখনও সর্ব্বজন ঘৃণিত ইংরাজদিগকে বিবিধ প্রকারে অভিসম্পাত করিয়াছে।

কিন্তু ফায়েজাবাদস্থিত ইংরাজদিগের কেণ্টনমেণ্টের প্রধান কার্য্যাধ্যক্ষ মেজর গিল্‌পিন লক্ষ্ণৌর রেসিডেণ্টের নিকট ইহাঁদিগের দুরবস্থা সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিয়াছিলেন, তাহাই কেবল এখানে উল্লেখ করিতেছি।

এখন আবার ব্রিষ্টো সাহেব রেসিডেণ্ট হইয়া আসিয়াছেন। মিডণ্টন এবং জন্‌সন্ হেষ্টিংসের কোপানলে পড়িয়া পদচ্যুত হইয়াছেন। বেগমদ্বয়ের ধনাগার লুণ্ঠন কালে যে মিডণ্টন সাহেব কিছু এদিক ওদিক করিয়াছেন, তাহা হেষ্টিংসের ন্যায় ধূর্ত্ত লোকের বুঝিতে বড় বিলম্ব হয় না। সুতরাং অন্যান্য কার্য্যে ত্রুটীর ছলনায় মিডণ্টন এবং জন্‌সন্‌কে লক্ষ্ণৌ হইতে তাড়াইয়া দিলেন।

১৭৮২ সনের ৩০শে অক্টোবর তারিখে ব্রিষ্টো সাহেবের নিকট মেজর গিল্পিন ফায়েজাবাদ হইতে লিখিলেন।

"গতরাত্র আট ঘটীকার সময় খোর্দ্দমহলবাসিনী রমণীগণ ছাদের উপর উঠিয়া অন্নকষ্ট নিবন্ধন ভয়ানক চীৎকার* করিয়াছে। বিগত চারি দিবস হইতে তাহাদের ঘোর অন্নকষ্ট হইয়াছে। কিন্তু গতকল্য ইহারা একেবারে

---

* Last night about 8 o'clock, the women in the Khourd Mahal zenana, under the charge of Lataffit Ali Khan assembled on the top of the buildings, crying in a most lamentable manner for food ; that for the last four days they had got but a very scanty allowance, and that yesterday they had got none. The melancholy cries of famine are more easily imagined than described &c. *Letter from Major Gilpin to John Bristow Esq., Resident at Lucknow Dated Fyzabad 30th October* 1782.

অনাহারে ছিল। ইহাদিগের সে চীৎকার এবং আর্ত্তনাদ, ভাষা দ্বারা সহজে ব্যক্ত করা যায় না।”

ইহার পর, আবার ১৫ই নবেম্বর মেজর গিল্পিন সাহেব ব্রিষ্টো সাহেবের নিকট লিখিলেন। *

“খোর্দ্দমহলবাসিনী রমণীগণের ক্রন্দন এবং আর্ত্তনাদ অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা খোর্দ্দমহল পরিত্যাগ করিয়া বাজারে যাইতে চাহে। তাহারা বলে যে, বাহিরে যাইয়া তাহারা শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। আমি আর ইহাদিগের এ ভয়ানক দুরবস্থা দেখিতে পারি না। অদ্য আপনার নামে রামনারায়ণকে বিশ হাজার টাকার হুণ্ডী লিখিয়া দিয়া, বিশ হাজার টাকা কর্জ্জ করিয়াছি। এই টাকা হইতে দশ হাজার টাকা তৎক্ষণাৎ খোর্দ্দমহলের দারোগা খোজা লতিফ আলি খাঁর হাতে দিয়াছি।”

খোর্দ্দমহালের স্ত্রীলোকগণ বাজার হইতে প্রায় ত্রিশ হাজার টাকার জিনিস বাকীতে পূর্ব্বেই আনিয়াছেন। মেজর গিল্পিনের প্রদত্ত দশ হাজার টাকা পূর্ব্ব দেনা পরিশোধ করিতেই নিঃশেষিত হইল। ইহাদিগের অন্নকষ্ট নিবারণের আর কোন উপায় রহিল না। ইহার কয়েকদিন পরে এই হতভাগিনী রমণীগণের চীৎকার এবং আর্ত্তনাদ আবার শতগুণে বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ইহারা খোর্দ্দমহালের দ্বার ভগ্ন করিয়া বাহির হইবার উদ্যোগ করিল। খোজা লতিফ আলী খাঁ ইহাদিগকে অনেক বলিয়া কহিয়া আপন আপন গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। লতিফ আলি ইহাদিগের নিকট প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, দুই তিন দিনের মধ্যে ইহাদিগের নির্দ্দিষ্ট প্রাপ্য টাকা লক্ষ্ণৌ হইতে আনাইয়া দিবেন। লতিফ আলীর কথা বিশ্বাস করিয়া তিন চারি দিন ইহারা নির্ব্বাক রহিল। কিন্তু দশ দিনের মধ্যেও লক্ষ্ণৌ হইতে কোন টাকা

* Sir,—The repeated cries of the women in the Khourd Mahal zenana for subsistence have been truly melancholy. They beg most pitiously for liberty, that they may earn their daily bread by laborious servitude; or be relieved from their miseries by immediate death. In consequence of their unhappy situation, I have this day taken the liberty of drawing on you in favour of Ramnarain at ten day's sight for twenty son KERAH rupees, ten thousands of which I have paid to Khojah Latiff Ali Khan, under whose charge that zenana is.—*Letter from Major Gilpin to Bristow* 15*th November* 1782.

আসিয়া পৌঁছিল না। তখন ইহারা লতিফ আলীকে বিশ্বাসঘাতক মনে করিয়া শতগুণে উত্তেজিত হইয়া উঠিল। খোর্দ্দমহলের দ্বার ভঙ্গ করিয়া বাহিরে আসিল।

লতিফ আলী তখন অনন্যোপায় হইয়া হাসমত আলী খাঁ জমাদারের নিকট যাইয়া এই সকল বিবরণ বিবৃত করিলেন। হাসমত আলী প্রহার পূর্ব্বক ইহাদিগকে পুনর্ব্বার খোর্দ্দমহলের ভিতরে বন্ধ করিয়া রাখিবার অভিপ্রায়ে কেণ্টনমেণ্ট হইতে কতক সিপাহী সঙ্গে করিয়া আসিলেন।

খোর্দ্দমহালের দ্বার অন্যূন দুই হাজার লোকে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। সম্মুখে তিন চারি শত বালক, তাহাদের পশ্চাতে সাত আট শত বাঁদী ও বালিকা, সকলের পশ্চাতে প্রায় তিনশত নবাবপত্নী। শেষোক্ত স্ত্রীলোক-দিগের মধ্যেই নবাব বরহান মুলক, নবাব সবদর জাঙ্গ এবং নবাব সুজা উদ্দৌলার পত্নীগণ দাঁড়াইয়াছেন।

সিপাহীদিগকে লক্ষ্য করিয়া ইহারা ইষ্টক নিক্ষেপ করিতে লাগিল। দুই তিন শত সিপাহী অত্যল্পকাল মধ্যে ইহাদিগকে যষ্টির প্রহারে চতুর্দ্দিগে তাড়াইয়া দিল। বালক বালিকাগণ আর কি সিপাহীদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারে? ইহারা চতুর্দ্দিগে দৌড়াইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। চারি পাঁচজন নবাব পত্নীর পৃষ্ঠে সিপাহীদিগের যষ্টির আঘাত পড়িতে লাগিল। সেই সকল নবাবপত্নী তখন লজ্জা ভয় বিবর্জ্জিত হইয়া বউ বেগমের আবাসগৃহ রঙ্গমহলের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বউ বেগম নিজের ইজ্জতের ভয়ে খোজাদিগকে দ্বার রুদ্ধ করিতে বলিয়া, তৎক্ষণাৎ হাসমত আলী খাঁ জমাদারকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। এ দিকে এই অনাথা নবাবপত্নীগণ বাহিরে সিপাহীদিগের সম্মুখে নিতান্ত ভিখারিণীর ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল।

হাসমত আলী খাঁ জমাদার বউ বেগমের নিকট আসিবামাত্র বেগম সক্রোধে বলিলেন—

"বেওয়াফা! নেমক্‌হারাম্! সাত পুরুষ পর্য্যন্ত যাহার নুন খাইয়া মানুষ হইয়াছিস্, আজ তাঁহার পত্নীদিগের ইজ্জাত নষ্ট করিতেছিস্। তাঁহার পত্নীদিগের পিঠে আঘাত করিয়াছিস্।"

হাসমৎ আলীখাঁ এখন ইংরাজদিগের সৈন্যভুক্ত হইয়াছেন। পূর্ব্বে নবাবের সরকারে একজন সুবেদার ছিলেন। তিনি বেগমের ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন—

"আজ্ঞে! নবাব আসফ উদ্দৌলার হুকুমানুসারেই এই রূপ আচরণ করিয়াছি।"

ইংরাজদিগের হুকুমানুসারে যে এই রূপ করিয়াছেন, তাহা বলিতে আর ইহার সাহস হইল না।

বেগম আবার সক্রোধে বলিলেন—"নবাব সুজা উদ্দৌলা, এবং নবাব মনশুর আলীখাঁ সবদর জাঙ্গের পত্নীগণকে এই রূপ অপমান করিবার কোন ক্ষমতা আসফ উদ্দৌলার নাই। দুর্বৃত্ত গোলাম! ভবিষ্যতে যদি আর তুই কখন এই রূপ আচরণ করিস্, তবে নিশ্চয়ই তোর শিরশ্ছেদন করা হইবে।"

বেগম এই বলিয়া নিজে বাহিরে আসিয়া খোর্দ্দমহলবাসিনী রমণীদিগকে বিনীত ভাবে বলিতে লাগিলেন—

"তোমরা অন্ততঃ আপন আপন স্বামীর ইজ্জত রক্ষার্থ এইরূপ আচরণ পরিত্যাগ কর। আমি আত্মবিক্রয় করিয়া তোমাদিগের অন্নের সংস্থানের চেষ্টা করিব।"

সিপাহীদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার সময় যষ্টির আঘাতে যে দুইটী বালকের মাথা ফাটিয়া গিয়াছিল; তাহারা দুইজনই সুজাউদ্দৌলার ঔরসজাত পুত্র। বেগম হাতে ধরিয়া তাহাদিগকে আপন গৃহে লইয়া গেলেন; এবং তৎক্ষণাৎ নিজের এক জন প্রাচীনা বাঁদীর নিকট হইতে কর্জ্জ করিয়া, চারি শত টাকা ইহাদের হাতে দিলেন। *

বউ বেগমকে সমুদয় খোর্দ্দমহলবাসিনী রমণীই অত্যন্ত সম্মান করিতেন, সুতরাং তাঁহারা বেগমের অনুরোধে নিজ নিজ গৃহে চলিয়া গেলেন।

বউ বেগম ইহাদিগের অন্নের সংস্থানার্থ কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারেন না। পরদিন প্রাতে তিনি স্বয়ং মতীমহলে আপন শাশুড়ীর নিকট গমন করিলেন। খোর্দ্দমহলের সমুদয় দুরবস্থার কথা শাশুড়ীর নিকট বিবৃত করিলেন। কিন্তু মতীবেগম পুত্রশোকে এবং অর্থ সম্পত্তির শোকে এখন একেবারে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি কোপাবিষ্ট হইয়া বলিলেন—

---

* The Begum then sent for two of the children who were wounded in the affray of the last night * * * * *
She then gave the children 400 rupees and dismissed them. *Vide Burke's Speeches Vol. II page* 272-73.

"সুজার যেমন কর্ম্ম তেমন ফল—যখন এই বিশ্বাসঘাতক,দাগাবাজ ফিরিঙ্গীকে এ রাজ্যে স্থান দিয়াছে, তখন তাহার পত্নীদিগের যে এ দুর্দ্দশা হইবে তাহা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমার নিকট তোমার কোন পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন নাই।"

বেগম শ্বাশুড়ীর এই কর্কশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে রঙ্গমহলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। মনে করিলেন যে এখন এক পরমেশ্বরের প্রতি নির্ভর ভিন্ন আর কোন উপায় নাই।

বেগম এই বিপদ হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত দিবা রাত্র কেবল ঈশ্বরের চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরমেশ্বরের ইচ্ছায় মৃজা সাদাতালি খাঁ দুই এক দিনের মধ্যেই কাশী হইতে ফায়েজাবাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

মার্ত্তুজা খাঁর প্রাণ সংহারের পর আসফ উদ্দৌলার ভয়ে সাদাতালি এ পর্য্যন্ত বেনারসে অবস্থান করিতেছিলেন। খোর্দ্দমহলবাসিনী নবাব পত্নীদিগের অন্নকষ্টের সংবাদ শ্রবণ করিয়া সাদাতালি অবিলম্বে ফায়েজাবাদে চলিয়া আসিলেন। মৃজা সাদাতালির গর্ভধারিণীও খোর্দ্দমহলবাসিনী নবাব পত্নী। সুতরাং জননীর অন্ন কষ্টের সংবাদ তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ করিল।

তিনি ফায়েজাবাদে আসিয়া দেখিলেন যে, বউ বেগম এখন বাঁদীর পোষাক পরিধান করেন। বউ বেগমের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া সাদাতালি যার পর নাই কষ্টানুভব করিতে লাগিলেন। সাদাতালির নিজের দুই তিন লক্ষ টাকা ছিল। তদ্দ্বারা খোর্দ্দমহালবাসিনীদিগের অন্নের সংস্থান এবং বউ বেগমকে, বেগমের উপযুক্ত পরিচ্ছদ ক্রয় করিয়া দিলেন। কিন্তু বেগম আজীবন বাঁদীর পোষাক পরিধান করিবেন বলিয়াই স্থির করিয়াছেন। যে বেশে তিনি সুজার উদ্ধারার্থ বক্সারে গিয়াছিলেন, সেই বেশেই তিনি দিন যাপন করিতে লাগিলেন; সেই বাঁদীর বেশেই তাঁহার পাপের অন্যতম প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া মনে করিলেন।

দ্বাচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

সম্মিলন।

বিগত ডিসেম্বর মাসে শ্রীনিবাস পণ্ডিত অমরসিংহ, ছত্রসিংহ এবং বাণেশ্বরের সমভিব্যাহারে কাশীতে যাত্রা করিয়াছেন। কাশীতে যাইবার

সময়ে পথে শুনিলেন যে চেৎসিংহের মাতা মহারাণী পূর্ণিমা ফিরিঙ্গীর স্পর্শ স্বরূপ কলঙ্ক হইতে নিস্কৃতি লাভ করিবার নিমিত্ত তুষানলে প্রাণ-ত্যাগ করিয়াছেন। রাস্তায় এক একজন এক এক প্রকার কথা বলিতে লাগিল। কেহ বলিল যে তিনি তুষানল করিয়াছেন। কেহ বলিল যে আগামী মাঘী পূর্ণিমার দিবস তুষানলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিবেন। শ্রীনিবাস এইরূপ সংবাদ শ্রবণে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া শীঘ্র শীঘ্র কাশীতে যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কাশীতে পৌঁছিয়াই তিনি অমরসিংহ, ছত্রসিংহ এবং বাণেশ্বরের নিকট হইতে বিদায় হইয়া পূর্ণিমার বাসস্থানে চলিলেন। পূর্ণিমার আবাস গৃহের ঠিকানা করিতে বিশেষ কোন কষ্ট হইল না। চেৎসিংহের মাতা এবং স্ত্রী যে বাটীতে আসিয়া অবস্থান করিতেছিলেন, সে বাড়ী সকলেই চিনিত।

পূর্ণিমার বাস গৃহের দ্বারে যাইয়া শ্রীনিবাস দ্বার রক্ষকের নিকট বলিলেন—"তোমাদের মহারাণীকে বল যে শ্রীনিবাস পণ্ডিত তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।

দ্বাররক্ষক বলিল "ঠাকুর, রাণী কাহারও সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন না। এ দ্বার সর্ব্বদা বন্ধ রাখিবার হুকুম হইয়াছে।'

শ্রীনিবাস বলিলেন মহারাজ চেৎসিংহের মাতা আমার নাম শুনিলে নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন।

কিন্তু দ্বাররক্ষক কিছুতেই শ্রীনিবাসের কথা বিশ্বাস করিল না। সে বলিল যে স্বয়ং বড় মহারাণী গোলাপকুমারীর সঙ্গেও রাণী সাক্ষাৎ করেন নাই।

শ্রীনিবাস তখন অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আপন নামটী একখানি কাগজে লিখিয়া, দ্বাররক্ষককে রাণীর হস্তে প্রদান করিতে বলিলেন। পূর্ণিমা বাল্যকাল হইতে পিতার স্বাক্ষর চিনিতেন। দ্বার রক্ষককে বলিয়া দিলেন রাণীর নিকট মুখেও বলিবে যে, শ্রীনিবাস পণ্ডিত দ্বারে দাঁড়াইয়া আছেন।

দ্বার রক্ষক শ্রীনিবাসের স্বাক্ষরিত কাগজখানি পূর্ণিমার হস্তে প্রদানানন্তর "শ্রীনিবাস পণ্ডিত" এ কথা বলিবামাত্রই পূর্ণিমা আত্ম বিস্মৃতার ন্যায় দৌড়িয়া গৃহের দ্বারাভিমুখে চলিলেন। এখন তিনি অহর্নিশ কেবল পিতার বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন। এই মুহূর্ত্তেও পিতাকেই মনে মনে ভাবিতেছিলেন। পিতার নাম শ্রবণ মাত্রই পাগলিনীর ন্যায় পিতৃ মুখ

দর্শনার্থ ধাবিত হইলেন। দ্বার রক্ষক তাঁহার তৎসাময়িক অবস্থা দেখিয়া অবাক্ হইয়া পড়িল।

ঠিক্ অষ্টম বৎসর বয়সের সময় পূর্ণিমা পিতাকে কোথা হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দেখিলে, যদ্রূপ দৌড়িয়া যাইয়া পিতার গলা জড়াইয়া ধরিতেন, আজ সেই ভাবে পিতার নিকটে যাইয়া তাঁহার পদতলে পড়িলেন। শ্রীনিবাস কন্যাকে ধরিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

পণ্ডিতেরা বলেন হৃদয়ের পূর্ণতা নিবন্ধন মুখ হইতে বাক্য বহির্গত হয়। কিন্তু হৃদয়ের পরিপূর্ণতা আবার কণ্ঠাবরোধ করে। পূর্ণিমা আজ গৃহে প্রবেশ করিয়া পিতার গলা ধরিয়া বসিলেন। দুই চক্ষু হইতে কেবল প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। দুই ঘণ্টার মধ্যেও কোন কথা বলিবার সাধ্য হইল না। হৃদয়ের পরিপূর্ণতা তাঁহার কণ্ঠাবরোধ করিল।

শ্রীনিবাস অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। পূর্ণিমা তাঁহার কথার প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কোন কথা স্পষ্টরূপে মুখ হইতে বাহির হইল না।

শ্রীনিবাস পূর্ণিমাকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া কিছু কালের নিমিত্ত নির্ব্বাক রহিলেন। পরদিন পূর্ণিমা তুষানলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিবার সংকল্প পিতার নিকট ব্যক্ত করিলেন।

কিন্তু শ্রীনিবাস পণ্ডিত তাঁহাকে নানাবিধ সান্ত্বনা বাক্যে প্রবোধ প্রদানানন্তর বলিতে লাগিলেন—

"বাছা, মূঢ়েরা পাপের প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত অবধারণে অসমর্থ হইয়া, তুষানলে জীবন বিসর্জ্জন করে। কিন্তু অনুতাপানলই পাপের একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত। হৃদয়স্থিত পাপ, অনুতাপানল ভিন্ন কখনও তুষানলে ভস্মীভূত হয় না। যে সকল মূঢ়ের হৃদয়ে কোন প্রকারেই অনুতাপানল প্রবেশ করে না, যে সকল পাষণ্ড মূঢ়ের অন্তরস্থিত দয়া, মায়া, স্নেহ, প্রেম, ভক্তি একেবারে সমূলে বিনষ্ট হইয়াছে; এই জড় দেহ বিনাশার্থ তাহাদের নিমিত্তই কেবল শাস্ত্রকারেরা তুষানলের ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছেন। অশিক্ষা নিবন্ধন বর্ত্তমান সমাজপ্রচলিত পাপ এবং ধন রত্ন পদ প্রভুত্বের গর্ব্ব এক সময় হয়ত তোমার হৃদয়কে স্পর্শ করিয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমান বিপদরাশি তোমার হৃদয় মধ্যে অনুতাপানল প্রজ্জলিত করিয়া তোমার স্বাভাবিক প্রকৃতি পুনরুদ্ধার করিয়াছে। এ সংসার নরনারীর এক-

মাত্র কার্য্যক্ষেত্র। যত্নে জীবন রক্ষা করিয়া, মানব জীবনের কর্ত্তব্য সাধন কর।”

শ্রীনিবাস নানা কথা দ্বারা পূর্ণিমাকে সান্ত্বনা করিলে পর, তিনি তুষানলের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন। পিতার সঙ্গে কাশীতেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। প্রত্যহই পিতার নিকট বিবিধ ধর্ম্মের কথা, শাস্ত্রের কথা শ্রবণ করিতেন।

চেৎসিংহের স্ত্রীর বয়ঃক্রম ষোড়শ বৎসর মাত্র ছিল। রাজ্যচ্যুত হইবার সময় স্বয়ং চেৎসিংহের বয়ঃক্রমও বিশ বাইশ বৎসরের অধিক হইয়াছিল না। শ্রীনিবাস পণ্ডিত, অমরসিংহকে, মহাবীর সিংহকে এবং অন্যান্য লোক সঙ্গে দিয়া চেৎসিংহের স্ত্রীকে চেৎসিংহের নিকট প্রেরণ করিলেন। মির কাসিমের ন্যায় রাজ্য-ভ্রষ্ট হইয়া চেৎসিংহকেও দীর্ঘ কাল এ সংসারের কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে সিন্ধিয়ার রাজধানী গোয়ালিয়ার নগরে মহারাজ চেৎসিংহের মৃত্যু হয়। সুজন সিংহের ইহার অনেক পূর্ব্বেই মৃত্যু হইয়াছিল।

বাণেশ্বর একক্রমে অন্যূন বিশ বাইশ বৎসর কাল দেশ পর্য্যটন করিয়াছিলেন। বিবিধ শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন প্রযুক্ত বাণেশ্বরের অনেক পূর্ব্বেই মৃত্যু হইত। কিন্তু মানুষের মন কোন একটা বিষয় বিশেষের প্রতি ধাবিত হইলে শরীর সহজে পতন হয় না। বাণেশ্বরের মন এক এক সময়ে এক একটা বিষয়ের প্রতি ধাবিত ছিল। সুতরাং আজ পর্য্যন্তও তিনি বাঁচিয়া রহিয়াছেন।

বাণেশ্বর আত্মহত্যা করিবার নিমিত্ত গঙ্গায় ঝাঁপ দিলে পর, কয়েক জন ধীবর তাঁহাকে অচৈতন্য অবস্থায় নদী হইতে উঠাইয়া পুনর্জ্জীবিত করিয়াছিল। সেই আত্মহত্যার সময় হইতে আজ প্রায় বাইশ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে।

স্ত্রী, পুত্র, এবং কন্যার মুখদর্শনের পর বাণেশ্বরের মন আর কোন বিষয় বিশেষের প্রতি ধাবিত হইল না। সুতরাং স্ত্রী পুত্রের সহিত সম্মিলনের অনতিকাল পরেই তাঁহার পরমায়ুঃ শেষ হইয়া আসিল। তাঁহার মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বে শ্রীনিবাস সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট যাইয়া বিবিধ ধর্ম্মের কথা বলিতেন। বাণেশ্বরের স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে সহমৃতা হইবেন বলিয়া পূর্ব্বেই ঠিক্ করিয়া রাখিয়াছিলেন। অমর সিংহ এবং তাঁহার ভগিনী মাতাকে এই পথ হইতে

বিরত রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! বাণেশ্বরের মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রী স্বামীর মস্তক ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া ছিলেন। বাণেশ্বরের মৃত্যুর দুই চারি মিনিট পরে, অমর সিংহ দেখেন যে, তাঁহার মাতারও মৃত্যু হইয়াছে। তিনি মৃতাবস্থায় স্বামীর মস্তক ক্রোড়ে করিয়া বসিয়াছেন।

বাণেশ্বরের মৃত্যুকালে শ্রীনিবাস সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি অমর সিংহের মাতার এই আকস্মিক মৃত্যু দর্শনে প্রথমে অত্যন্ত চমৎকৃত হইলেন। কিন্তু কিছুকাল চিন্তা করিয়া বলিতে লাগিলেন।

"আজ সহমৃতা প্রথার প্রকৃত অর্থ আমার হৃদয়ঙ্গম হইল। জীবিতাবস্থায় যে সকল নারী স্বামীর চিতারোহণ করেন, তাঁহারা সত্য সত্যই আত্মঘাতিনী হয়েন, প্রকৃত পতিপ্রাণা রমণীর আত্মা পতির মৃত্যুকালে এ জড়দেহ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় পতিকে অনুসরণ করে। ঈদৃশ স্বাভাবিক মৃত্যুকেই সহমরণ বলা যায়।"

পিতৃ মাতৃ বিয়োগের পর অমর সিংহ স্বীয় ভগ্নী, স্ত্রী, মহাবীর সিংহ, ছত্রসিংহ এবং চাঁদকুমারীকে সঙ্গে করিয়া হোলকারের রাজ্যে চলিয়া গেলেন। রাণী গোলাপকুমারী ইহাদিগকে বেনারসের রাজার সৈনিক বিভাগে কার্য্য করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু মহাবীর তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি বলিতে লাগিলেন—

"বেনারসের রাজা এখন একেবারে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীন হইয়া পড়িয়াছেন। সুতরাং বেনারসের রাজার সৈন্যগণকে সর্ব্বদাই কোম্পানীর সাহায্যে যুদ্ধ করিতে হইবে। কিন্তু আমার পিতা এবং মাতামহের ভ্রম ও কুকার্য্য সংশোধন করাই আমার জীবনের উদ্দেশ্য। আমি কোম্পানীর ছায়াও স্পর্শ করিব না।"

ইহার পর মহারাষ্ট্রীয়দিগের সঙ্গে ইংরাজদিগের যতবার যুদ্ধ হইয়াছে, তাহার প্রত্যেক যুদ্ধেই মহাবীর অলৌকিক বীরত্ব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ছত্রসিংহ, অমর সিংহ, মহাবীর সিংহ ইঁহারা তিনজনই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন সংগ্রাম ক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জন করিয়া স্বর্গলাভ করিলেন।

রাণী গোলাপকুমারী আপন জামাতা এবং কন্যার অনুরোধে কাশী হইতে রামনগর যাইয়া রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এবং ইংরাজ রেসিডেণ্টের সঙ্গে ইহার কোন বিষয়ে

ঐক্য হইত না। কিরূপে প্রজার অর্থ শোষণ করিবেন, তাহাই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একমাত্র চেষ্টা। পক্ষান্তরে গোলাপকুমারী প্রজাদিগের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিনী ছিলেন। সুতরাং ইহাঁদের পরস্পরের মধ্যে কখন মিল হইতে পারে না। হেষ্টিংসের সঙ্গে রাণী গোলাপকুমারীর প্রথম হইতে মনান্তর হইতে লাগিল। হেষ্টিংস আলী ইব্রাহিম খাঁকে বেনারসের প্রধান জজের পদ প্রদান করিলেন। কিন্তু গোলাপকুমারী আলী ইব্রাহিম খাঁকে বিচারকের উপযুক্ত বলিয়া মনে করিতেন না। আলি ইব্রাহিম খাঁ যে অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোক ছিলেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি অত্যন্ত ভীরু লোক ছিলেন। সর্ব্বদা ইংরাজদিগের তোষামোদ করিতেন। বোধ হয় হেষ্টিংসকে কোন কোন সময়ে উৎকোচ প্রদান করিয়াও থাকিবেন। গোলাপকুমারী সর্ব্বদাই বলিতেন যে ভীরু, কাপুরুষ, তোষামোদকারী এবং চোর এই চারি প্রকারের লোক অন্যান্য সকল কার্য্য করিতে সমর্থ; কিন্তু বিচারকের কার্য্য করিতে পারে না। কারণ নির্ভীক মন না হইলে বিচারশক্তি প্রখর ও সমুজ্জ্বল হয় না।

মহারাণী গোলাপকুমারী স্ত্রীলোক হইলেও তাঁহার এ সিদ্ধান্ত একেবারে ভ্রমাত্মক বলিয়া আমরা অগ্রাহ্য করিতে পারি না।

উপসংহার।

এ সংসারে চিরকাল কাহাকেও কষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। অনন্ত দুঃখানলে কাহাকেও জ্বলিয়া মরিতে হয় না। দুঃখ এবং বিপদ শারীরিক রোগের ন্যায় ঐশ্বরিক নিয়ম লঙ্ঘনেরই অবশ্যম্ভাবী ফল।

সীতা সদৃশী আমেতু তাঁহারা বেগমকে ধন সম্পত্তি রক্ষার চিন্তা প্রকৃতিভ্রষ্ট করিয়াছিল। সে ধনসম্পত্তিবিনাশ স্বরূপ বিপদরাশি অবিলম্বে তাঁহাকে দুঃখ সাগরে নিমগ্ন করিল। তাঁহার দুষ্কৃতির সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত হইল। বিপন্নাবস্থায় তাঁহার আপন কৃত পাপের প্রতি দৃষ্টি পড়িল।

এ সংসারের সর্ব্বপ্রকার বিপদই শুদ্ধ কেবল মানুষের দৃষ্টি তাহার পাপ কুকার্য্য এবং কর্ত্তব্য লঙ্ঘনের প্রতি ফিরাইবার নিমিত্তই অভিপ্রেত হইয়াছে। সুতরাং বিপদ সম্পদ উভয়ই মঙ্গলময় ঈশ্বরের করুণা সম্ভূত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

১৭৮২ খ্রীঃ অব্দের ডিসেম্বরের পূর্ব্বেই খোজা জহরালী এবং বহরালী কারামুক্ত হইয়া ফায়েজাবাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের আদেশানুসারে বৎসরেক দুই পরে বেগমের সমুদয় জায়গীর প্রত্যর্পিত হইল। বেগমের জায়গীর প্রত্যর্পিত হইলে পর, খোর্দ্দমহলের অন্ন কষ্টও দূর হইল।

হতভাগ্য নবাব আসফ উদ্দৌলার হাতে মাতার ভৎর্সনা এবং আক্ষেপোক্তি পরিপূর্ণ পত্র নিপতিত হইবামাত্র, তাঁহার হৃদয় মধ্যে আত্মগ্লানি প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। এই পত্রই আসফ উদ্দৌলার মৃত্যুবাণে পরিণত হইল। এ পত্রের প্রত্যেক অক্ষর হইতে জননী হৃদয়ের আগুণ উদ্গীরিত হইয়া আসফ উদ্দৌলাকে দগ্ধ করিতে লাগিল। ইহার পর তিনি রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিতে আর সমথ হইলেন না। অহর্নিশ অন্দরের মধ্যে শয্যাগত হইয়া পড়িয়া থাকিতেন। ইংরাজেরা বলিতেন যে, নবাব আসফ উদ্দৌলা দিবারাত্র উপপত্নীদিগের সম্ভোগব্যহারে অন্দরের মধ্যে ইন্দ্রিয় সেবায় কাল যাপন করিতেছেন। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তাহা নহে। আসফ উদ্দৌলার হৃদয়ে কেবল আত্মগ্লানির অগ্নি জ্বলিতেছে। তিনি যার পর নাই মনোকষ্টে কাল যাপন করিতেছেন। অন্যূন প্রায় পনের বৎসর পর্য্যন্ত এইরূপ মনোকষ্টে কাল যাপন করিয়া ১৭৯৭ সনে ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।

তাঁহার মৃত্যুর কয়েক দিবস পূর্ব্বে কলিকাতার গবর্ণর জেনেরেল সার্ জন্সোর কলিকাতা হইতে কয়েক জন ইউরোপীয় চিকিৎসক অযোধ্যায় প্রেরণ করিলেন। কিন্তু শত চেষ্টা করিয়াও আসফ উদ্দৌলাকে কেহ ঔষধ খাওয়াইতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন—"এই বিশ্বাসঘাতক ফিরিঙ্গীগণই আমার পরমায়ুঃ শেষ করিয়াছে। আমি আর ইহাদের ঔষধ সেবন করিব না।"

মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বে একবার মাতৃ চরণ দর্শন করিবেন বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাঁহার আদেশানুসারে ফায়েজাবাদে লোক প্রেরিত হইল।

জননীর হৃদয় অসীম স্নেহে গঠিত। কুপুত্র সুপুত্র সকলই মাতার নিকট সমান। বেগম পুত্রের মৃত্যুকাল উপস্থিত শুনিয়া লক্ষ্ণৌ যাইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। কিন্তু যেদিন লক্ষ্ণৌ যাত্রা করিবেন বলিয়া

স্থির করিয়াছিলেন, সেই দিন প্রাতে লক্ষ্ণৌ হইতে আসফ উদ্দৌলার পাগড়ী সহ লোক আসিয়া বেগমকে তাঁহার মৃত্যু সংবাদ প্রদান করিল। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে তিনি বলিয়া গিয়াছিলেন যে,তাঁহার পাগড়ী তাঁহার জননীর পদতলে রাখিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে। নিস্তেজ, কাপুরুষ কিন্তু সহৃদয় এবং দাতাকর্ণ সদৃশ আসফ উদ্দৌলা এইরূপে ১৭৯৭ খ্রীঃ অব্দে ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।

ইংরাজেরা প্রথমতঃ অর্থ লোভে আসফ উদ্দৌলার পুত্র নবাব উজীর আলীকে সিংহাসন প্রদান করিলেন। কিন্তু চারি মাস পরে, আবার সাদাতালীর নিকট হইতে সমধিক অর্থ লাভের আশায়, উজীর আলীকে সিংহাসন চ্যুত করিয়া, আসফ উদ্দৌলার বৈমাত্র ভ্রাতা পূর্ব্বোল্লিখিত নির্ব্বাসিত সাদাতালীকেই সিংহাসন প্রদান করিলেন।

সাদাতালী অবৈধ উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক সিংহাসন লাভ করিলেও উত্তরকালে তিনি অত্যন্ত প্রজাবৎসল রাজা বলিয়া পরিচিত হইলেন। মস্নাদে উপবেশন করিবার পূর্ব্বে মস্জিদে যাইয়া তোবা করিলেন যে, পিতৃ রাজ্য রক্ষা না করিয়া কোন প্রকার বিলাস কিম্বা ইন্দ্রিয় সেবায় রত হইবেন না। সিংহাসনারোহণের পর স্ত্রী সংসর্গ একেবারে পরিত্যাগ করিলেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে সুচারুরূপে রাজ্য শাসন করিয়া আসফ উদ্দৌলার সমুদয় ঋণ পরিশোধ করিলেন। তাঁহার রাজকোষ ধন রত্নে পরিপূর্ণ হইল। প্রজাদিগের হাহাকার শব্দ দূর হইল। অযোধ্যা আবার ভারত উদ্যান নামে অভিহিত হইল। কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর স্পর্শদোষ একবার যে রাজ্যকে আশ্রয় করিয়াছে তাহার আর উদ্ধার নাই। ওয়ারেণ্‌ হেষ্টিংস চুনারের সন্ধিপত্রে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, সাময়িক সৈন্যদল (Temporary brigade) অযোধ্যা হইতে স্থানান্তরিত করিবেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস্ সে সন্ধি অম্লান বদনে ভঙ্গ করিলেন। ইহাতে সাদাতালী কোন আপত্তি করিলেন না। তিনি সাময়িক সৈন্যদলের ব্যয়ও বহন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহার পর লর্ড ওয়েলেস্‌লি সাদাতালির রাজকোষে অর্থ সঞ্চিত হইয়াছে দেখিয়া, আফগান যুদ্ধাশঙ্কার ছলনায় আবার অসংখ্য অসংখ্য নূতন ইংরাজ সৈন্য অযোধ্যায় রাখিবার প্রস্তাব করিলেন। সাদাতালী এই সকল সৈন্যের ব্যয় বহন করিতে অস্বীকার করিলেন। লর্ড ওয়েলেস্‌লি তখন অন্যায় পূর্ব্বক সাদাতালীর অসম্মতিতে

অসংখ্য অসংখ্য নূতন সৈন্য অযোধ্যায় প্রেরণ করিলেন ;এবং নবাবের কর্ম্মচারীদিগকে ধৃত করিয়া এই সকল সৈন্যের ব্যয় আদায় করিতে হুকুম করিলেন। সাদাতালী তখন নিতান্ত নিরুপায় হইয়া ইংরাজদিগকে নগদ টাকা প্রদানের দায়ীত্ব হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার নিমিত্ত, রাজ্যের প্রায় এক তৃতীয়াংশ একেবারে ইংরাজদিগকে ছাড়িয়া দিলেন। অযোধ্যার কতকাংশ ইংরাজরাজ্য ভুক্ত হইল।

ইহার পর আর ইংরাজদিগের নগদ টাকা দাবী করিবার বড় সুবিধা রহিল না। তখন তাঁহারা আর একটী নূতন কৌশল অবলম্বন করিলেন। এক গোলাতে দুই ব্যাঘ্র সংহারের উদ্যোগ করিলেন। দিল্লীর বাদসাহের নাম লোপ করিয়া সাদাতালীকে অযোধ্যার রাজা উপাধি গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। এপর্য্যন্ত অযোধ্যার নবাবগণ দিল্লীর বাদসাহকে কর প্রদান না করিলেও, নামে বাদসাহের উজীর বলিয়া পরিচিত ছিলেন। কিন্তু বাদসাহের নাম লোপ করিবার চক্রান্ত হইল।

সাদাতালী বুঝিতে পারিলেন যে, এ কেবল দিল্লীর বাদসাহের নাম লোপ এবং অযোধ্যার অর্থ শোষণের কৌশল হইতেছে। তিনি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে লিখিয়া পাঠাইলেন—

"আমার পিতা পিতামহ দিল্লীর বাদসাহের গোলাম ছিলেন। দিল্লীর বাদসাহের উজীর বলিয়া পরিচয় দিতে তাঁহারা লজ্জা বোধ করিতেন না। আমি আপন পিতা পিতামহের উপার্জ্জিত রাজ্য রক্ষা করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। আমি কোন মুখে পিতা পিতামহের অপেক্ষা উচ্চতর উপাধি গ্রহণ করিব ?"

সাদাতালীর আমলে বেগমের জায়গীরের খাজানা সুচারুরূপে আদায় হইতে লাগিল। এখন আর বেগম নিজে আয় ব্যয় কিছুই দেখেন না। খোজা দারাবালী খাঁই সমুদয় কর্ত্তৃত্ব করিতে লাগিলেন। ১৮০৮ খ্রীঃ অব্দের পূর্ব্বে বেগমের আবার প্রায় এক কোটী টাকা সঞ্চিত হইল। খোর্দ্দ মহালবাসিনী হতভাগিনীদিগের অন্নের সংস্থানার্থই বেগম পূর্ব্বে একবার টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। এখনও সেই উদ্দেশ্যেই টাকা সঞ্চয় করিতেছেন।

কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর এ টাকা কাহার হাতে রাখিবেন সেই বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। অযোধ্যার নবাবের হাতে এই টাকা রাখিলে

হয়ত তাহা ইংরাজেরা লুণ্ঠন করিবে; কিম্বা আসফ উদ্দৌলার ন্যায় কোন অপরিমিত ব্যয়ী নবাবের হাতে টাকা পড়িলে অত্যল্প সময় মধ্যে সমুদয়ই ছারখার হইবে।

বেগম অত্যন্ত সুচতুরা এবং বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি অনেক চিন্তার পর স্থির করিলেন যে, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের হাতে আমানত রাখিলে আর এ টাকা তাহাদের আত্মসাৎ করিবার সুবিধা থাকিবে না। এই প্রকার চিন্তা করিয়া তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে নগদ ৯৯,৪৮,৯১৬ নিরনব্বই লক্ষ আট চল্লিশ হাজার, নয় শত ষোল টাকা খোর্দ্দ মহালবাসিনীদিগের ভরণ পোষণের নিমিত্ত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের হাতে আমানত রাখিলেন। আর জায়গীর এবং সমুদয় অস্থাবর সম্পত্তি নবাব সাদাতালীকে প্রদান করিলেন। কিন্তু বেগমের মৃত্যুর পূর্ব্বেই সাদাতালীর মৃত্যু হইল। সাদাতালীর পুত্র গাজীউদ্দীন হায়দর সিংহাসনারূঢ় হইলেন। ইনিই ইংরাজদিগের অনুরোধে দিল্লীর বাদসাহের নাম লোপ করিয়া অযোধ্যার রাজা উপাধি গ্রহণ করিলেন।

অযোধ্যার প্রথম রাজা গাজীউদ্দীন হায়দরের আমলে ১৮১৫ খ্রীঃ অব্দে সীতা সদৃশী অযোধ্যার বেগম শ্রীশ্রীমতী আমেতু জঁাহারা বউ বেগম জীবনের বিবিধ কর্ত্তব্য সাধন করিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন।

ভূমিকা।

অযোধ্যার বেগমের প্রথমখণ্ডে ভ্রমবশত স্থানে স্থানে "লক্ষ্ণৌ" অযোধ্যার রাজধানী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু পাঠকগণ লেখকের ত্রুটী মার্জ্জনা পূর্ব্বক যে সকল স্থানে "লক্ষ্ণৌ" লিখিত হইয়াছে সেই সেই স্থানে "ফায়েজাবাদ" পাঠ করিবেন। আর দ্বিতীয় খণ্ডেও প্রুফসিট পরীক্ষকের অনবধানতা প্রযুক্ত "সা চাঁনিম" নামের স্থানে "সাচালিম", "মাহবাল জঙ্গ" স্থানে "মাহরান্ জঙ্গ", "ঘেনুসিংহের" স্থানে "খিনুসিংহ" এবং ২২৬ পৃষ্ঠায় "অসম্ভবইবা কি" স্থানে "অসম্ভব হইবে কি" ইত্যাদি ভুল হইয়াছে।

যে সকল ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বন করিয়া এই উপন্যাস লিখিত হইয়াছে, তৎসমুদয়ই টীকাতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

১০ই, ডিসেম্বর ১৮৮৬;
৬৪।১ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট।

শ্রীচণ্ডীচরণ সেন।

বিজ্ঞাপন।

যাঁহারা প্রথম খণ্ডের মূল্য এখন পর্য্যন্তও প্রেরণ করেন নাই, তাঁহাদিগের নিকট দ্বিতীয় খণ্ড প্রেরিত হইবে না।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন।
৬৪।১ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট।